বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস

মোহাম্মদ হাননান

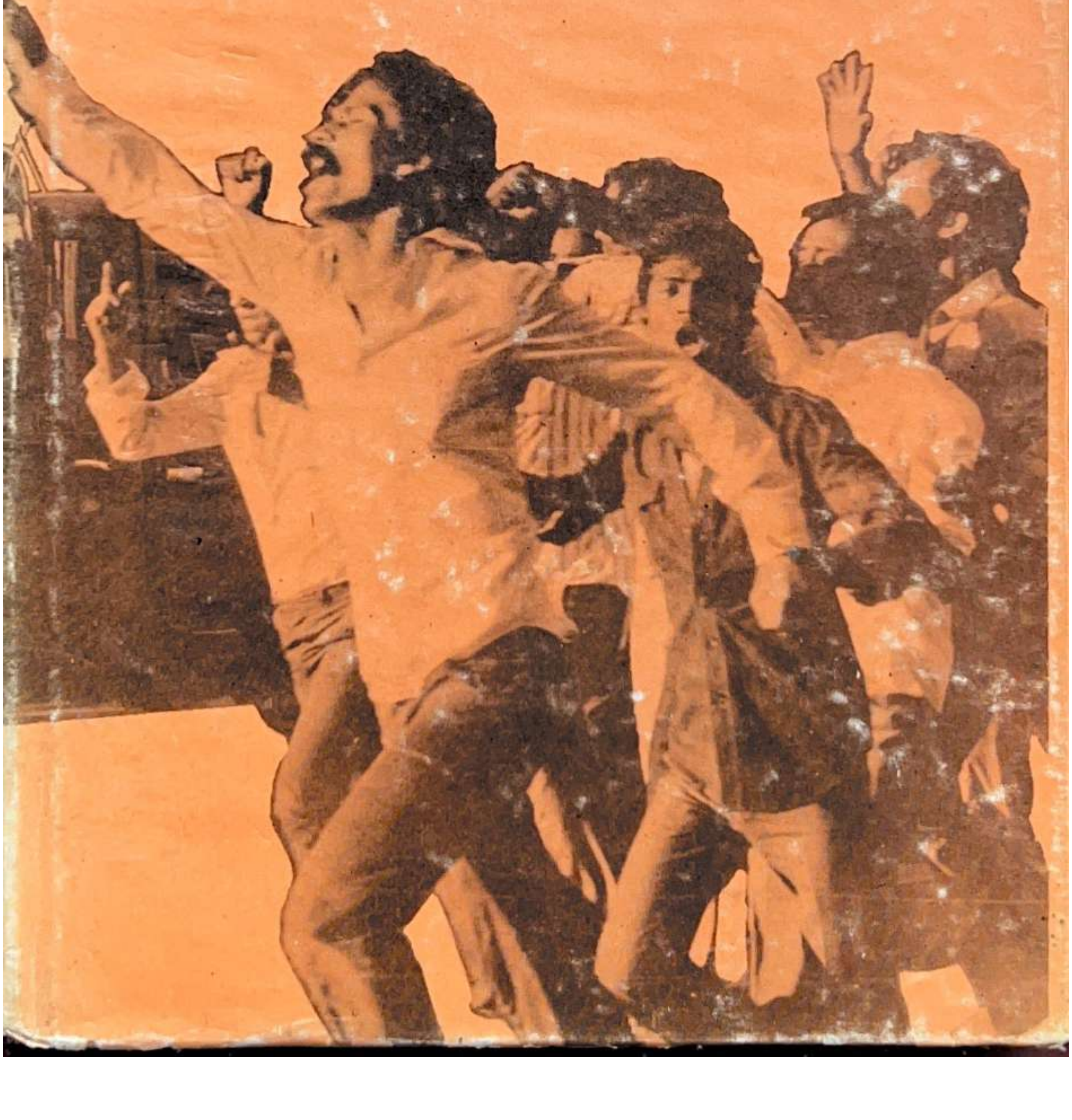

বাংলাদেশের
ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস

(দ্বিতীয় খণ্ড)

১৯৫৩-১৯৬৯

মোহাম্মদ হাননান

ওরাসী প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশ কাল
আষাঢ় ১৩৯৪
জুলাই ১৯৮৭

প্রকাশক
আব্দুল বারী ওয়ার্সী
ওয়ার্সী প্রকাশনী
১৪২/বি গ্রীন রোড, ঢাকা-১৫

পরিবেশক
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-২

মুদ্রণ
কোয়ালিটা প্রিন্টার্স
২৭/১৬ মনিপুরী পাড়া, ঢাকা-১৫

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
মনি প্রিণ্টাস
আজিমপুর, ঢাকা-৫

প্রচ্ছদ শিল্পী
কাজী হাসান হাবিব

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র
মোহাম্মদ আলম (দৈনিক ইত্তেফাক)

বাঁধাই
আবুল হোসেন এণ্ড সন্স
২২/১ হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩

মূল্য
সুলভ : ৫০·০০
শোভন : ৮০·০০

History of the Student Movement in Bangladesh. Part II (1953-1969) by Mohammed Hannan. Warsy Publication, Dhaka.

Price in US Doller : Eight only

আমার পিতা
মো: আজিজুল হক

পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কোনো লেখাপড়াকেই
যিনি কোনদিন সুনজরে দেখেন নি

এবং আমার মাতা
হাসিনা হক লায়লী

পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আমার যতো আগ্রহ ও উদ্দীপনা
উত্তরাধিকার সূত্রে যাঁর থেকে প্রাপ্ত

তাঁদের দু'জনেরই উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০—১৯৫২)
প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, গ্রন্থলোক, ঢাকা

বাংলা সাহিত্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব
(প্রাচীন ও মধ্যযুগ), বাংলা একাডেমী (যন্ত্রস্থ)

শুরুর আগে

বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছাত্র-ইতিহাসের এক বিশেষ কালপঞ্জিতে চলে এসেছি। এ ব্যাপারে আমার পূর্ব পরিকল্পনার বেশ খানিকটা রদ-বদল করা হয়েছে, যে পরিকল্পনাটির বিস্তারিত প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বিবৃত হয়েছে। বর্তমানে আমি দ্বিতীয় খণ্ডের পরিধিকে উনসত্তর সাল পর্যন্তই সীমিত রেখেছি। কারণ আমার ধারণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তীতে এদেশের ছাত্র আন্দোলনের এক ভিন্ন গতিধারা, ভিন্ন প্রেক্ষিত ও মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত। সুতরাং তার ইতিহাস আলাদা খণ্ডেই সংযোজিত হওয়া উচিৎ বলে মনে করেছি।

প্রথম খণ্ডের তুলনায় দ্বিতীয় খণ্ড রচনাতেই আমাকে বেশী বেগ পেতে হয়েছে। কারণ অন্যান্য সময়ের চেয়ে এই খণ্ডের ব্যাপ্তিকালের ঘটনাবহুল তথ্যের আকরের সূত্রসমূহ অপেক্ষাকৃত জটিল এবং স্ববিরোধিতাপূর্ণ। এই সময়ের বিভিন্ন সংগঠনের দলিল ও বিভিন্ন কাগজ-পত্রেরও যথেষ্টরকম অভাব রয়েছে। পঞ্চাশ দশকের শুরু থেকে ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (উভয় উপদলের) তবু কিছু কিছু কাগজ-পত্র পাওয়া যায়। কিন্তু সমসাময়িক সময়ের অন্যতম বৃহৎ রাজ-নৈতিক দল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের দলিল-পত্র ঠিক সমপরিমানেই কম। বলা চলে একেবারে পাওয়াই যায় না।

সমসাময়িক অনেক প্রাক্তন ছাত্রনেতার কাছেই আমি এ ব্যাপারে যোগাযোগ করেছি কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছি। তবু যেখানে যতোটুকু পেয়েছি, ঐতিহাসিক আকর হিসাবে তা-ই ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। এদিক থেকে দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় আমার প্রধান তথ্য-সূত্র ছিল, আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার, পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন গ্রন্থ এবং দলিল-পত্র সমূহ। কিন্তু অপ্রতুল।

এই বই যখন লেখা হয়েছে, তখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল অত্যন্ত উত্তাল। প্রাক্তন ছাত্রনেতারা (যাঁরা এখনো সক্রিয়) তাঁরা শুধু ব্যস্ত নন, অতি ব্যস্তও। নাগালে পাওয়া ছিল একটা বড় ব্যাপার। ফলে গ্রন্থ প্রেসে যাওয়ার পরও আমাকে সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রক্রিয়া চালাতে হয়েছে।

যে সকল প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও রাজনৈতিক নেতা আমাকে আগ্রহের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন (যদিও তাঁরা একটি রাজনৈতিক কর্তব্যই সম্পন্ন করেছেন), তথাপি তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। তবে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন নেতা জনাব সিরাজুল আলম খানের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি ছিল যেমন চমকপ্রদ, তেমনি তথ্য বহুল। কথা ছিল কোনো ব্যাপারে তাঁর রেফারেন্স আমি ব্যবহার করবো না। কিন্তু ইতিহাসের স্বার্থেই কতক বিষয়ে আমাকে তাঁর সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি দিতে হয়েছে (যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর রেফারেন্স ব্যবহারের সুযোগকে আমি এড়িয়ে গেছি, পূর্ব প্রতিশ্রুতির কারণে)।

গ্রন্থের ছাপার কাজ যখন প্রায় শেষ, ঠিক তখন উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা মাহবুবুল হক দুলনের (তিনি সরকারী ছাত্র সংগঠন এন, এস, এফের নেতা হয়েও শেষ কালে আইয়ুব-দ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন) একটি চিঠি আমার হাতে আসে। জনাব দুলন আমার প্রকাশকের কাছে ছাপা অংশগুলো দেখেছিলেন এবং কতক ক্ষেত্রে তথ্যের অসম্পূর্ণতার কথা লিখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, রেসকোর্সের ময়দানে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করলে জনাব দুলন তা লক্ষ জনতার পক্ষ থেকে সমর্থন করেন। এ ছাড়া তাঁর চিঠিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান দিয়ে বলেছেন এন, এস, এফের ফখরুল ইসলাম মুন্সী (বর্তমানে উপমন্ত্রী) ও ছাত্র ইউনিয়নের (মেননের) দীপা দত্ত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিকল্প সদস্য ছিলেন।

পাকিস্তান ছাত্রশক্তির ষাটের দশকের অন্যতম নেতা জাকিউদ্দিন আহমদ এক সাক্ষাৎকারে ৬২-র ৩১শে জানুয়ারীর চার সংগঠনের যৌথ সভায় ছাত্রশক্তির ভূমিকার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষন করেছেন। প্রকৃত পক্ষে এই তথ্যটি যথাযথ যাচাইয়ের জন্য তৎকালীন ছাত্রশক্তির অন্যতম নেতা মওদুদ আহমদ (বর্তমান উপ প্রধানমন্ত্রী)-এর একটি সাক্ষাৎকার নিতে যাই। সময়ও মিলেছিল, কথাও হয়েছিল। কিন্তু খুবই স্বল্প সময়ের জন্য। ফলে বিষয়টির সুরাহা হয়ে ওঠেনি। তিনি (জনাব মওদুদ আহমদ) বরং বিস্তারিত বিষয়ের জন্য আমাকে জাকিউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে অনুরোধ করেন। জাকি সাহেবের ঠিকানা পেতে পেতে বই ইতোমধ্যে প্রকাশ হয়ে যায়।

ছাত্র ইউনিয়নের ভাঙ্গন অধ্যায়ে কাজী জাফর আহমদের ভূমিকা নিয়ে দু'দটো ভিন্নমত আমার হাতে রয়েছে। বলাই বাহুল্য, ছাপার কাজ শেষ হওয়ার পরে পাওয়ায় তা সংযোজন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এ রকম আরো ভিন্নমত, বিতর্কিত বক্তব্য আরো আসতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। যে গ্রন্থটি আজ বের হচ্ছে পাঠকবর্গ তাকে একটি বড় কাজের খসড়া হিসাবে নিলেই খুশী হব। এমনি করে আগ্রহী অনুরাগীগণ যখন আমার কাজে তথ্য দিয়ে সহায়তা করবেন তখন দ্বিতীয় সংস্করণে তা শোধরে নেব কিংবা সংযোজন অথবা সংশোধন করে নেব। একটু উদার ও সহনশীল মনে ইতিহাসের এই জটিল কাজটি নিলে খুশী হব। পূর্ণাঙ্গ এবং যথাযথ ইতিহাসের জন্য আমাদের দ্বিতীয় সংস্করণ বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

গ্রন্থটি যথাযথভাবে মূল্যবান করতে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় মতিউর রহমান। তিনি দুষ্প্রাপ্য অনেক দলিল-পত্র নিঃশঙ্কচিত্তে আমার হাতে তুলে দেওয়ায় আমি যথার্থই অবাক হয়েছি।

বিশিষ্ট সংস্কৃতি-কর্মী ও লেখক মফিদুল হকও এ ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং বর্তমান খণ্ডে শিক্ষা বিষয়ক যে ব্যাপক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে তা বলা চলে তাঁরই পরামর্শ ও সহযোগিতায়।

বইটির এই কলেবরে আনার পেছনে আমার আরো বহু সুহৃদের অবদান রয়েছে। তাঁদের নাম যদি আমি স্বীকার না করি তাহলে বহুজনের ঋণে আমাকে চিরকাল দগ্ধাতেই হবে। শ্রদ্ধাস্পদ খোন্দকার শওকত জুলিয়াস ও রিনি রেজা এবং হেলালউদ্দিন আহমদ, শাহ আফতাবুজ্জামান, নাসিরউদ্দিন, মাহফুজুর রহমান মলঙ্গী, রসায়নবিদ পরিমল দাশ ও সামশুন্নাহার প্রমুখ আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন সময়ে সহায়তা করেছেন, কেউ কেউ লাইব্রেরীতে গিয়ে পর্যন্ত অনেক বিষয় অনুবাদ করে আমাকে শুধু সাহায্য করেননি, একটি মহৎকাজ সম্পন্ন করতে অনুপ্রাণিতও করেছেন।

আমার অনুজ আদনান বাতেন ও বখতিয়ার হোসেন এবং অনুজা আখতার শাহীমা, আখি ও নাসিমা ইসলাম আর সিরাজুল ইসলাম প্রুফ দেখা ও বিভিন্ন বিষয় কপি করার ব্যাপারে সাহায্য করেছে।

বন্ধু হালিম দাদ খান এবারও নির্ঘণ্টটি তৈরী করে দিয়েছেন।

আমার প্রকাশক জনাব আবদুল বারী ওয়ার্সী বইটি প্রকাশের ব্যাপারে যেভাবে আগ্রহ দেখিয়েছেন তাতে শুধু কৃতজ্ঞ নই, অনুপ্রাণিতও।

কোয়ালিটি প্রিন্টার্সের মালিক শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডা: এস, এ, খালেক ও ইমরান খালেকের গ্রন্থ প্রীতি ভুলবার নয়। প্রেসের হুমায়ুন সাহেব, বাদশা মিয়া ও তাদের বইটির জন্য তাঁদের চলতি দায়িত্বের অতিরিক্ত খেটেছেন।

প্রিয় ইলিয়াস মল্লিক, আলী আকবর টাবী, আরিফ কামাল দ্বিতীয় খণ্ড লেখা ও প্রকাশের ব্যাপারে নিয়মিত চাপ অব্যাহত রেখেছিলেন।

বইটি লেখা ও প্রকাশের ব্যাপারে এঁদের সকলের কাছে আমার ঋণের শেষ নেই।

বইটি প্রকাশের কথা ছিল যদিও বহুদিন পূর্বেই, তথাপি দেরী হলেও শেষ পর্যন্ত যে প্রকাশিত হলো এটাই স্বস্তির কথা। সুধিজন এবং ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহী পাঠক, এই গ্রন্থের বিভিন্ন ত্রুটি, বিচ্যুতি ও নতুন কোনো তথ্য, সূত্র, সংবাদ দিয়ে ভবিষ্যতে বইটির আরো শ্রীবৃদ্ধি সাধনে এগিয়ে আসলেই আমার পরিশ্রম পুরোপুরি সার্থক হবে বলে বিশ্বাস করি। কথা দিচ্ছি, যেসব বিষয় সংক্ষেপিত হয়েছে এবং সময়ের অভাবে যেসব ঘটনাবলী শেষ মুহূর্তেও সংযোজন করা সম্ভব হয়নি, দ্বিতীয় সংস্করণে সেসব বিষয়াবলীর পূর্ণরূপ দেওয়া হবে।

৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪
১৫ জুন, ১৯৮৭

মোহাম্মদ হাননান
২৪।এ আজিমপুর এস্টেট
ঢাকা-৫

যে বইয়ের পাণ্ডুলিপি না পড়েই আমি ছাপতে রাজী হয়েছি

সাধারণত: এমনটা ঘটেনা। কারণ একজন প্রকাশক প্রথম পাণ্ডুলিপি লেখক থেকে জমা নেন। নিজে দেখেন। উপদেষ্টাদেরও মতামত নেন। তারপরই হয় চুক্তিপত্র। সাধারণভাবে প্রকাশনা জগতে এটাই নিয়ম।

কিন্তু মোহাম্মদ হাননানের 'বাংলাদেশের ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের ব্যাপারে বলা চলে আমি অনেকটা চোখ বুজেই রাজী হয়েছি। আমার এ ধরনের নিরঙ্কুশ আস্থার পেছনে ভিত্তি ছিল।

প্রথমত: গ্রন্থটির নামের মধ্যেই বিষয়টির গুরুত্ব বহন করছিল। দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশে এ ধরনের অন্তত: ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এটিই প্রথম প্রচেষ্টা। তৃতীয়ত: পাঠক মহলে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বিপুল জনপ্রিয়তাও আমাকে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে আগ্রহী করে তুলেছিল।

আমার এ বিশ্বাস যে কতো সত্য তা গ্রন্থ বাঁধাই হওয়ার পূর্বেই লক্ষ্য করছি। যারাই মুদ্রিত অংশগুলো আমার অফিসে দেখেছেন তাঁরাই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমার ধারণা দেশে-বিদেশের সকল শ্রেণীর পাঠক বিশেষ করে রাজনীতি সচেতন ইতিহাস-পাঠক এই গ্রন্থ লুফে নেবেন।

ওয়ার্সী প্রকাশনার এই একটি গুণ যে, তার সকল প্রকাশনাই সকল সময়ে সর্বশ্রেণীর পাঠক দ্বারা সমাদৃত হয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে এই সংস্থা বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতে ছিল একটি বিস্ময়। হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দীন আল আজাদের মতো লেখকদের প্রথম বই আমরাই প্রকাশ করার গৌরব অর্জন করেছিলাম। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খানের ভয়াবহ সময়ে শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' যখন কেউ বের করতে সাহস পায় নি, তখনও আমার এই সংস্থা নির্ভয়ে এসে তা প্রকাশ করে প্রকাশনা জগতে বিরল সাহসের কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

সেদিক থেকে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্রকাশনা-প্রীতি আমার কাছে কখনো ব্যবসা হিসাবে ধরা দেয় নি। এ পেশা আমার কাছে এখনো তাই নেশা হিসাবেই রয়ে গেছে।

আমার ধারণা, মোহাম্মদ হাননান রচিত 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড ওয়ার্সী প্রকাশনার এই নবতম প্রয়াস পূর্বের মতোই পাঠক মহলে বিপুল সাড়া জাগাবে।

০২ আষাঢ় '৯৪ — আবদুল বারী ওয়ার্সী
১৭ জুন '৮৭

সূচীপত্র

ভাষা আন্দোলন পর্যালোচনা ১
কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়ন ৫
ভাষা আন্দোলন পরবর্তী পরিস্থিতি ৭
একুশে : ১৯৫৩ ৮
একুশের প্রথম সংকলন ১০
ফজলুর রহমানকে কালপতাকা ১১
১১ মার্চ : ১৯৫৩ ১১
ছাত্র বেতন হ্রাসের আন্দোলন ১১
বংশীবাদক বদল ১৪
ছাত্রদের যুক্তফ্রণ্ট ১৪
ছাত্রলীগ অসাম্প্রদায়িকরণ ১৪
ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন একত্রীকরণ ১৫
বাঙলা বিরোধী বিক্ষোভ ১৭
যুক্তফ্রণ্ট গঠনে ছাত্র সমাজ ১৮
যুক্তফ্রণ্ট গঠনে আরো জটিলতা ১৯
২১ দফা রচনার পটভূমি ২১
একুশ দফার রূপরেখা ২১
৫৪-র নির্বাচনী ফলাফল ২৪
অশনি সংকেত ২৫
বিষ বৃক্ষ রোপন ২৬
শেরে বাঙলার কলকাতা বিবৃতি ২৬
আদমজীর দাঙ্গা ২৭
৯২ (ক) ধারা জারী ২৭
পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমেরিকা ২৮
ইত্তেফাকের ইতিহাস ২৯
একুশে : ১৯৫৫ ৩১
সংখ্যাসাম্য নীতি ৩২
ছাত্র আন্দোলনে জটিলতা ৩২
একুশে : ১৯৫৬ ৩৪
সোহরাওয়ার্দীর শূণ্যতত্ত্ব ৩৬
ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব ৩৭
শেখ মুজিব ফিরে গেলেন ৪০
শিক্ষা সংস্কার কমিশন ৪০
রংপুরে ছাত্র-যুব উৎসব ৪১
ঘন ঘন মন্ত্রীসভার পতন ৪১
দুঃখময় স্মৃতি ৪৩
প্রথম সামারিক আইন : মানুষের উল্লাস ৪৪
নতুন কৌশলে ছাত্র রাজনীতি ৪৫
বাম বিরোধী নির্বাচনী জোট ৪৬
সামরিক শাসনে প্রথম একুশে ৪৬
রোমান হরফে বাঙলা ৪৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইয়ুব খান ৪৮
ডাকসু নির্বাচন : ১৯৫৯ ৪৯
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হামলা ৪৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগ ও ৬ দফা ৪৯
রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী ও ছাত্র সমাজ ৫০

বিচারপতি আসির তদন্ত কমিশন ৫২
দুই অর্থনীতি : ছাত্র বনাম মন্ত্রী ৫৩
আন্দোলনের প্রস্তুতি :
আওয়ামী লীগ-কমিউনিস্ট পার্টি
বৈঠক ৫৪
শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাধীন
পূর্ব পাকিস্তান দাবী ৫৪
স্বাধীন পূর্ব বাঙলা সম্পর্কে
কমিউনিস্ট পার্টি ৫৫
বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন :
নূতন দিগন্ত ৫৬
আন্দোলনের প্রস্তুতি :
ছাত্র ইউনিয়ন-ছাত্রলীগ যৌথ বৈঠক ৫৭
বাষট্টি, প্রথম পর্ব :
সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন ৫৮
প্রথম চিকামারা ৬২
বাষট্টি, দ্বিতীয় পর্ব : শাসনতন্ত্র
বিরোধী আন্দোলন ৬৩
বাষট্টি, তৃতীয় পর্ব :
শরীফ কমিশন বিরোধী আন্দোলন ৬৫
শরীফ কমিশন প্রতিবেদন ৬৬
কমিশন বিরোধী বিক্ষোভ ৬৯
মোনায়েম খানকে কালপতাকা ৭৬
ছাত্র ও বাঙালী সামরিক
অফিসারদের গোপন বৈঠক ৭৭
এন, এস, এফ-এর জন্ম ৭৭
বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন :
কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়ণ ৭৭
'শিখা' সাময়িকীর ভিন্ন মূল্যায়ণ ৮০
ডাকসু : ১৯৬৩ ৮২
ছাত্রাবাস থেকে জিন্নাহর ছবি
অপসারণ ৮৩
ছাত্রলীগে আদর্শিক দ্বন্দ্ব ৮৩
ছাত্রলীগের প্রথম ঘোষণাপত্র ৮৪
পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও ৮৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন ও
ছাত্র বিক্ষোভ ৮৭
প্রতি ৪২ ঘণ্টায় ১ জন গ্রেফতার ৯০
২২ দফা রচনা ৯১
বাইশ দফার রূপরেখা ৯১
হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন ৯৫
হামুদুর রহমানের দৃষ্টিতে ছাত্র
রাজনীতি ৯৬
ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন সম্পর্কে
হামুদুর রহমান ৯৭
হামুদুর রহমানের বোধদয় ৯৮
শিক্ষা কমিশন গঠন ও
শিক্ষানীতি প্রণয়নের ইতিহাস ১০০
ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও ছাত্র সমাজ ১০৪
ছাত্রলীগ-ছাত্রইউনিয়ন
একত্রীকরণের আরো কথা ১০৫
ছাত্র ইউনিয়নে ভাঙ্গন ১০৫
৮১ পার্টির দলিল ১০৬
নূরুর রহমান প্রতিবেদন ১০৯
সফিকুর রহমান প্রতিবেদন ১১৩
ভাঙ্গনে অন্যান্য আরোজটিলতা ১১৫
বাংলা প্রচলন সপ্তাহ ১১৭
৬ দফার পটভূমি ১১৮
৬ দফা রচয়িতা বিতর্ক ১২০
৬ দফার রূপরেখা ১২১
নববর্ষে প্রথম প্রভাত ফেরী ১২২
শিক্ষক লাঞ্ছনা ১২৩
একুশে : ১৯৬৭ ১২৩

রবীন্দ্র সঙ্গীত বিতর্ক	১২৪
ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) চুক্তি	১২৭
তৃতীয় বিভাগ আন্দোলন	১২৭
ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের ধারা	১২৮
ইসলামী ছাত্রসংঘ	১২৮
পাকিস্তান ছাত্রশক্তি	১২৯
এন,এস,এফ	১২৯
তালাবায়ে আরাবিয়া	১৩০
ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে মূলধারা	১৩০
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা	১৩১
ভাষা সংস্কার পুন: চেষ্টা	১৩২
'পাকিস্তানী ভাষা'	১৩৩
পাচপার্ত্তুর জীবনাবসান	১৩৪
উন্নয়ন দশক বনাম কালদশক	১৩৫
পশ্চিমেও আন্দোলনের আওয়াজ	১৩৬
সমকালীন রাজনৈতিক দলসমূহ	১৩৮
বন্দী নেতাদের তালিকা	১৪২
বরফ গলার শুরু	১৪৩
আইয়ুব খানের বোধদয়	১৪৩
নাটকীয় পরিবর্তনের সূচনা	১৪৪
শিক্ষার হাল : ১৮৯৬-১৯৬৯	১৪৬
উনসত্তরের পটভূমি	১৫৬
এগার দফা রচনা	১৫৭
এগার দফার রূপরেখা	১৬০
রাজনৈতিক জোট 'ডাক' গঠন	১৬৩
কর্মসূচী নিয়ে দ্বন্দ্ব	১৬৪
প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরু	১৬৫
এন, এস, এফ-এ ভাঙ্গন	১৬৬
জীবনের দাবী আজ এতই বিরাট	১৬৭
বিভেদমূলক প্রচার পত্র	১৬৮
চীন পন্থায় আন্ত: দ্বন্দ্ব	১৬৯
গণঅভ্যুত্থান	১৭০
রাজবন্দীদের মুক্তি	১৭৫
'বঙ্গবন্ধু' উপাধি	১৭৫
নিহত তালিকা : ১৯৬০-৬৯	১৭৬
গোল টেবিল বৈঠক	১৭৮
পুনরায় সামরিক শাসন	১৮০

দলিলপত্র সূচী

১. ভাষা আন্দোলনের পর্যালোচনা, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯৫২ ৫
২. ঘোষণাপত্র, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ (১৯৬৮), ১৫, ৬৪, ১১৭
৩. সাধারণ সম্পাদকের (শেখ মজিবুর রহমান) প্রতিবেদন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ১৯৫৫ ১৮
৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিল পত্র, প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৩৮৯ (১৯৮২) ২৪, ১৬০
৫. পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে (১৯৬৮) গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট ৫৪, ৩৯
৬. স্বাধীন পূর্ববঙ্গ দাবী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির 'রাজনৈতিক চিঠি' পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯৬২ ৫৫
৭. জেলা ইউনিটগুলির কাছে প্রেরিত কেন্দ্রীয় কমিটির দলিল, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯৬২ ৫৬
৮. জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, পাকিস্তান সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, করাচী, ১৯৫৯ ৬৬
৯. 'শিখা' রাজনৈতিক সাময়িকী, ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৯৬৪ ৮২
১০. একাশি (কমিউনিস্ট) পার্টির দলিল (১৯৬০, মস্কো) ১০৬
১১. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, প্রাদেশিক সম্মেলনে পঠিত কার্যকরী সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, ১৯৬৫ ১১৩
১২. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন), জরুরী প্রাদেশিক সম্মেলন, কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর প্রতিবেদন, ১৯৬৬ ১১৪
১৩. শেখ মুজিবুর রহমান, আমাদের বাঁচার দাবী, ৬ দফা কর্মসূচী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ১৯৬৯ ১২২
১৪. শিক্ষা ও পরিকল্পনা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, ১৯৮১ ১৫৩

১৫.	শিক্ষা সমস্যা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), ১৯৭০	১৫৫
১৬.	গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ১৯৬৯	১৭৯
১৭.	যুক্তফ্রণ্টের পরিপত্র, (শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চিঠি), ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪	১৮৩
১৮.	মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফণ্টের পুস্তিকা, মার্চ, ১৯৫৪	১৮৪
১৯.	যুক্তফ্রণ্টের পরিপত্র (শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্বাক্ষরিত), মার্চ, ১৯৫৪	১৯৩
২০.	পূর্ব পাকিস্তান, গোয়েন্দা শাখার (শহীদ দিবস পালন সম্পর্কে) গোপন রাজনৈতিক রিপোর্ট, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ১৯৬১	২০৬
২১.	পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে গোপন প্রতিবেদন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ১৯৬১	২১৩
২২.	পূর্ব পাকিস্তানের সম্ভাব্য ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন, ১৯৬২	২১৫
২৩.	৯২-ক ধারা জারীর বিষয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর ব্যাখ্যা; ৩১ মে, ১৯৫৪	১৯৫
২৪.	সামরিক আইন জারীর বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মীর্জার ব্যাখ্যা, ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮	২০২
২৫.	প্রচারপত্র : পূর্ববঙ্গ আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন, ১৯৫৫	১৯৮
২৬.	আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল প্রসঙ্গে ইস্কান্দার মীর্জা, ১৯৫৮	২০৫
২৭.	যে কথা এতদিন বলিনি, নূরুল আমীনের পুস্তিকা, ১৯৭০	২৪৩
২৮.	উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান মূল্যায়ণ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), ১৯৭১	২৪৮
২৯.	উনসত্তরের গণআন্দোলন পর্যালোচনা, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (ছাত্র ইউনিয়ন, মেনন), ১৯৬৯	২৫৪
৩০.	সর্বদলীয় ছাত্র সমাজের শহীদ দিবস প্রচারপত্র, ১৯৬৩	২১৯
৩১.	পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের শিক্ষা দিবস পালনের প্রচারপত্র, ১৯৬৩	২২২
৩২.	পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও, ১৯৬৪	২২৩
৩৩.	ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে তিন ছাত্র সংগঠনের নির্বাচনী প্রচারপত্র, ১৯৬৪	২২৪
৩৪.	বাংলা ভাষার বর্ণ বর্জনের প্রতিবাদে সংস্কৃতি সংসদের প্রচারপত্র, ১৯৬৮	২২৯
৩৫.	লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি বুদ্ধিজীবীদের প্রচার-পত্র, ১৯৬৯	২৩০

৩৬. এন,এস,এফ-এর প্রচার-পত্র, ১৯৬৯ ২৩৩
৩৭. পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার-পত্র, ১৯৬৯ ২৩৫
৩৮. গণতান্ত্রিক জোট 'ডাক'-এর ইশতেহার, ১৯৬৯ ২৩৬
৩৯. ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রচারপত্র, ১৯৬৯ ২৪০
৪০. আইয়ুবের পত্র ২৪২
৪১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সংসদ (ডাকসু)-র সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের তালিকা ২৫৯
৪২. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নামের তালিকা ২৬১
৪৩. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের নামের তালিকা ২৬২
৪৪. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের নামের তালিকা ২৬২
৪৫. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)-এর সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের নামের তালিকা ২৬২
৪৬. জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন, এস, এফ-)এর সভাপতি- ২৬৩
সাধারণ সম্পাদকদের নামের তালিকা ২৬৩
৪৭. পাকিস্তান ছাত্রশক্তির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের নামের তালিকা ২৬৩
৪৮. ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের নামের তালিকা ২৬৪
৪৯. Report of the commission on student problem and welfare, Govt. of Pakistan, Ministry of Education, Karachi 1966. ৯৫, ১৪৯, ১৫০
৫০. Report of the Indian Education commission, vol-I, 1883-4 ১০৩
৫১. National Assembly of Pakistan, Debates, official Report, 1967 ১২৪, ১২৫, ১২৬
৫২. Education for all, paper and proceedings of the symposia, East Pakistan Education week, 1966-67 ১৪৭, ১৪৮, ১৫২
৫৩. Education in progress, proceedings of the symposia, East Pakistan, Education week, 1958 ১৫১
৫৪. Report on Progress of Education in East Bengal and Assam, 1907-8 to 1911-12, vol II ১৫৪
৫৫. নামসূচী ২৬৫

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভাষাকে কেন্দ্র করে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের রেশ ও জঙ্গিপনা মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই ঝিমিয়ে এসেছিল। চরম নির্যাতন, গ্রেফতার, হুলিয়া ইত্যাদি কারণ ছাড়াও প্রধান যে ত্রুটি ভাষা আন্দোলনে কাজ করছিল তা হচ্ছে সাংগঠনিকভাবে বৃহত্তর পূর্ব বাঙলায় এই প্রবল স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে ধরে রাখার মতো কোনো শক্তি তৎকালে এই অঞ্চলে ছিল না। (বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে জানতে পারবো)। ছাত্রসংগঠনগুলোও ছিল তথৈবচ। যুব সংগঠনের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি প্রভাবিত পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগেও সীমাবদ্ধতা ছিল। তাঁদের এই সীমাবদ্ধতা সম্ভবতঃ সভ্যদের নিয়ম-শৃঙ্খলা পর্যন্ত গড়িয়েছিল। কারণ দেখা যাচ্ছিল, ৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা প্রশ্নে যুবলীগের নেতা ও কর্মীরা উদ্যোগী ভূমিকা পালন করলেও যুবলীগ কিন্তু সাংগঠনিকভাবে দলীয় সভা করে কিছু করতে পারছে না।

ফলে আন্দোলন অনেকটা নির্ভর করছিল আসলে গুটি কয়েক ব্যক্তি বিশেষের জেদ অথবা ইচ্ছা কিংবা উদ্যোগের ওপর। কিন্তু কোনো আন্দোলনই গুটি কয়েক নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করতে পারে না। আন্দোলনের অবশ্যই সাংগঠনিক রূপ থাকতে হবে। কতকগুলি ঘটনা ঘটাবার মতো রোমান্টিকতার জন্য একটা আন্দোলন জন্ম নিতে পারে না।

২১ ফেব্রুয়ারীর মতো একটি মহান আন্দোলন বাঙলার জনসমাজে আরো কি প্রভাব ফেলতে পারতো আজ আর সে বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। তবে সেদিনের ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার মধ্য দিয়ে এবং কয়েকটি অমূল্য প্রাণের আত্মত্যাগের মধ্যেই এর চরম সার্থকতা ও সফলতা নিহিত একথা মেনে নেওয়া মুস্কিল। একুশের মহান তাৎপর্যকে অন্য আর সব মাহাত্ম্য থেকে বঞ্চিত করে শুধুমাত্র যদি তার ন্যূনতম দাবীটির দিকে তাকাই তাহলে দেখবো এই আন্দোলনের পটভূমি বাঙলা ভাষার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পর্যন্তও ব্যর্থ হয়েছে।

বাঙলা ভাষা এযাবৎ তিনবার সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।

১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গৃহীত হয়। এই সংবিধানের রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত ২১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ :

214-(I) The state languages of Pakistan shall be urdu and Bengali.........[১]

১৯৬২ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান 'The constitution of Republic of Pakistan' চালু করেন।

এই সংবিধানে জাতীয় ভাষা সংক্রান্ত ২১৫ নম্বর অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ :
215-(1) The National languages of Pakistan are Bengali and urdu.[২]

১৯৭২ সালে ৪ নভেম্বর বাঙলাদেশ গণপরিষদ কর্তৃক প্রবর্তিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশের সংবিধানের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ :

অনুচ্ছেদ-(৩) : প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাঙলা।[৩]

কিন্তু বাঙলা ভাষা জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা পায়নি। আর এর পেছনে ছাত্র-জনতার সুদূর প্রসারী যে আর্থ-সামাজিক চিন্তা ছিল তা হয়ে পড়লো সুদূর পরাহত। পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রণ্টের মাধ্যমে এদেশে মুসলিম লীগের যে তথাকথিত মৃত্যুর কথা খুব গৌরব করে বলা হয় তাও ছিল অপরিপক্ক। আর এই সাময়িক বিজয়কেও আন্তঃকোন্দল ও স্বার্থপরতার জন্য ধরে রাখা যায় নি। আর যুক্তফ্রণ্ট করতেও যে একমাত্র ছাত্র সমাজকে কি প্রচণ্ড পরিশ্রম ও ত্যাগ করতে হয়েছে তাও একটা প্রধান দুর্বলতা ছিল বৈকি!

অবশ্য ভাষা আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতাটি ছিল সংগঠন বা জোটের চেয়ে ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালখুশী। আমরা কতকগুলি উদ্ধৃতি নিয়ে দেখাবো, সে সময়ের যাঁরা ভাষা আন্দোলনের মূল নেতা ছিলেন তাঁরা নিজেরাই এগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন। তাঁদের উদ্যোগে সেদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ

১. The constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1956
২. The constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1962
৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রেস, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা,৩

হয়েছিল সত্য কিন্তু ১৪৪ ধারা ভাঙ্গাই শেষ কথা নয়। আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং হঠকারী পথ এড়িয়ে মূল লক্ষ্যে আন্দোলনকে ধরে রাখাই ছিল বড় কথা।

প্রথমেই এ সম্পর্কে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক অলি আহাদের কথা। তিনি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা প্রশ্নে সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সভায় বলেন,

"...১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া সরকারকে সমুচিত জবাব দিব। Come what may—যাহা হয় হইবে। ...সুতরাং Now or never"।[৪]

এসব ব্যক্তিগত আবেগের কথা। এই আবেগের বশেই তিনি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন থাকছে কি থাকছে না সে সবের দিকেও তাকান নি। ফলে তিনি ভোটা-ভুটির কথা বলেন। ভোটে হেরে গেলেও অলি আহাদ চিৎকার করে তা মানতে অস্বীকার করেন। কারণ মোহাম্মদ তোয়াহার ভাষায় "অলি আহাদ discipline বুঝতো না"।[৫] তারপর বেশ কয়েকদিন পরের কথা। একের পর এক হঠকারী পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তে যখন আন্দোলন এক নাজুক অবস্থায় চলে আসে তখন অলি আহাদের উপলব্ধি ঘটে যে সাংগঠনিক ভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে অথবা সংগঠনে জোর করে নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে কিংবা সংগঠনের সিদ্ধান্তের বাইরে নিজেদের তৎপরতা আন্দোলনকে ভুল পথে নিয়ে গেছে। সস্তা বিপ্লবী বুলি ও গরম গরম কর্মসূচী ঘোষণার মধ্যেই বিপ্লবীপনা নিহিত থাকে না এমন উপলব্ধির পর অলি আহাদ নিজেই ২৩ ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সভায় প্রস্তাব করেন,

"স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন সম্ভাব্য চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে এবং আন্দোলনে ভাটার চিহ্ন দেখা দিয়াছে। তদুপরি অবিরাম আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার মতো সাংগঠনিক শক্তি এই পর্যায়ে আমাদের নাই। সুতরাং Honourable retreat বা সম্মানজনক পশ্চাদপসারণ আমার দৃঢ় মত।"[৬]

৫২-র ভাষা আন্দোলনের এমন আরেকজন উদ্যোগী আবদুল মতিনের বেলায়ও দেখা গেছে একই রকম ঘটনা। ভাষা আন্দোলন পূর্ব প্রস্তুতিতে 'পতাকা

---

৪. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি (১৯৪৫ থেকে ৭৫), ঢাকা, পৃষ্ঠা, ১৪৮-১৪৯

৫. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, তৃতীয় খণ্ড, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা, ২৫৮

৬. অলি আহাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ১৭৩

দিবসের' ডাক দেওয়া হয়েছিল। আবদুল মতিনের ভাষ্যেই দেখা যাক এই পতাকা দিবসের ডাক দিয়েছিল কে?

"বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে পতাকা দিবস পালনের আলোচ্যসূচী দিয়ে আমি কমিটির পরবর্তী বৈঠক আহ্বান করলাম।...এই বৈঠকেও কোন সদস্য উপস্থিত না হওয়ায় আমি কমিটির ধারা বিবরণী খাতায় লিখলাম 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে পতাকা দিবস পালনের প্রস্তাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির অত তারিখের বৈঠকে সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হল'। পতাকা দিবস পালনের এইভাবে 'সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত' প্রস্তাবটি আমি বাংলাকে সমর্থন করে এমন একমাত্র দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় ছাপার জন্য দিয়ে আসলাম"।

"সে পতাকা দিবসও উদ্যোগী ভূমিকার অভাবে সম্ভাবনা সত্ত্বেও তেমন সাফল্য অর্জিত হয় নাই"।[৭]

১৪৪ ধারা ভাঙ্গা, না ভাঙ্গা প্রশ্নে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের ২০ ফেব্রুয়ারী সভার দিন আবদুল মতিন তাঁর বক্তৃতায় বলেন,

"বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটিই হলো মাতৃসংগঠন (Parent body) এবং সেই সংগঠনই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সুতরাং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির কোন এখতেয়ার নেই অন্য ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের"।[৮]

বদরুদ্দীন উমর জানিয়েছেন, আবদুল মতিন এই যে বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের উদ্ধৃতি (রেফারেন্স) দিয়ে কথা বলেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণই করেন নি। অথচ আবদুল মতিন সর্বদলীয় পরিষদে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিকৃত ও অসত্যভাবে উত্থাপন করেছিলেন।

ভাষা আন্দোলনের পর্যালোচনায় এসব বিষয় একটু আনা হল এই জন্য যে, একটা ফলপ্রসূ আন্দোলনের জন্য চাই ধৈর্য ও স্থৈর্য। আবেগের বিষয় আন্দোলন-

---

৭. আবদুল মতিন, ভাষা ও একুশের আন্দোলন, ১৯৭১, নন্দন প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা, ২২,২৩ এবং ৫২

৮. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৫৭

সংগ্রামে বন্ধ্যা (অন্ততঃ পরিচালনার ক্ষেত্রে)। উদ্যোগী নেতৃবৃন্দ ভুল করেছিলেন কি সঠিক করেছিলেন এমন বিতর্কে আমরা যেতে চাই না কিন্তু পারস্পরিক সংহতি ও ঐক্য যে জেদাজেদির কারণে বিধ্বস্ত হয়েছিল তার সুদূর প্রসারী প্রভাব পূর্ব বাঙলার রাজনীতিতে পরবর্তীকালে ভাস্বর হয়ে ওঠে। এবং এসব নেতৃবৃন্দকে ৫ মার্চের কর্মসূচী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁদের গৃহীত একের পর এক পদক্ষেপগুলির প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য।

ভাষা আন্দোলন অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির একটি দলিলের (দলিলটি ছিল গোপনীয় এবং তা একমাত্র পার্টি সভ্যদের মধ্যেই প্রচারিত হয়েছিল) পর্যালোচনা থেকেও তৎকালীন আন্দোলনের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়:

"এবার আন্দোলনের একটানা যেরূপ চারিদিন হরতাল চলিয়াছিল এবং যেরূপভাবে বিভিন্ন শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল সেইরূপ ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম পূর্ববঙ্গে আর কোনদিন অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই ব্যাপক গণসংগ্রাম পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে।

গণ আন্দালনের আঘাতে সরকার তখন পিছু হটিতে বাধ্য হয় এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী সরকার আইন সভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণপরিষদের নিকট সুপারিশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে।...গণশক্তির সামনে পূর্ববঙ্গ সরকারের এই পশ্চাদপসরণ ও এই প্রস্তাবকে আন্দোলনের প্রাথমিক জয় বলিয়াই গণ্য হইবে---ইহাই আন্দোলনের প্রাথমিক লাভ।

দ্বিতীয়তঃ এই আন্দোলনের তীব্রতার মধ্য দিয়া জনগণের চেতনাতেও এক নূতন পরিবর্তন আসিয়াছে। এর আগে পূর্ববঙ্গের জনগণের বিভিন্ন আন্দোলনগুলি প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল বিশিষ্ট শ্রেণীর বিশিষ্ট অর্থনৈতিক দাবী দাওয়ার ভিতর।... এই আন্দোলনের এক আঘাতেই জনগণের চেতনা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং মুসলিম লীগ সরকার জনগণ হইতে বহুল পরিমানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা এই আন্দেলনের দ্বিতীয় লাভ।...

ভাষা আন্দোলনের উপরোক্ত মুল শিক্ষাগুলি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনের নেতৃত্বও সামগ্রিকভাবে আন্দোলনের ভিতর যে সব দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও পর্য্যালোচনা করা দরকার।

প্রথমতঃ ইহা বলা দরকার যে আন্দোলনের প্রথম দিকে নেতৃত্বের ভিতর বাঙ্গালী জাত্যাভিমানের ভাবধারা দেখা যায়। ৩১শে জানুয়ারী ঢাকার বার লাইব্রেরীতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সভায় আন্দোলনের মূল দাবী সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী স্পষ্ট ভাবে উঠান হয় এবং উর্দ্দু ও অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে বলা হয় যে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মতামত লইয়া অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হউক। সংগ্রাম পরিষদের ভিতর আওয়ামী লীগের নেতাগণ (তাহারাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ) ভাষার আন্দোলনকে শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গ বাসীদের লড়াই বলিয়া মনে করে এবং সেজন্য তাহারা অন্যান্য ভাষা সম্পর্কে কিছু বলিতে বা পাকিস্তানের জনগণের সকল ভাষার সমান মর্যাদার আওয়াজ বলিতে চান নাই। আন্দোলনের ভিতরে এই ভাবধারা চলিতে থাকিলে শোষকগোষ্ঠি ইহাকে উর্দু বিরোধী বা পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন বলিয়া কুৎসা প্রচার করিয়া বাঙ্গালী অবাঙ্গালী বিভেদ আনিবার সুযোগ পাইত।...

দ্বিতীয়তঃ সংগ্রাম পরিষদের ভিতরে আওয়ামী লীগের বহু নেতাই আন্দোলনের সময়ে বহু দোদুল্যমানতা দেখাইয়াছেন। ২১ তারিখের পূর্বে তাহারা ২১শের সাধারণ হরতালের প্রস্তুতির কাজে বহু গাফিলতি করিয়াছেন, বহু বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা নগরীতে ছাত্র শোভাযাত্রারও তাহারা বিরোধিতা করিয়াছেন এবং ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা জারী করিলে তাহারা পশ্চাদপসরন করিয়া সংগ্রাম পরিষদের ভিতর ভোটের জোরে ২১ তারিখে সভা শোভাযাত্রা না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগের সেই নেতাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গী সংস্কারবাদী দোষে দুষ্ট এবং গণ সংগ্রাম বিমুখী।

...২১শে তারিখের পরবর্তী দুই দিন ঢাকা নগরীতে গৌরবময় ঘটনাবলীর সময়ে সংগ্রাম পরিষদের ভিতরকার আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ইহা হইতে দূরে সরিয়া থাকেন। তবে গণ আন্দোলনের জোয়ারে আবার তাহারা ২৩শে তারিখ হইতে সংগ্রাম পরিষদের কাজে যোগ দেন। তখন দেখা গেল যে তাহারা অতিমাত্রায় বামপন্থি হইয়া উঠিয়াছেন। তাহাদের প্রস্তাব মতেই ২৫ তারিখে সরকারকে সংগ্রাম পরিষদের ৯ দফা দাবী মানিবার জন্য ৯৬ ঘণ্টার চরম পত্র দেওয়া হয় এবং ৫ই মার্চ শহীদ দিবসে আবার সাধারণ হরতাল ঘোষনা করা হয়। আমাদের কমরেডরাও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

এভাবে চরম পত্র প্রদান ও ৫ই মার্চ হরতাল ঘোষণা করা ভুল ছিল বলিয়াই আমরা মনে করি। কারণ একটানা চার দিন হরতালের মাথায় ২৫শে তারিখে ঢাকা নগরীতে সুউচ্চ শিখরে পৌঁছিয়াছিল। এরপর স্বভাবতই আন্দোলনে কিছুটা ভাটা আসার সম্ভাবনা ছিল। ইতিমধ্যে সরকারও নানা প্রকার বিভেদমূলক প্রচার চালাইয়াছে ও রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারী নামাইয়া দিয়াছে। অপর দিকে আন্দোলনের সাংগঠনিক ভিত্তিও ছিল দুর্বল। এই পরিস্থিতিতে বোঝা উচিত ছিল যে তখন সরকার দাবী না মানিলে আর একটি সংগ্রাম দ্বারা চরমপত্রের সম্মান রক্ষা করা যাইবে না এবং ৫ই মার্চ সাধারণ হরতাল করাও কঠিন। কাজেই আমাদের মনে হয় আন্দোলনের দায়িত্বশীল নেতৃত্ব হিসাবে সংগ্রাম পরিষদের কার্য্য ছিল সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়া প্রাথমিক জয় হইয়াছে এই ঘোষণা করিয়া এখন সভা, শোভাযাত্রা, জমায়েত ও সাংগঠনিক কাজের দিকে আন্দোলনকে প্রবাহিত করা। তাহা হইলে আন্দোলনকে সুসংগঠিতভাবে গুটাইয়া নেওয়া যাইত এবং আন্দোলনের লাভ গুলিকেও আরো সংহত করা যাইত।

আন্দোলনের দ্বিতীয় দুর্বলতা ছিল সাংগঠনিক। ঢাকা নগরীতে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় আন্দোলনের সংগঠন ছিল না বলিলেও চলে। আন্দোলনের মূল সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল ছাত্রদের হোষ্টেলগুলি এবং সরকার যখন সেগুলি বন্ধ করিয়া দিল তখন আন্দোলনের জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং পরে সরকারের প্রচণ্ড দমননীতির সামনে আন্দোলনকে আগাইয়া নেওয়া গেল না।"[৯]

ভাষা আন্দোলন পরবর্তী পরিস্থিতি

৫২-র ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনের পর ঝিমিয়ে পড়া অবস্থা থেকে ছাত্র আন্দোলন একটু একটু করে ধীর গতিতে হলেও এগিয়ে আসছিল। এই সময় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ছাড়াও আরেকটি ছাত্র সংগঠনের আবির্ভাব ঘটেছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের। ছাত্র ইউনিয়নের ডিসেম্বর সম্মেলনই ৫২ সালের ছাত্র আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য শেষ খবর। ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনে আসন্ন ২১ ফেব্রুয়ারী (৫৩ সালের) দেশব্যাপী ঘটা করে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ছাত্রলীগেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

---

৯. কমিউনিস্ট পার্টির এই গুরুত্বপূর্ণ গোপন দলিলটি আগ্রহী পাঠক আরো বিস্তারিত ভাবে পড়তে পারেন, "ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, কতিপয় দলিল" (শহীদুল্লাহ কায়সার থেকে বদরুদ্দীন উমর সংগৃহীত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা, ৩৪১-৩৪৯

এদিকে ৫৩ সালের শুরুতেই কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ ৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীকে 'শহীদ দিবস' হিসাবে পালনের কথা ঘোষণা করে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এক ঘোষণায় ছাত্র-জনসাধারণের কাছে ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারী শহীদ স্মরণে রোজা রাখার আহ্বান জানায়।

২১ ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস পালনের প্রস্তুতি যখন প্রায় শেষ, ঠিক তখন (১৮ ফেব্রুয়ারী) ছাত্র নেতাদের সচিবালয়ে ডেকে পাঠান হয়। সংগ্রাম পরিষদ থেকে অবদুস সামাদ, মোহাম্মদ সুলতান (ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি), আখতার উদ্দিন, শামসুল হক, জিল্লুর রহমান (মুসলিম ছাত্রলীগ), ইব্রাহিম তাহা (ইসলামিক ব্রাদার হুদ) ও গাজীউল হককে প্রতিনিধি করে পাঠানো হয়। আলোচনায় সরকার পক্ষে ছিলেন চীফ সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইসহাক, আই.জি. দোহা এবং জি.ও.সি মেজর জেনারেল আদম। দু'পক্ষে উত্তপ্ত আলোচনা হলেও সবশেষে সমঝোতা হয় যে সরকার ২১ ফেব্রুয়ারী মিছিলে বাধা দেবেন না অথবা পুলিশ বাহিনীও গাড়ী নিয়ে মিছিলের আগে-পিছে থাকবে না। ছাত্ররাও আশ্বাস দেয় মিছিল শান্তিপূর্ণ হবে, কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না।

২০ ফেব্রুয়ারী রাত ২টায় এইজন্য ছাত্রদের একটি বিশেষ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয় এবং তাদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাজউদ্দিন আহমদ এবং গাজীউল হককে পিকেটিং করার জন্য রাত সাড়ে তিনটায় রেল ওয়ার্কশপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[১০]

২০ ফেব্রুয়ারী ছিল শুক্রবার। এদিন ঢাকায় জুম্মার নামাজের পর ভক্তরা সজল চোখে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করে। ছাত্রাবাসগুলিতে ছাত্ররা অনেকেই এদিন সংগ্রাম পরিষদের ডাকে রোজা রাখে।[১১]

২১ ফেব্রুয়ারী খুব ভোর থেকেই প্রভাত-ফেরী করে ছাত্র-জনতা দলে দলে যখন মিছিল করে আজিমপুর গোরস্থানে যাচ্ছিলেন তখন সকলের মুখই অশ্রু সজল হয়ে পড়ে। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া ভালবাসার ফুলে-ফুলে ছেয়ে যায় শহীদদের মাজারগুলি।

---

১০. গাজীউল হক, স্মৃতিচারণ, বাংলা একাডেমী, একুশের প্রকাশনা ১৯৮০, পৃষ্ঠা, ১৫৪-৫৬
১১. সাপ্তাহিক ইত্তেফাক, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

মিছিলগুলি এরপর বিভিন্ন রাস্তা অতিক্রম করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় গিয়ে উপস্থিত হতে থাকে। দুপুরের দিকে প্রায় ৩০ হাজারের বেশী ছাত্র জনতার এক বিরাট মিছিল আরমানীটোলা ময়দানে সর্বদলীয় কর্মপরিষদের জনসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবর রহমান এবং যুব লীগের ইমাদুল্লাহ মিছিলের নেতৃত্ব দেন। সড়ক প্রদক্ষিণ করার সময় বিভিন্ন বাড়ী-ঘরের ছাদ থেকে মেয়েরা মিছিলের উদ্দেশ্যে পুষ্প-বর্ষণ করে। নেতৃবৃন্দ মিছিলের শান্তিরক্ষার দিকে ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। স্বেচ্ছাসেবকদের অধিনায়ক ছিলেন মুসলিম ছাত্র-লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ ওয়াদুদ।

আরমানীটোলা ময়দানে বিকাল ৩টার জনসভায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আতাউর রহমান খান। মুসলিম ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, যুবলীগ ও আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও প্রতিটি সংগঠন থেকেই সেখানে বক্তব্য রাখা হয়।

২১ ফেব্রুয়ারী সকাল থেকেই ঢাকাস্থ বিদেশী কূটনৈতিক মিশনগুলোর চররা সারাদিন শহর ঘুরে বেড়ায়। এ উপলক্ষে রাজধানী করাচী থেকে ফরাসী ও মার্কিন দূতাবাসের বিশেষ প্রতিনিধিরা ঢাকায় আসেন। এমনকি আরমানি-টোলা ময়দানের জনসভায়ও তাঁরা উপস্থিত থাকেন।

সেদিন জনসভা ও মিছিলের প্রধান শ্লোগান ছিল, 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক', 'জালেম লীগশাহী ধ্বংস হোক', 'গণপরিষদ ভেঙ্গে দাও', 'লীগ শাহীর দালাল মর্নিং নিউজ ধ্বংস হোক' ইত্যাদি।

এদিন ঢাকা কলেজ ও ইডেন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে (এসময় ইডেনের বিজ্ঞান শাখার মেয়েদের ঢাকা কলেজে ব্যবহারিক ক্লাশ হতো এবং ঢাকা কলেজ ছিল পুরাতন রেল ষ্টেশনের পেছনে সিদ্দিক বাজারে আর ইডেন কলেজ ছিল বকশী বাজারে, বর্তমান বদরুন্নেসা কলেজে) একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করার চেষ্টা করে কিন্তু দুই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিলে তাতে বাধা দেন। ঢাকা কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে এজন্য বহিষ্কার করা হয়। পরে সন্ধ্যায় ঢাকা কলেজের ছাত্ররা ব্রিটানিয়া সিনেমা হলে (বর্তমান বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এলাকায় এই প্রেক্ষা-গৃহটি অবস্থিত ছিল) এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এবং অনেক-

দিন পর এই প্রথম "আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানটি গাওয়া হয়। ঢাকা কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবদুল গাফফার চৌধুরীর "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী" কবিতাটি এই অনুষ্ঠানেই প্রথম সুরারোপ করে গাওয়া হয়।[১২]

যুবলীগের এক অনুষ্ঠানে (গেণ্ডারিয়া ধূপখোলার ময়দানে) অবদুল গাফফার চৌধুরী এই কবিতাটি প্রথম আবৃত্তি করেন। ৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে বুটেলবিদ্ধ জনৈক তরুণের শিয়রে বসে গাফফার চৌধুরী কবিতাটি লিখেছিলেন। সেখান থেকে রফিকুল ইসলাম (বর্তমানে ডক্টর) কবিতাটি নিয়ে আবদুল লতিফকে সুরারোপ করতে দেন। ঢাকা কলেজের অনুষ্ঠানের পর আলতাফ মাহমুদ গানটি আবদুল লতিফের কাছ থেকে শিখে নেন এবং নতুন করে বর্তমানের সুরারোপটি করেন।

একুশের প্রথম সংকলন

ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী ছাত্ররা প্রথম একুশের সংকলন বের করে। সংকলনটির আয়তন ছিল ১/৪ ডিমাই মাপের। ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে এটি প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল : 'ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে জাতীয় জীবনে চির-স্মরণীয় ২১শে ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে যারা প্রাণ দিয়েছেন, সেই বীর শহীদদের স্মরণে'।

এতে ছিল ৩টি ছোট গদ্য রচনা, নজরুলের ৪টি কবিতা থেকে চয়ন করা মোট ১২টি ছত্র, আর শেষ পৃষ্ঠায় 'একুশের গান' শিরোনামে "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী" কবিতাটি। এতে রচনাকারীর নাম ছিল না। সংকলনের একটি গদ্য রচনার ভাষ্য :

"লক্ষ হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আজ জাগাই আমাদের শাশ্বত আদর্শের রুদ্রফেরী। কণ্ঠে কণ্ঠে আজ আওয়াজ তুলি---রাষ্ট্রভাষা, বাংলা চাই।"

সংকলনের শেষে ছিল একটি আবেদন; "নিজে পড়িয়া অপরকে পড়িতে দিন।"[১৩]

---

১২. সাপ্তাহিক ইত্তেফাক, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩
গাজীউল হক, স্মৃতিচারণ ১৯৮০
রফিকুল ইসলাম, স্মৃতিচারণ ১৯৮১, বাংলা একাডেমী

১৩. বশীর আল হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা,৫৪৩-৫৪৫,

ফজলুর রহমানকে কাল পতাকা

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান বাঙলার উত্তর বঙ্গ সফর করছিলেন। ২ মার্চ '৫৩ তিনি অনর্থ আবার ভাষার প্রশ্ন তুলে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলেন। বগুড়ায় এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, "বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রসঙ্গ যে ব্যক্তিই উত্থাপন করিবে সেই রাষ্ট্রের অনিষ্ট সাধন করিবে।" এ নিয়ে বগুড়ায় অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এরপর রংপুরে গেলে মন্ত্রীকে ছাত্ররা কাল পতাকা প্রদর্শন করে এবং "ফজলুর রহমান ফিরে যাও" ধ্বনি তোলে।[১৪]

৫৩ সালের ১১ মার্চ

'৪৮ সাল থেকেই পূর্ব বাঙলার ছাত্র সমাজ ভাষার দাবীর স্মরণে প্রতি বছর ১১ মার্চ পালন করতো। মাঝখানে '৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারীর ঘটনা ঘটে যাওয়ায় প্রতি বছর একুশে পালনের রেওয়াজ আসে। তথাপি '৫৩ সালেও সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের উদ্যোগে এদিবসের তাৎপর্য ও 'শিক্ষা পর্যায়ের' ওপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বার এসোসিয়েশনের মিলনায়তনে। আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় অংশ নেন ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও যুবলীগ নেতৃবৃন্দ। রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের শেখ মুজিবর রহমান ও জমিরুদ্দিন, কমিউনিস্ট পার্টির আবদুল মতিন, গণতন্ত্রী দলের মাহমুদ আলী, তমুদ্দুন মজলিশের আবদুল গফুর, সাংবাদিক ইউনিয়নের গোলাম মোস্তাফা প্রমুখ।

যুবলীগের উদ্যোগে সলিমুল্লাহ হলেও একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যুবলীগ সভাপতি আবদুস সামাদ এতে সভাপতিত্ব করেন। নারায়ণগঞ্জের তোলারাম কলেজেও এদিন অধ্যাপক আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ছাত্র-শ্রমিকরা দিবসটি উদযাপন করে।[১৫]

বন্দীমুক্তি ও ছাত্র বেতন হ্রাসের দাবীতে আন্দোলন

১৯৫৩ সালের মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত পূর্ব বাঙলায় চলছিল ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এবং তারও আগে থেকে আটক রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন।

---

১৪. সংগ্রাম, ৬ মার্চ, ১৯৫৩

১৫. সংগ্রাম, ১৩ মার্চ, ১৯৫৩, বশীর আল হেলাল, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস গ্রন্থে উদ্ধৃত

এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির বন্দীরাই ছিলেন বেশী। মাওলানা ভাসানীও জেলে ছিলেন। মাঝে মধ্যেই এনিয়ে বিক্ষোভ মিছিল হচ্ছিল। বন্দীরা কারাগারে নতুন ধরণের আংশিক অনশন (রোজার মতো—সারাদিন অভূক্ত থেকে সন্ধ্যায় আহার্য গ্রহণ) করছিলেন।

একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি ও সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে এক আইন জারী করেন। ঘোষণা প্রত্যাহারের জন্য ১০ জন ছাত্র নেতা কর্তৃপক্ষ বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। নেতৃবৃন্দ যেভাবে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলেন তা ছিল খুবই শান্তিপূর্ণ এবং পদ্ধতিগত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এক চরম উষ্কানীমূলক কাজ করে বসেন। পরদিন ১০ জন ছাত্র-নেতাকেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। দু'জন ছাত্র নেতার বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী কেড়ে নেওয়া হয় (গাজীউল হক ও জিল্লুর রহমানের)।

ঘটনাটি ছিল ১৪ এপ্রিলের। পরদিনই ছাত্ররা প্রতিবাদে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে এবং ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে। এর মধ্যে সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ছাত্র বেতন অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সরকারের এই শিক্ষা বিরোধী নীতি, বিদ্যালয়ের পবিত্রতা লঙ্ঘন, ছাত্রদের স্বাধীনতা হরণ, ভাষা, বর্ণ ও সংস্কৃতির ওপর হামলার প্রতিবাদে নতুন করে ছাত্র আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। ঢাকা কলেজের বহিষ্কৃত ছাত্রদের ব্যাপারটিও দাবীর মধ্যে সংযুক্ত হয়।

১৬ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসভা এবং ২৫ এপ্রিল (মতান্তরে ১৭ এপ্রিল) পল্টন ময়দানে (বর্তমান আউটার ষ্টেডিয়ামে) জনসভার ডাক দেওয়া হয়। কিন্তু এই জন্য মাইক ব্যবহারের অনুমতি সরকার না দেওয়ায় ছাত্র সংগঠনগুলি সিদ্ধান্ত নেয়, প্রতিটি ছাত্র ১০ থেকে ২০ জন লোকের কাছে জনসভার কথা প্রচার করবে। নির্দিষ্ট দিন বিকাল ৪টার পূর্বেই উদ্যোক্তাদের অবাক করে দিয়ে প্রতিকূল আবাহাওয়ার মধ্যেও ৩০ হাজারের বেশী লোক জনসভায় উপস্থিত হয়। এই সংখ্যা শেষপর্যন্ত ৫০ হাজারে পৌঁছে। ফলে মাইক বিহীন বক্তৃতা দিতেও সমস্যা দেখা দেয়। অনেকটা যাত্রার অভিনয়ের মতো বক্তারা মাঝখানে একটি টেবিল নিয়ে চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ফজলুল হক হলের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি জিল্লুর রহমান। মাওলানা ভাসানী এক দীর্ঘ বক্তৃতায় (ইতোমধ্যে তিনি ২১ এপ্রিল মুক্তি পান) সরকারের শিক্ষা নীতির সমালোচনা করেন।

ডি.পি.আই (শিক্ষা কর্তৃপক্ষ) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এদিনে অনুপস্থিত ও পিকেটিংরত ছাত্র-ছাত্রীদের নাম পাঠাতে নির্দেশ দেয়। ফলে ধর্মঘটে অংশ গ্রহণকারী বহু ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জরিমানা ও অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

পরিস্থিতি আরো চরম আকার ধারণ করতে পারে আশঙ্কা করে পরদিনই কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। এই সময় খোন্দকার গোলাম মোস্তাফা (ছাত্র ইউনিয়ন নেতা) ও গাজীউল হককে (যুবলীগ নেতা) গ্রেফতার করা হয়। মে মাসের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও ধর্মঘট চলতেই থাকে। প্রায় প্রতিদিনই মিছিল চলতে থাকে। সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, কামরুজ্জামান (মুসলিম ছাত্রলীগ) ও মোহাম্মদ সুলতান (ছাত্র ইউনিয়ন) এসময় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে ছাত্ররা মিছিল করে প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের বাস ভবনও ঘেরাও করে।

শেষ পর্যন্ত সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রসংগঠনগুলির একটা সমঝোতা হয়। কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার আদেশ তুলে নেন। এবং সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা সংশোধন করে বলা হয়, সভা করার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রোক্টরের অনুমতি নিতে হবে। এবারের সরকারের ঘোষণায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে রাখা নিয়ে এটা ছিল তখনকার দিনের স্মরণাকালের দীর্ঘতম ধর্মঘট (১৮ এপ্রিল থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত এই ধর্মঘট চলেছিল)। ঢাকা কলেজের ছাত্ররাও একই সঙ্গে ধর্মঘট করে আসছিল। অধ্যক্ষ ছাত্রদের ওপর থেকে বহিষ্কারাদেশ তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

এবারের ছাত্র আন্দোলনের মতো এতো সফল আন্দোলন ইতোপূর্বে আর ঘটেনি। ছাত্ররা তাদের প্রায় প্রতিটি দাবীই কর্তৃপক্ষ দ্বারা পূরণ করে তবে ক্লাসে ফিরে যায়। ছাত্রসংগঠনগুলি বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সারাদেশে এবার সংগঠিত হতে থাকে। অসাম্প্রদায়িক ও সুস্থ ছাত্র রাজনীতির একটা ধারা শুরু হওয়ার অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে।

ভাষা প্রশ্নের নটের গুরু খাজা নাজিমুদ্দিন এ বছরই (১৮ এপ্রিল ১৯৫৩) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ষড়যন্ত্রমূলক ভাবেই বহিষ্কৃত হন। শত দালালী ও বিশ্বাসঘাতকতা করেও তিনি শেষ-রক্ষা করতে পারেননি। কেন্দ্রের গভর্ণর-জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত (বগুড়ার) মোহাম্মদ আলীকে ডেকে পাঠান এবং নতুন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে নিযুক্ত করেন।

যুক্তফ্রণ্ট পূর্ব 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্ট'

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ঐতিহাসিক যুক্তফ্রণ্ট গঠনের কথা সকলেরই জানা। কিন্তু এই যুক্তফ্রণ্ট গঠনের পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করেছিল ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্বাচনের 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্ট' নামক একটি জোট যা আজ ইতিহাসে চাপা পড়ে গেছে। ১৯৫৩ সালে ডাকসুসহ বিভিন্ন ছাত্রাবাসের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের সমর্থক নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের মোকাবেলা করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন যৌথ পরিষদ দেওয়ার লক্ষ্যে 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্ট' নামক একটি জোট গঠন করে।

ছাত্র ইউনিয়নের এস.এ. বারী এটিকে সহ-সভাপতি এবং ছাত্র লীগের জুলমত আলী খানকে সাধারণ সম্পাদক করে যৌথ পরিষদ থেকে মনোয়ন দান করা হয়। এই পরিষদ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয় তথা সারাদেশের ছাত্র রাজনীতি থেকেই সরকারী 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' নামক সরকারী সংগঠনটিকে চির বিদায় নিতে বাধ্য করে। সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের নির্বাচনেও আবদুল লতিফ আলাউদ্দিন আল আজাদ (ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত) পরিষদও জয়লাভ করে।

পরবর্তী পর্যায়ে দেশের বৃহত্তর রাজনীতিতে যে যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হয়েছিল ছাত্রদের এই গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্ট ছিল তার পূর্বসুরী। এই ফ্রণ্ট এবং তার সাফল্যেই রাজনীতিকদের চোখ খুলে দেয় ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী সংগ্রামে লড়াই করার প্রয়োজনীয়তার কথা।

ছাত্রলীগ অসাম্প্রদায়িকরণ

বস্তুত ভাষা আন্দোলনের পর অসাম্প্রদায়িক ছাত্র রাজনীতির তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। এসময় একমাত্র নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নই

এ সম্পর্কে অগ্রগামী ছিল। ছাত্রলীগের রাজনীতি মূলত অসাম্প্রদায়িকই ছিল, তথাপি সংগঠনের নামে 'মুসলিম' শব্দটি একটা প্রধান বাধা হিসাবে দাঁড়ায়।

১৯৪৯ সালে জানুয়ারীতে সলিমুল্লাহ হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির সভায় এ নিয়ে তীব্র বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মুসলিম ছাত্রলীগ নেতা অলি আহাদ সংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক করার এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ছাত্রকেই তার সদস্য হওয়ার অধিকার প্রদানের দাবীতে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুর রহমান চৌধুরী ও নঈমুদ্দিন আহমদের তীব্র বিরোধিতার মুখে তা বাতিল হয়ে যায়।[১৬] পরবর্তীকালে ছাত্রলীগের ঘোষণাপত্রে এ সম্পর্কে ও অসাম্প্রদায়িকরণের ইতিহাসের উপর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়:

"১৯৪৯ সালে এই প্রস্তাব সর্বপ্রথম উত্থিত হইলে ইহা অধিকাংশ সদস্যদের সমর্থন লাভ করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের নামকরণে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে কাউন্সিলার বৃন্দের সম্মতি আবশ্যক। ভাষা আন্দোলনের চরম তৎপরতার মধ্যে ১৯৫০, ৫১ ও ৫২ সালে ছাত্রলীগের বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর হয় নাই। রক্তক্ষয়ী বায়ান্নোর পর ১৯৫৩ সালের কাউন্সিলার অধিবেশনে এই প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে কার্যকরী করা হয়"।[১৭]

ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন একত্রীকরণ : ১৯৫৪

ভাষা আন্দোলনের পরই সমগ্র রাজনৈতিক পরিবেশে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তনের মূল সূচীটা ছিল অসাম্প্রদায়িকতা ও প্রগতিশীলতার হাওয়া। এ পরিবর্তন আনতে অধিকতর সহায়তা করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। কারণ ছাত্র ইউনিয়নে জমায়েত হয়েছিল অধিকাংশ ভাষা সৈনিকরা। পূর্ব বাঙলার রাজনীতির এই নতুন গতিপথের প্রভাব পড়ে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগেও। এই সংগঠনের নেতা-কর্মী মহলে দীর্ঘসময় ধরে সংগঠনের নামে সাম্প্রদায়িক "মুসলিম" শব্দটি প্রগতিশীল আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রেও এক বিরাট বাধা হয়ে দেখা দেয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগে বিষয়টি

---

১৬. অলি আহাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৮০

১৭. ঘোষণাপত্র, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, তাসির উদ্দিন আহমেদ (প্রচার সম্পাদক) কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ (১৯৬৮)

এক মুখ্য আলোচনার বস্তুতে পরিণত হয়। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করছিলেন যে বর্তমানে পূর্ব বাঙলার ছাত্র সমাজের মধ্যে যে প্রগতিমুখী চেতনার ধারা বইছে তাতে এভাবে আর আগানো অসম্ভব। দেশব্যাপী অল্পসময়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের ব্যাপক জনপ্রিয়তায় তাঁদের এই পর্যালোচনা করতে সহায়তা করে।

আর এদিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের লক্ষ্য ও কর্মসূচীতে দলীয় মতাদর্শের উর্দ্ধে সকল প্রগতিকামী ছাত্রের জন্য একটিমাত্র সংগঠন রাখার অঙ্গিকারের ফলশ্রুতিতে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের যৌথ বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে সমগ্র পাকিস্তান ব্যাপী দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যেও চিন্তা-ভাবনা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে আলোচনার এক পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রখ্যাত ছাত্র নেতা ও করাচী দাও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র জনাব সারোয়ার।

পশ্চিম পাকিস্তানে তখন বিশেষ করে করাচী মুলতান ও হায়দরাবাদে সর্বজনীন শিক্ষার দাবীতে ছাত্রদের আন্দোলন চলছিল। উচ্চ শিক্ষার দ্বার শুধুমাত্র সামন্তপ্রভু ও শিল্পপতিদের সন্তানদের জন্যই সহজলভ্য ছিল, সাধারণের ঘরের সন্তানদের জন্য উচ্চ শিক্ষা কণ্টকাকীর্ণই ছিল বলা চলে। উচ্চ শিক্ষার ব্যয় হ্রাস ও সুযোগ প্রসারের দাবীতে সেখানে ছাত্র আন্দোলন এক নতুন রূপ নিতে যাচ্ছিল।

ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের এসব আলোচনা চলছিল '৫৩ সালের শেষ দিকে। এই আলোচনা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ১৯৫৫ সাল অবধি অব্যাহত ছিল। এই সময় আলোচনা চলতো ছাত্র ইউনিয়ন নেতা হাসান হাফিজুর রহমানের ফজলুল হক হলের পূর্ব বাড়ীর ১১ নম্বর কক্ষে। '৫৩ সালের যৌথ সভায় ঠিক হয় আগামী '৫৪ সালের ১৩/১৪ জানুয়ারী (মতান্তরে ১৪/১৫ জানুয়ারী) ঢাকায় দুই সংগঠনের সম্মেলন একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। একটি মাত্র সংগঠন গড়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরাই গ্রহণ করবেন।

দুই সংগঠনের প্রতিনিধিদের আলোচনার ভিত্তিতে ১৬ জানুয়ারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সমগ্র পাকিস্তান ব্যাপী ছাত্রদের একটিমাত্র সংগঠন 'নিখিল পাকিস্তান ছাত্র সংস্থা' (All Pakistan Students Organisation [APSO]) গঠন করা হবে এবং এই উদ্দেশ্যে ৯ সদস্যের (ছাত্রলীগ থেকে ৪জন, ছাত্র ইউনিয়ন

থেকে ৪জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১ জন) একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠনের কথাও উল্লেখ করা হয়। ঘোষণাপত্রের একটি খসড়াও তৈরী হয়ে যায়।

কিন্তু ছাত্রলীগ সম্মেলনে এই নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। কারণ আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, সামনের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ঠিক হবে না। ছাত্রলীগে এনিয়ে দ্বিমতের সৃষ্টি হলে মহান উদ্যোগ সমূহ ভণ্ডুল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ঐক্য আলোচনায় ছাত্রলীগের মূল উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি কাজী আবদুল বারী (তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিরও সহ-সভাপতি ছিলেন)। ময়মনসিংহে এ বিষয় কয়েকদফা আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মতাদর্শগত চাপ এতো বেশী এর বিপক্ষে ছিল যে বেশী আগানো মুস্কিল হয়ে পড়ে।[১৮] শেষ পর্যন্ত একটি আপোষ প্রস্তাবে একত্রীকরণ বিলম্বিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বলা হয় আহ্বায়ক কমিটি আগামী মে মাসে যৌথ সম্মেলন আহ্বান করবেন। এবং সেখানেই ঐক্যবদ্ধ একটি নতুন সংগঠনের জন্ম দেওয়া হবে।

কিন্তু এর মধ্যে পরিস্থিতির নতুনতর পরিবর্তন ঘটে। যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে সাফল্য এবং তৎপরে ৯২(ক) ধারা জারী ইত্যাদিতে দেশে ভিন্ন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আন্দোলন, পরিস্থিতি, নীতিমালা নিয়ে দুই সংগঠনের ব্যবধান ক্রমশঃ আবার বাড়তে থাকে। এই পর্যায়ে একত্রীকরণ ধামাচাপাই পড়ে যায়।

করাচীতে ছাত্রদের বাঙলা বিরোধী বিক্ষোভ

১৯ এপ্রিল (১৯৫৪) পাকিস্তান মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় সংসদীয় দলের সভা করাচীতে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় উর্দুর সঙ্গে বাঙলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ খবর করাচীর বিভিন্ন পত্রিকা বিশেষ করে উর্দু 'জং' ও 'আঞ্জাম' কালো বর্ডার দিয়ে পরিবেশন করে।

'আঞ্জুমান তরক্কিয়ে উর্দুর সভাপতি 'বাবায়ে উর্দু' ডঃ আবদুল হক নতুন করে উর্দু আন্দোলন শুরু করেন। ২২ এপ্রিল করাচীতে প্রবল বাঙলা বিরোধী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল বের করে। সর্বস্তরের মানুষ শহর

---

১৮. সাক্ষাৎকার, নির্মল সেন (কৃষক শ্রমিক সমাজবাদী দল), আজিজুল ইসলাম খান (ন্যাপঐক্য)

প্রদক্ষিণ করে হরতালের ডাক দেয়। দু'টি বাসে অগ্নিসংযোগের পর স্কুলের ছাত্ররা মিষ্টির দোকান লুট করে। আল ওয়াহিদ নামে একটি জাতীয়তাবাদী সিন্ধি দৈনিকও তাঁরা পুড়ে দেয়। গণপরিষদেও তাঁরা হামলা চালায় এবং দরজা-জানালার কাঁচ ভেঙ্গে ফেলে।[১৯]

আন্দোলনটি শুধু মাত্র বাঙলা বিরোধীই ছিল না, ছিল সিন্ধি বিরোধীও (সিন্ধিরাও এই সময় তাঁদের আঞ্চলিক ভাষার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছিলেন)।

যুক্তফ্রন্ট গঠনে ছাত্রসমাজ

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের মিলিত যৌথ (গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্ট) পরিষদ জয়লাভ করার পর থেকেই গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল মহলে দেশের বৃহত্তর রাজনীতি থেকে স্বৈরাচার ও প্রতিক্রিয়াকে পরাজিত করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষায়ঃ

"জনতা একদিনের জন্যও মুসলিম লীগ সরকারকে বরদাস্ত করতে রাজী ছিল না। তাই তারা সমস্ত লীগ বিরোধী দলগুলির সমন্বয়ে মুসলিম লীগকে পূর্ব বাঙলার মাটি হতে উৎখাত করার জন্য একটি 'যুক্তফ্রণ্ট' গঠন করবার আওয়াজ তুলেছিল।"[২০]

আর এই আওয়াজটি প্রথমে তুলেছিল পূর্ব বাঙলার ছাত্রসমাজ। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নির্বাচনে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্ট এ ব্যাপারে পথ দেখায়। দেশের বিবদমান রাজনীতিতে অনৈক্য এবং বিভেদে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগকে মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না।

এই অসম্ভব কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন প্রথমে কতকগুলি সাংগঠনিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ছাত্রলীগ নেতৃত্ব তখনো সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি, কারণ মূল দল আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে তখনো এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তৎকালীন আওয়ামী লীগের একজন নেতৃস্থানীয় নেতা অলি আহাদের ভাষ্যে তার স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে।

---

১৯. সাপ্তাহিক ইত্তেফাক, ১১ এপ্রিল, ২২ এপ্রিল, ১৯৫৪

২০. শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন, ২১, ২২, ২৩ অক্টোবর, ১৯৫৫

"আমি যুক্তফ্রণ্ট গঠন করার বিরুদ্ধে আবার দৃঢ়মত প্রকাশ করি। ...আলোচনা কালে মজলুম জননেতা আমার সহিত একমত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শেষরক্ষা করিতে পারেন নাই।"[২১]

ছাত্রলীগকে সক্রিয়ভাবে তৎপর হতে '৫৩ সালের ১৪ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এই কাউন্সিলেই আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রণ্টে যোগদানের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর পূর্বপর্যন্ত যুক্তফ্রণ্ট বিরোধী লবিকেই শক্তিশালী মনে হচ্ছিল।

তবে দলগতভাবে যুক্তফ্রণ্টের সবচেয়ে বেশী বিরোধী ছিলেন কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং তার নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক। ছাত্র ইউনিয়ন এ ব্যাপারে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে এবং শেরে বাঙলার বাসভবন ঘেরাও করে রাখে। শেষ পর্যন্ত ফজলুল হক যুক্তফ্রণ্টের ব্যাপারে তাঁর মতামত পরিবর্তন করলে ছাত্ররা তাঁকে কাঁধে নিয়ে উল্লাস করতে করতে ফিরে আসে। ছাত্ররা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকেও রাজী করাতে দলীয় কার্যালয় ও বাসভবনে ধর্ণা দেয় এবং সম্মতি আদায় করে আনে। এই সময় ছাত্রলীগও সাংগঠনিকভাবে এ ধর্ণা দেওয়া আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন, কেন্দ্র থেকে গ্রাম পর্যন্ত 'যুক্তফ্রণ্ট কর্মী শিবির' গড়ে তোলে। বলতে গেলে নির্বাচনের পুরো সাংগঠনিক কাজটা ছাত্ররা একাই করে।[২২]

যুক্তফ্রণ্ট গঠনে আরো জটিলতা

ছাত্র ইউনিয়ন ঘেরাওকারীদের কাছে যুক্তফ্রণ্ট গঠনে ফজলুল হকের সম্মতি এবং আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে যুক্তফ্রণ্টের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে জোট গঠনের বিষয় অনেকখানি এগিয়ে গেলেও ফজলুল হক নতুন জটিলতার অবতারণা করেন। তিনি নতুন করে প্রস্তাব দেন, যুক্তফ্রণ্টে নেজামে ইসলাম দলকে নিতে হবে। এ দলকে ছাড়া তিনি যুক্তফ্রণ্টে যাবেন না।

বস্তুতঃ যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হতে যাচ্ছিল তাতে নেজামে ইসলামকে নেওয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক প্রশ্ন জড়িত ছিল। কিন্তু শেরেবাংলা

---

২১. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫ থেকে '৭৫, ঢাকা, পৃষ্ঠা, ২০১

২২. সাক্ষাৎকার, আবদুল মতিন, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (১৯৫৪-৫৬)

ফজলুল হককে ছাড়াও যুক্তফ্রণ্ট গঠনের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। ফলে যুক্তফ্রণ্ট গঠনের সঙ্গে জড়িত দলগুলো নেজামে ইসলামকে নিতে শেষ পর্যন্ত রাজী হন।

কিন্তু নেজামে ইসলাম যুক্তফ্রণ্ট গঠনে সদস্য হয়েই প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। নেজাম নেতা মাওলানা আশরাফউদ্দিন চৌধুরী কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপারে আপত্তি তুললে শেরে বাঙলা ফজলুল হক তাঁকে সমর্থন করেন। ফলে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী লড়াই সম্পর্কে জটিলতর উপখ্যানের অবতারণা হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের মাওলানা ভাসানী, খেলাফতে রব্বানী পার্টির আবুল হাশিম, গণতন্ত্রী দলের মাহমুদ আলী প্রমুখ কমিউনিস্ট পার্টিকে জোটে নেওয়ার পক্ষে জোর প্রচেষ্টা চালান। তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, এছাড়া যুক্তফ্রণ্ট গঠন করে লাভ নেই। এ পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির সম্মুখে নতুন কর্তব্য এসে হাজির হয়। কারণ যুক্তফ্রণ্ট গঠনের নেপথ্যে মূল কাজটিই সম্পাদন করে যাচ্ছিল কমিউনিস্ট পার্টি (প্রকাশ্য রাজনীতিতে কার্যত নিষিদ্ধ এই পার্টি যুক্তফ্রণ্ট গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করে তার মতাদর্শ প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন, গণতন্ত্রী দল ও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে কর্মরত শভানুধ্যায়ীদের দ্বারা)।

এই অবস্থায় আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন এবং সিদ্ধান্ত নেন, যে কোনো কিছুর বিনিময়ে যুক্তফ্রণ্ট গঠনকে সফল করে তুলে মুসলিম লীগের পরাজয় অবশ্যাম্ভাবী করে তুলতেই হবে। ফলে সিদ্ধান্ত হয়, কমিউনিস্ট পার্টিকে বাইরে রেখে তবু যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হোক। পার্টি নিজ প্রচেষ্টায় প্রার্থী দেবে এবং যুক্তফ্রণ্টকেও সমর্থন করবে। কমিউনিস্ট পার্টির এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে সকল গণতন্ত্রকামী হাফ ছেড়ে বাঁচে এবং শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হয়। এ না হলে যুক্তফ্রণ্ট গঠনের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে যেত। কমিউনিস্ট পার্টি স্বনামে ৫টি হিন্দু আসনে এবং ৩টি মুসলিম আসনে প্রার্থী দেয়। অন্যান্য কয়েকটি দলেও কমিউনিস্ট প্রার্থী ছিলেন। যুক্তফ্রণ্টে সিদ্ধান্ত হয় যশোরের একটি আসনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী আবদুল হকের বিরুদ্ধে জোট কোনো প্রার্থী দেবে না। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তা সমর্থন করলেও শেষ পর্যন্ত ফজলুল হক সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দেন।[২৩]

২৩. সাক্ষাৎকার, মণিসিংহ, সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

২১ দফা রচনার পটভূমি

যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হওয়ার পর এক নির্বাচনী ইশতেহার রচনার ভার পরে আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা আবুল মনসুর আহমদের ওপর। তিনি এর পূর্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের ৪২ দফা জাতীয় একটি নির্বাচনী ইশতেহার রচনা করেছিলেন। যুক্তফ্রণ্টের প্রধান শরিকদল কৃষক প্রজা পার্টি মৌলিকভাবে এই ৪২ দফার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার কারণ ছিল না। তথাপি তাঁরা শুধুমাত্র দফার সংখ্যার ব্যাপারেই আপত্তি করেছিলেন। কথা হয়েছিল, ৪২ থেকে ২৮ এর মধ্যে দফা কমিয়ে আনলেই হবে। কিন্তু এরপরও আবুল মনসুর আহমদের ভাষায় :

"মুসাবিদা করিতে করিতে হঠাৎ একটা ফন্দি আমার মাথায় ঢুকিল। এটাকে ইন্‌স্‌পিরেশন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য শহীদমিনার নির্মাণ, ২১ ফেব্রুয়ারীকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন বর্ধমান হাউসকে বাংলাভাষার সেবা কেন্দ্র করার তিনটি দফা আওয়ামী লীগের ৪২ দফায়ও ছিল। এই তিনটি দফাকে যুক্তফ্রণ্টের ইশতেহারের অন্তর্ভুক্ত করিতে কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতারা রাজী হইয়াছেন। ....২১ ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাংলার ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন। কাজেই ২১ ফিগারটাকে চিরস্মরণীয় করিবার অতিরিক্ত উপায় হিসাবে যুক্তফ্রণ্টের কর্মসূচীকে ২১ দফার কর্মসূচী করিলে কেমন হয়? ৪২ দফা কাটিয়া ২৮ দফা করা গেলে, ২৮ দফাকে কাটিয়া ২১ দফা করা যাইবে না কেন?"[২৪]

পূর্ব বাঙলার স্বায়ত্বশাসনের দাবীসহ যুক্তফ্রণ্টের ২১ দফা কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষার দাবীও যুক্ত ছিল। ২১ দফার মোট ৩টি দফায় (যথা ৯, ১০ এবং ১১ দফায়) ছাত্রদের জনপ্রিয় শিক্ষার দাবী প্রতিশ্রুত হয়েছিল।

যুক্তফ্রণ্টের নির্বাচনী কর্মসূচী : ২১ দফা

নীতি : কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাপ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

---

২৪. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, তৃতীয় বর্ধিত মুদ্রণ, ১৯৭৫, ঢাকা, পৃষ্ঠা, ৩২২—৩২৫

১. বাঙলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায় করিবার স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে। উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে

৩. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে

৪. কৃষি-উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারী সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্ত শিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণ-শিল্পে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র-উপকূলে কুটির শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ-তৈরির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেঙ্কারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে

৭. খাল-খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্পে ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম-সঙ্ঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায় সঙ্গত বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে

১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকর করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয় সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপ-যুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে

১১. 'ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন্দ' প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়াত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্পব্যয় সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে

১২. শাসনব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চবেতন ভোগীদের বেতন কমাইয়া ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসঙ্গত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্ত-ফ্রণ্টের কোন মন্ত্রী এক হাজার টাকার বেশী বেতন গ্রহণ করিবেন না

১৩. দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি ও ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারীর ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে

১৪. 'জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স' প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করতঃ বিনা বিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে

১৬. যুক্তফ্রণ্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস ও পরে বাঙলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে

১৭. বাঙলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে যাঁহারা মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে

১৮. ২১ ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বশাসিত ও সার্বভৌম করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রনির্মাণের কারখানা নির্মাণ করত : পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে স্বতন্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে

২০. যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন-পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন

২১. যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূণ্য হইবে তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর-পর তিনটি নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।[২৫]

দলওয়ারী নির্বাচনী ফলাফল

১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংসদের আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। সম্প্রদায় ভিত্তিক কুখ্যাত 'পৃথক্ নির্বাচন' পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তখন। মুসলিম আসন ছিল ২৩৭টি, আর অমুসলিম আসন ৭২টি। যুক্তফ্রণ্ট মোট ভোট পায় ৯৭ শতাংশেরও বেশী।

---

২৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র : প্রথম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৩৮৯ (১৯৮২), পৃষ্ঠা, ৩৭৩-৩৭৪

দলভিত্তিক আসন সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

১.	আওয়ামী মুসলিম লীগ	:	১৪৩
২.	কৃষক শ্রমিক পার্টি	:	৪৮
৩.	নেজামে ইসলাম	:	২২
৪.	গণতন্ত্রী দল	:	১৩
৫.	খেলাফতে রাব্বানী পার্টি	:	০২
	যুক্তফ্রণ্ট	:	২২৮
৬.	মুসলিম লীগ	:	০৯
৭.	জাতীয় কংগ্রেস	:	২৫
৮.	তফসিলি ফেডারেশন	:	২৭
৯.	সংখ্যালঘু যুক্তফ্রণ্ট	:	১৩
১০.	কমিউনিস্ট পার্টি (স্বনামে)	:	০৪

এ নির্বাচনে এই অভূতপূর্ব বিজয়ের চেয়ে আকর্ষণীয় ঘটনা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের পরাজয়। তিনি ময়মনসিংহে ছাত্র নেতা খালেক নেওয়াজ খানের কাছে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন।

অশনি সংকেত

যুক্তফ্রণ্টের ঐতিহাসিক বিজয় ও মুসলিম লীগের কবর রচনার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাঙলার মানুষ এই প্রথম মুক্তির স্বাদ পেতে যাচ্ছিল। কিন্তু শুরুতেই এক অনাকাঙ্ক্ষিত খেলা শুরু হয়ে যায় জনগণকে নিয়ে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতারা তো বটেই, এমনকি পূর্ব বাঙলার জনগণের প্রিয় নেতারাও নিজ স্বার্থপরতায় জনগণকে জিম্মি করে একের পর এক খেলার খুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হতে দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁদের এই কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত রাজনীতির ফলে এদেশে সে সময়ই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অন্তঃসারশূণ্যতা প্রমাণিত হয় এবং সামরিক শাসনের পথকে প্রশস্ত করে তুলে।

ইতিহাসের এই কাহিনী সংক্ষিপ্তাকারে হলেও ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস পাঠকের দরকার হবে এই জন্য যে, এই অন্ধকারের বুকে পা দিয়েই ছাত্রদের আবার নতুন করে রাজনীতির গোড়াপত্তন করতে হয়েছিল। রাজনীতিকরা

যে নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছিলেন তা জাগানোর দায়িত্ব পড়ে শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাঙলার আজীবন সংগ্রামী ছাত্রসমাজের উপরই।

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা ও বিষবৃক্ষ রোপণ

৩ এপ্রিল (১৯৫৪) শেরে বাঙলা ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। কিন্তু আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে কোনো মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করে না। কারণ শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবুর রহমানকেও মন্ত্রী হিসাবে তালিকা-ভুক্ত করায় ফজলুল হক অসন্তুষ্ট হন এবং বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই জট খুলেছিল এবং আওয়ামী লীগের সদস্যরা শপথ নিয়েছিলেন। এই জন্য ১৫ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু এই মন্ত্রীসভা টিকেছিল মাত্র পরবর্তী আর পনের দিন।

মন্ত্রীসভা গঠনে অনর্থক এই জট সৃষ্টি যুক্তফ্রণ্টে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তা-ই চেয়ে-ছিল এবং তাঁরা তার সুযোগ গ্রহণ করার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

শেরে বাঙলার কলকাতা বিবৃতি

এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হয়েই শেরে বাঙলা ফজলুল হক একবার পশ্চিম বাঙলা সফর করেন। ৩০ এপ্রিল তাঁর সম্মানে এক সংবর্ধনায় তিনি আবেগ-আপ্লুত ভাবে বলে বসেন, 'রাজনৈতিক কারণে বাঙলাকে বিভক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু বাঙলার শিক্ষা, সংস্কৃতি আর বাঙলীত্বকে কোনো শক্তিই কোনো দিন ভাগ করিতে পারিবে না। দুই বাঙলার বাঙালী চিরকাল বাঙালীই থাকিবে'।

পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় এ সংবাদ প্রকাশিত হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। এবং এনিয়ে অত্যন্ত কুৎসিত রাজনীতি শুরু হয়ে যায়। এমন একটা দুর্যোগ-পূর্ণ অবস্থায় যেখানে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি এমনিতেই ত্রুটি খুঁজে বেড়াচ্ছে সেখানে ফজলুল হক কেন এমন মন্তব্য করেছিলেন সে রহস্য আজো উদঘাটিত হয়নি।[২৬]

তবে শেরে বাঙলা এর মধ্যে আরো একটি কাণ্ড করে বসেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার সাংবাদিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নাকি

২৬. সাক্ষাৎকার, মণিসিংহ

বলেছেন (অথবা মার্কিন সাংবাদিক কালাহানের এটা ষড়যন্ত্রও হতে পারে এবং তা-ই হওয়ার বেশী সম্ভাবনা এই জন্য যে, পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব দ্রুত ঝুঁকে যাচ্ছিল), "প্রয়োজনবোধে পূর্ববঙ্গ স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে।"

শেরেবাঙলার এই উক্তিতে সারা পাকিস্তানে হৈ চৈ পড়ে যায় এবং শেরে-বাঙলার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে দ্রুত ক্ষমতাচ্যুতির সকল আয়োজন শুরু করা হয়।

আদমজীর দাঙ্গা

ষড়যন্ত্রের এখানেই শেষ নয়। যেদিন (১৫ মে) যুক্তফ্রণ্টের সম্প্রসারিত মন্ত্রীসভায় আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা শপথ নেয়, সেদিনই আদমজীতে শ্রমিকদের মধ্যে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত উপায়ে এক ভয়াবহ বাঙালী-অবাঙালী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়া হয়। দাঙ্গায় প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক নিহত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার পরবর্তী সময়ে যুক্তফ্রণ্টের বিরুদ্ধে এ বিষয়টিও কাজে লাগায়।

৯২(ক) ধারা জারী

পূর্ব বাঙলায় এই অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়ার সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের গভর্নর জেনারেল ছিলেন জনাব গোলাম মোহাম্মদ আর প্রধান মন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। সকল কূট ও ষড়যন্ত্রের ফসল যখন চূড়ান্ত তখন ৩০ মে (১৯৪৫) মাত্র ১ মাস ২৭ দিন ক্ষমতায় থাকার পর কমিউনিস্ট বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যর্থতার অভিযোগে মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করে ৯২(ক) ধারা[২৭] জারীর মাধ্যমে পূর্ব বাঙলায় গভর্ণরের শাসন কায়েম করা হয়।

দেশরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা পূর্ব বাঙলার গভর্ণর নিযুক্ত হন। মাওলানা ভাসানী তখন শান্তি সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস সহযোগে ইউরোপ (প্রাগ) গিয়েছিলেন। ইস্কান্দার মীর্জা সদর্পে ঘোষণা করেন, "ভাসানী দেশে ফিরলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হবে।"[২৮]

---

২৭. ৯২(ক) ধারা, ১৯৩৫ সালের বৃটিশ প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রের অংশ বিশেষ। এ ধারা বলে কেন্দ্রীয় সরকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা বাতিল করে গভর্ণরের শাসন বলবৎ করতে পারেন

২৮. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি, পৃষ্ঠা—২১৭

৯২(ক) ধারা জারীর সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে নির্বিচারে গ্রেফতার ও নির্যাতন শুরু হল। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগের কেন্দ্র থেকে জেলা ও থানা পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা গ্রেফতার হয়ে যেতে থাকে। সংসদ সদস্যদেরও ঢালাওভাবে গ্রেফতার করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টিকে পুনরায় বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। গ্রেফতার এড়াতে পারলেন শুধু একজন, ছাত্র ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক গোলাম আরিফ টিপু। তিনি ছিলেন ফুটবল মাঠের নেতৃস্থানীয় খেলোয়াড়। ফলে মাঠে মাঠে খেলার সুযোগে সংগঠনের যোগাযোগকে তিনি অব্যাহত রাখলেন।

পাকিস্তানী রাজনীতিতে আমেরিকার অনুপ্রবেশ

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান-ভারত স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই উপমহাদেশের প্রতি গভীর মনযোগ দিতে শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রথমে তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে আমেরিকা সফরে আমন্ত্রণ জানান। পাকিস্তানে তখন লিয়াকত আলী খান ক্ষমতায়। তিনি রুষ্ট হন। পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কমরেড সাজ্জাদ জহীরকে ধরে লিয়াকত আলী খান সোভিয়েত রাশিয়া সফরের একটি দাওয়াত আদায় করেন (অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন যান নি, বরং আমেরিকার দাওয়াতেরই পুনরায় অপেক্ষা করতে থাকেন। আর সাজ্জাদ জহিরও শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে এক সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার সন্দেহে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন)।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে পাকিস্তানের রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে এইজন্য যে ব্যক্তিত্বশালী ও গণতন্ত্রমনা নেহেরুকে দিয়ে বশংবদ দাসানু-দাসের মতো কাজ করানো সম্ভব নয়। সেই জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের যোগসাজসে এদেশের রাজনীতিতে বিশেষ করে পূর্ব বাঙলার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নির্লজ্জের মতো হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে।

পূর্ব বাঙলায় ৫৪ সালের নির্বাচন যখন সমাগত তখন "পাকিস্তানের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিলড্রেথ কূটনৈতিক শালীনতা বিসর্জন দিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের শতকরা ৮০টি আসন জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু যখন যুক্তফ্রণ্ট অবিশ্বাস্য ফললাভ করে জনগণের রায় নিয়ে এগিয়ে আসলো, তখন হিলড্রেথ আবার বললেন, "পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচন

দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন রদ-বদল হইবে না বা কেন্দ্রীয় সরকার প্রভাবিত হইবে না"।[২৯]

এমনি একটা সময়ে পূর্ব বাঙলার প্রবল প্রতিবাদের মুখে ১৯ মে (১৯৫৪) করাচীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আধুনিকীকরণের নামে পাক-মার্কিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যুক্তফ্রণ্টের ব্যাপারে অবাঞ্ছিত মন্তব্য করায় মার্কিন সরকার এমনিতেই পূর্ব বাঙলার বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তার উপর প্রতিনিধিত্বহীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কর্তৃক পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাঙলার গণমন আরো বিক্ষুব্ধ হল।[৩০]

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। ২৪মে মার্কিন সাংবাদিক কালাহানের (একে পূর্ব বাঙলার নির্বাচনের সময়ে কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী আমদানী করেছিলেন) মাধ্যমে অত্যন্ত ষড়যন্ত্রমূলকভাবে পূর্ব বাঙলার স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের একটি সাক্ষাৎকার বিকৃত করে ছেপে মার্কিন সরকারই আসলে পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হয় ৯২(ক) ধারা নিয়ে। কিন্তু এই সময়ের জঘন্যতম ঘটনাটি ছিল মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিলড্রেথের কন্যার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার পুত্রের রোমান্স এবং অতঃপর বিবাহের বিষয়টি।

৯২(ক) ধারা বলবৎ থাকাকালীন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় পাকিস্তান সরকার প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া চুক্তি সংস্থা ও বাগদাদ চুক্তি সংস্থার সদস্য পদ গ্রহণ করে।

১৯৬২ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলীয় নেতা সরদার বাহাদুর খান এক চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করে দেন যে, মার্কিন সরকারই সাবেক প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে দেশে সামরিক আইন জারী করতে বাধ্য করেছিল।

ইত্তেফাকের ইতিহাস

এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলনে 'ইত্তেফাকের' অবদান অপরিসীম। আজকের ছাত্র সমাজ তা উপলব্ধি করতে পারবেন না। আজকের ছাত্র

২৯. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলাদেশ বুকস ইণ্টার ন্যাশনাল, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা—৫৯

৩০. প্রাগুক্ত

আন্দোলনে ছাত্ররা প্রায়ই মিছিল শেষে বিক্ষুব্ধ মনে ইত্তেফাক পুড়িয়ে থাকে। কারণ ছাত্ররা আজকের দিনে ইত্তেফাককে তাদের পাশে তো দেখতেই পায়না, বরং বিরোধী ভূমিকা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

ইত্তেফাকের জন্মের প্রাথমিক অবস্থায় তার সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া একবার চীনে গিয়েছিলেন। চীন থেকে ফিরে, 'নয়াচীনে কি দেখিলাম' শিরোনামে জনগণের উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক চীনের তাৎপর্য তুলে ধরতেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকাকে) সেদিন তিনি যুদ্ধবাজ, সাম্রাজ্যবাদী প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর কলমের সুর আস্তে আস্তে গতিপথ পরিবর্তন করে মার্কিনপন্থী হয়ে যায়।

মানিক মিয়া এর পূর্বে কলকাতায় দৈনিক ইত্তেহাদের সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পূর্ব বাঙলায় তখন মাওলানা ভাসানীর পৃষ্ঠপোষকতায় ও ইয়ার মোহাম্মদ খানের প্রকাশনায় 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক' প্রতিষ্ঠিত হয়। মানিক মিয়া আসার পর তিনি এর বেতন ভোগী সম্পাদক হিসাবে কাজে যোগ দেন।

১৯৫৬ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পূর্বে ফ্রন্টের একটি দৈনিকের প্রয়োজন পড়ে। মোহন মিঞার 'দৈনিক মিল্লাত' ও হামিদুল হক চৌধুরীর 'পাকিস্তান অবজারভার' মুসলিম লীগ বিরোধী কাগজ হলেও তারা শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হকের সমর্থক ছিলো বলে ফ্রন্টের কাগজ তারা হতে পারেনি। সে দিক থেকে 'ইত্তেফাক' অপেক্ষা কৃত দলীয় মুক্ত থাকার কারণে ফ্রন্টের কাগজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ উপলক্ষে ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর ইত্তেফাক দৈনিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

শুরুতেই ইত্তেফাকে দ্বন্দ্ব বাধে। কারণ বামপন্থী ইয়ার মোহাম্মদ খান ছিলেন শেখ মুজিবের সমর্থক এবং ডানপন্থী মানিক মিয়া ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর সমর্থক। ১৯৫৪ সালের ১৪ মে গভীর রাতে শেরেবাংলা ফজলুল হকের মাধ্যমে ঢাকা জেলা প্রশাসক থেকে মানিক মিয়া, ইয়ার মোহাম্মদ খানের নাম বাদ দিয়ে মালিকানা ক্য করে নতুন রেজিষ্ট্রেশন করিয়ে নেন।

তখনো তাঁরা এক দলভূক্ত ছিলেন বলে মাওলানা ভাসানী ও ইয়ার মোহাম্মদ খান দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে ভেবে আদালতে এর বিরুদ্ধে মামলা করতে যাননি। মানিক মিয়া এই দুর্বলতা সহজেই গ্রহণ করেন।[৩১]

একুশে ফেব্রুয়ারী : ১৯৫৫

১৯৫৪ সালের ৩০ মে ৯২-ক ধারা জারি হওয়ায় নতুন গভর্ণর, ছাত্র আন্দোলন যাতে আর না বাড়তে পারে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সামনের (৫৫ সালের) একুশে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠানও যাতে ছাত্র-জনতা না করতে পারে তার সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিলেন। তখন নেতৃবৃন্দ অনেকেই ছিলেন কারাগারে অথবা আত্মগোপন অবস্থায়।

তবু বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ভেতরে ভেতরে আসন্ন একুশে পালনের আয়োজন ছাত্রনেতা ও সংস্কৃতি কর্মী জহিরের (ডাকনাম রায়হান)-এর নেতৃত্বে চলতে থাকে। প্রতি বছরের মতো এবারও একুশের অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে ছিল খালি পায়ে থাকা, শহীদ স্মরণে রোজা রাখা এবং বটতলার জমায়েতে যোগদান ইত্যাদি।

একুশে ফেব্রুয়ারী ভোর হওয়ার পূর্বেই ছাত্রাবাসগুলো পুলিশ কর্তৃক ঘেরাও করে রাখা হল। ফজলুল হক হলের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধার্ঘ প্রদর্শন কালে গ্রেফতার করা হয় আটজনকে। সলিমুল্লাহ হল ও ইকবাল হলেও ছাত্রদের গ্রেফতার করা হয় এবং কালো পতাকা নামিয়ে ফেলা হয়। মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে বরকতের গুলিবিদ্ধ হওয়ার স্থানে গড়া স্মৃতিস্তম্ভ থেকেও প্রায় দশজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ নিয়ে যায়।

ভোর হওয়ার পূর্বেই এতো সব ঘটনার পরও লাল ব্যাজ পরে শত শত ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় হাজির হতে থকে। কিন্তু পুলিশ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘক্ষণ ঘিরে রাখে এবং এক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর বেপরোয়া লাঠি চার্জ করতে থাকে। ব্যাপক হারে চলতে থাকে গ্রেফতারী অভিযান। জেলখানা ভরে যেতে থাকে।

---

৩১. আগ্রহী পাঠক এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, কামরুদ্দীন আহমদ, বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, দ্বিতীয় খণ্ড (পৃষ্ঠা ১৭৫ ও ১৮৬), অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি (১৯৪৫-১৯৭৫), পৃষ্ঠা, ১১১--১১৩ এবং যায় যায় দিন, ২ এপ্রিল, ১৯৮৫ সংখ্যা।

এবারের গ্রেফতারকৃতদের তালিকার বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে তাতে স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রের স্থান দখল। শুধুমাত্র ছাত্রীই গ্রেফতার হয়েছিল ১৫০ জন। বাচ্চা বয়সের বলে অনেক স্কুল বালকের অভিভাবক এসে বণ্ড সই দিয়ে তাদের মুক্ত করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এতে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দিল পগোজ স্কুলের ছাত্র ওবায়দুর রহমান। তার চাচা তাকে বণ্ড সই দিতে বললেও সে দিতে রাজী না হওয়ায় জেলারের সামনেই চাচা তাকে এক চড় বসিয়ে দেন। কিন্তু ওবায়েদ তাতেও না দমে দৌড়ে জেলখানার ভেতরে চলে যায়। আরেকজন ছাত্র মোজাম্মেল হক ১০৪° জ্বর নিয়েও বণ্ড দিতে অস্বীকার করে। এসব ঘটনা সকল বন্দী ছাত্রকে নাড়া দেয় এবং সকলেই এরপর বণ্ড দিতে অস্বীকার করে। শত চাপের মুখে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের টলাতে না পেরে কিছুদিন পরই আটককৃতদের মুক্তি দেন।[৩২]

৯২ক ধারার বিরুদ্ধে এটাই ছিল সবচেয়ে সংগঠিত প্রতিবাদ। ৫৫ সালের একুশের অনুষ্ঠান পালনের এই জঙ্গিপনার ফল খুব শিঘ্রই আসতে লাগল। এর ফলশ্রুতিতে পূর্ব বাঙলায় এই ৯২ (ক) ধারার এই পর্যায়ে অবসান ঘটে। যুক্তফ্রণ্টকে আবার মন্ত্রীসভা গঠন করতে আহ্বান জানানো হয়।

ছাত্র ইউনিয়ন নেতা জহির রায়হান এবারের একুশের ঘটনার আলোকেই রচনা করেন তার অমর উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন'।[৩৩]

শাসনতন্ত্রে সংখ্যাসাম্য নীতি এবং
ছাত্র আন্দোলনে জটিলতা

পূর্ব বাঙলার নির্বাচিত যুক্তফ্রণ্ট সরকার বাতিল করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যখন ৯২ (ক) ধারা জারী করেন তখন শেরেবাংলা ফজলুল হক ঘোষণা করেন তিনি আর রাজনীতি করবেন না (২৩ জুলাই ১৯৫৪-এর জাতীয় দৈনিক সমূহ দ্রষ্টব্য)। মাওলানা ভাসানী পূর্বেই শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে ইউরোপ আটকা পড়েছিলেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী পেটের ফোড়া অপারেশন করার কথা বলে সুইজারল্যাণ্ড চলে গেলেন।

৩২. একুশের সংকলন, ডি. এ রশীদ ও মহিউদ্দীন আহম্মদ সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৫৬ এবং একুশের সংকলন '৮০ : স্মৃতিচারণ, (গাজীউল হক), বাংলা একাডেমী, ঢাকা

৩৩. সাক্ষাৎকার, মফিদুল হক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ১৯৭০-৭১

১১ ডিসেম্বর (১৯৫৪) শহীদ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রী হওয়ার আশ্বাস পেয়ে করাচী আগমন করেন এবং প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর অধীনে সামান্য আইনমন্ত্রীর পদে ২০ ডিসেম্বর যোগদান করেন। (এই বগুড়ার মোহাম্মদ আলীই ১৯৪৬ সালে যুক্তবাংলায় সোহরাওয়ার্দীর অধীনে অর্থমন্ত্রী ছিলেন। এবারের মন্ত্রীসভায় আইনমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন ইস্কান্দার মীর্জা এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন আইয়ুব খান)।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী আইনমন্ত্রী হয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়নক হয়ে এক ইউনিট প্রথা, সংখ্যাসাম্য নীতি এবং সংবিধান কনভেনশনের কথা ঘোষণা করেন। এক ইউনিট ছিল, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু---এই চারটি প্রদেশের পরিবর্তে একটি প্রদেশ; সংখ্যা সাম্যনীতি ছিল, জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংসদ সদস্যের কোটা না ধরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ জন (এর মধ্যে আবার পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির জন্য মুসলমান আসন ৩১, অমুসলমান আসন ৯) এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ জন আইন সভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। আর এসব আইন সম্মত করার জন্য শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সম্মেলন ডাকা এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

সারা পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ব বাঙলায় এর বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উঠে। এমনকি সোহরাওয়ার্দীর দল আওয়ামী লীগও এই ঘোষণায় স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। তবু সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের পক্ষে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন, এমনকি প্রতিবাদ করে ন্যূনতম বিবৃতি দেওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি আওয়ামী লীগ দ্বারা শর্তসাপেক্ষে গৃহীত হলে, ছাত্রলীগ সোহরাওয়ার্দীর এই সর্বনাশা পরিকল্পনার মৌন সমর্থকে পরিণত হয়।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রকাশ্যেই বলতেছিলেন যে যদি দেশবাসী এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে প্রয়োজনবোধে সামরিক আইনের মাধ্যমেই তা গ্রহণ করতে বাধ্য করবেন।[৩৪]

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীই প্রথম ব্যক্তি যাঁর বক্তব্য এভাবে পাকিস্তানে সামরিক শাসনের সম্ভাব্যতাকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। পূর্ব বাঙলার ছাত্র-বুদ্ধিজীবী মহলে এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উঠে। সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে

---

৩৪. অলি আহাদ, পৃষ্ঠা-২৩০

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। তারা জনসংখ্যার ভিত্তিতে আইন সভার প্রতিনিধিত্ব করার দাবী উত্থাপন করে। এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ছাত্র ইউনিয়ন বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

এই সূত্র ধরে ৭ জুলাই থেকে ৮ আগষ্ট (১৯৫৫) পর্যন্ত মারীতে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ যখন শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা ও প্রচার করেন তখন পূর্ব বাংলার সমস্যা নিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত গরগরম হয়ে ওঠে। ৫৫ সালের শেষার্ধে এবং ৫৬ সালের প্রথমার্ধে সোহরাওয়ার্দী যখন ক্ষমতাচ্যুত তখন ইতোপূর্বের সংবিধান সমর্থক আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগও মোহগ্রস্থতা কাটিয়ে আন্দোলনে শরিক হতে বাধ্য হয়।

সর্বস্তরের এক রাজনৈতিক সমাবেশে এ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাপক আন্দোলন গড়ার লক্ষ্যে সর্বদলীয় কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল, পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রী সংসদ এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে মাওলানা ভাসানী চেয়ারম্যান এবং অলি আহাদ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

পরিষদ ২৯ জানুয়ারী (১৯৫৬) সমগ্র দেশব্যাপী 'প্রতিরোধ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সারাদেশে প্রতিবাদ সভা সহ সফল ধর্মঘট পালিত হয়। তখন পূর্ব বাংলায় শেরে বাঙলা ফজলুল হক সমর্থিত আবু হোসেন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৩ ফেব্রুয়ারী কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে আমেনা বেগম ও অলি আহাদ (আওয়ামী লীগ), মোহাম্মদ সুলতান ও আবদুস সাত্তার (ছাত্র ইউনিয়ন) এবং আবদুল আউয়াল (ছাত্রলীগ) মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে দাবী মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁরা পূর্ব বাঙলার সংসদ অধিবেশন আহ্বানেরও দাবী জানান। ৮ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারী সমগ্র দেশব্যাপী কর্মপরিষদ সংবিধানের বিরুদ্ধে 'প্রতিরোধ সপ্তাহ' পালন করে।

একুশে: ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিপরীত। কারণ '৫৫ সালের ৩ জুন ৯২ (ক) ধারা তুলে নেওয়া হয়েছিল এবং গভর্ণরের শাসনের পরিবর্তে ৬ জুন যুক্তফ্রন্টের সরকার (আওয়ামী লীগ হীন) কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসের সরকারের নেতৃত্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফলে এই প্রথম রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে একুশে পালনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। এই প্রথমে ছাত্র--ছাত্রীরা সরকারের নির্যাতন ব্যতীত ভাষা আন্দোলন দিবস পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এবছরই প্রথম এ দিবস পালন করতে গিয়ে কেউ গ্রেফতার হয় নি। কিন্তু এ বছরের দুঃখজনক ঘটনা ছিল্ গণতান্ত্রিক শিবিরের অনৈক্য ও বিভক্তি। কৃষক শ্রমিক পার্টির আবুল কাশেম ফজলুল হক ও আওয়ামী লীগের ভাসানী--সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে বিবদমান মত বিরোধে এবারের একুশে ঐক্যবদ্ধভাবে পালন করা যায় নি।

যদিও একুশের ভোরে হাজার হাজার ছাত্র--জনতার নগ্ন পদ যাত্রা, কালব্যাজ পরিধান, প্রভাত ফেরীর গান ঐক্যবদ্ধ ভাবেই শুরু হয়েছিল। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা 'এলোচুলে সদ্য স্নাত অবস্থায় নগ্নপদে অশ্রু সজল নয়নে' শহীদদের মাজারে উপস্থিত হয়। বহু মহিলাকে দেখা যায় কালো কাপড় পরিহিত অবস্থায় শহীদদের মাজার জেয়ারত করছেন। বরকতের মা ও বোন কবরস্থানে আগমন করলে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়।

বিকালে কৃষক শ্রমিক পার্টির উদ্যোগে পলটন ময়দানের (বর্তমান আউটার স্টেডিয়ামে) জনসভায় সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার। সভায় বক্তাগণ মাওলানা ভাসানী ও আওয়ামী লীগের কটুক্তি করলে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়।

আরমানিটোলা ময়দানে জনাকীর্ণ জনসভা অনুষ্ঠিত হয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের উদ্যোগে। মাওলানা ভাসানী এতে সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা করেন সমাজতন্ত্রী নেতা পুলিন দে (সংসদ সদস্য), যুব নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা (কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি ও সংসদ সদস্য), অধ্যাপক আব্দুল হাই (আওয়ামী লীগ), মহীউদ্দিন আহমদ (সংসদ সদস্য), আবদুল আওয়াল (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ), আবদুস সাত্তার (সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন), কামরুজ্জামান (সংসদ সদস্য), আলী আশরাফ (গণতন্ত্রী দল), রুহুল আমীন (বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল), আবদুল গফুর (খেলাফতে রব্বানী পার্টি), শামসুন্নাহার (মহিলা সমিতি), আবদুল মোমিন তালুকদার (বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ), হাসান ইকবাল (তমুদ্দীন মজলিশ) এবং সেলিম (রিক্সা ইউনিয়ন)।

সভায় এক প্রস্তাবে মেডিকেল কলেজ ক্রসিঙের নাম শহীদ এভিনিউ (সরণী) ও শহীদদের নামানুসারে চারদিকের রাস্তার নামকরণের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানানো হয়।

এবারের একুশের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় বিষয় ছিল, পূর্ব বাঙলা সরকারের উদ্যোগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের ১২নং শেডের কাছে বরকতের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের স্থানে শহীদ মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন। মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার, মাওলানা ভাসানী এবং শহীদ বরকতের মা একযোগে এই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।[৩৫]

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শূণ্যতত্ত্ব

মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক ও সাম্রাজ্যবাদ তোষণনীতির বিরোধিতা করে পূর্ব বাঙলায় মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগের বিরোধী শক্তি হিসাবেই জিন্নাহ আওয়ামী লীগের জন্ম দিয়েছিলেন। পরে জিন্নাহ আওয়ামী লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগে যুক্ত হয়ে যায়।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর যে বিরাট প্রভাব ছিল তা আওয়ামী মুসলিম লীগের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বৃটিশ ও মার্কিন ঘেষা নীতিতে আওয়ামী লীগকেও জড়িয়ে ফেলা হয়। ফলে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠন ছাত্র-লীগকে পূর্বের তুলনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাম্রজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা থেকে যে শুধু সরে আসতে হয় তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিবর্গের পক্ষ হিসাবেও কাজ করতে হয়। যে কাজ করার কথা ছিল মুসলিম লীগের, শহীদ সোহরাওয়ার্দী অনেক ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ দ্বারা তা করিয়ে নিয়েছিলেন।

এর পেছনে তৎকালীন পাকিস্তানী রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দীর ঐতিহাসিক শূণ্যতত্ত্ব কাজ করতো। সোহরাওয়ার্দী প্রায়ই সভা-সমাবেশে এই শূণ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন। তিনি বলতেন, জোটনিরপেক্ষতার নামে তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহের মধ্যে মৈত্রী অযৌক্তিক। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এদের

৩৫. সাপ্তাহিক 'নতুন খবর', ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬

ভূমিকা শূণ্য। সুতরাং পাকিস্তানের মতো দেশ 'শূণ্য' হয়ে আরেকটির 'শূণ্যের' সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হলে তার ফল শূণ্যই হবে। (শূণ্য+শূণ্য=শূণ্য)। কিন্তু যদি বৃটেন অথবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী হয় তাহলে তাদের শক্তির বহর যদি ৫ হয় তাহলে শূণ্যের সঙ্গে যোগ করলে তাও অর্থাৎ পাকিস্তান পাঁচ হবে (০+৫=৫)।[৩৬]

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এই তত্ত্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে অত্যন্ত আশাঙকাজনক হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে গণতন্ত্রীমনা হয়েও এদেশীয় মার্কিনী অনুচরদের সঙ্গেও শেষ পর্যন্ত হাত মিলাতে কুন্ঠাবোধ করেন নি। এই নীতির প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত '৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হয়েছিল।

ছাত্রলীগ-ছাত্রইউনিয়ন মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব (১৯৫৫-১৯৫৭)

ছাত্র ইউনিয়ন জন্মের পর অনেক প্রগতিশীল ছাত্রকর্মীই ভেবেছিলেন আরেকটি সংগঠন হিসাবে ছাত্র ইউনিয়নের জন্মের প্রয়োজন নেই। বরং যেসব চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম হল ছাত্রলীগকেই তা গ্রহণ করে নতুনতর অগ্রযাত্রায় ধাবিত হতে হবে।[৩৭]

এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের একত্রীকরণ প্রচেষ্টা চলেছিল '৫২ থেকে ৫৪-র প্রথমার্ধ পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত এই ঐক্য প্রচেষ্টা স্থগিত থাকে যুক্ত-ফ্রণ্টের নির্বাচনের জন্য।

যুক্তফ্রণ্টের নির্বাচনের পর পূর্ব বাঙলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এতো বেশী ঘোলাটে হয়ে যেতে থাকে যে তাতে এই দুই সংগঠনের মতাদর্শগত বিরোধ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের নীতির দূরত্ব দিন দিন বাড়তেই থাকে।

ছাত্রলীগ অবশ্য নিজস্ব নীতি আদর্শের চেয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রভাব বলয়ে পড়ে সাময়িক বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তৎকালীন পাকিস্তানী রাজ-নীতিতে সোহরাওয়ার্দীর চাঞ্চল্যকর ভূমিকা গোটা আওয়ামী লীগেই প্রশ্ন উঠে।

---

৩৬. সাক্ষাৎকার, সিরাজুল আলম খান, (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ১৯৬৩-৬৫), ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী (সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ১৯৬৭-৬৮)

৩৭. এ ব্যাপারে আগ্রহী পাঠক বর্তমান লেখকের এই গ্রন্থেরই প্রথম খণ্ডের 'ছাত্র ইউনিয়নের অভ্যুদয়' অধ্যায় পড়ে দেখতে পারেন।

শুধু তাই নয়, জাতীয়-আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রেও সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা নিয়ে আওয়ামী লীগ এক গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখিন হয়। জোট নিরপেক্ষ নীতির প্রচারক আওয়ামী লীগ মার্কিন ঘেষা নীতি গ্রহণ করলে ১৯৫৫ (২১, ২২, ২৩ অক্টোবরের)–এর দলের সম্মেলনে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়।[৩৮]

একই নীতির কারণে সুয়েজ খাল বিরোধ নিয়ে যখন বৃটেন, ফ্রান্স ও ইজরায়েল মিসরকে আক্রমন করে তখন সমগ্র পাকিস্তানের জনগণ প্রেসিডেণ্ট নাসেরের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করলেও সোহরাওয়ার্দী সরকার তাতে ব্যর্থ হয়। বরং ন্যাক্কারজনকভাবে সাম্রাজ্যবাদ পক্ষ অবলম্বন করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শূণ্যতত্ত্বে-র ভূমিকাই এর পেছনের প্রধান কারণ হিসাবে দেখা দেয়।

কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দী সরকার অধিষ্ঠিত থাকায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগকে এব্যাপারে নিশ্চুপ থাকতে হয়। আর কোন সক্রিয় ছাত্র সংগঠন (এমনকি আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্য কোনো সক্রিয় প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনও) না থাকায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নকে একাই সুয়েজ খাল যুদ্ধে সাম্রাজ্য-বাদের পায়তারার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সংগঠিত করতে হয়।

সুয়েজ অববাহিকায় বৃটিস-ফরাসী ছত্রীসেনা অবতরণের প্রতিবাদে সমগ্র পাকিস্তান বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ছাত্র ইউনিয়ন ৩ নভেম্বর (১৯৫৬) এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। সর্বস্তরের মানুষ তাতে অংশ নেয়। এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত জনতা পুরানা পল্টনস্থ বৃটিস তথ্য কেন্দ্রটি আক্রমণ করে এবং তাতে অগ্নি সংযোগ করে ভস্মীভূত করে দেয়।

সোহরাওয়ার্দীর শূণ্যতত্ত্বের অনুসারী হয়ে পড়ায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য বিভাগ (USIS) প্রচারিত হাঙ্গেরীর উপর "মিথ্যা" চলচিচত্র দেখাতে শুরু করে (হাঙ্গেরীতে তখন একটি প্রতি-বিপ্লবী ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে, এবং ওয়ারশ জোটভুক্ত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো তাতে হস্তক্ষেপ করে)। যেহেতু ছাত্র ইউনিয়ন হাঙ্গেরীর সমাজতান্ত্রিক

৩৮. ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের এই সম্মেলনেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তীব্র বিরোধী সংগঠন বলে পরিচিত পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সদস্যদের জন্য আওয়ামী লীগ করা নিষিদ্ধ করা হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। মাওলানা সভাপতি হিসাবে বিরোধিতা করেও শেষ পর্যন্ত তা ঠেকাতে পারেননি।

সরকারের পক্ষাবলম্বন করে সেহেতু ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পর্ক বিরোধ থেকে বিদ্বেষে পরিণত হয়।

ছাত্রলীগে এই নীতিগত পরিবর্তনের পেছনে আওয়ামী লীগ ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভুমিকাই ছিল প্রধান। "১৯৫৬ সনের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ইসরাইলের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের সহায়তায় মিশরের উপর ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের হামলার পর প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী, নিজের গদী রক্ষার জন্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের নিকট নির্লজ্জভাবে আত্মসমর্পন করিয়াছিলেন।....অথচ তখনও পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ দলের গৃহীত নীতি ছিল স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি,...পাকিস্তানের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব প্রয়োজন মুসলিম লীগের এই পুরনো যুক্তি দেখাইয়া সোহরাওয়ার্দী সেন্টো (তখন বাগদাদ চুক্তি), সিয়েটো প্রভৃতি সমর্থন করিতেছিলেন।

....তখন হাঙ্গেরীর ঘটনা উপলক্ষ করিয়া দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলরা এখানে যে সোভিয়েট ও কমিউনিস্ট বিরোধী কুৎসা প্রচার চালাইতেছিল আওয়ামী লীগ নেতারা তাহাতেও সুর মিলাইয়াছিল।...

....মে মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সোহরাওয়ার্দী ও তাঁহার অনুগামীগণ পূর্বেকার গৃহীত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতি পরিবর্তন করাইয়া নেয়, আওয়ামী লীগ আনুষ্ঠানিক ও সংগঠনগতভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার নীতি হইতে বিচ্যুত হয় এবং আওয়ামী লীগের কোন সভ্যের পক্ষে নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির প্রচার নিষিদ্ধ হয়।"[৩৯]

এর ফলে আওয়ামী লীগের সমর্থক ছাত্রলীগের কর্মীদের জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সম্ভব ছিল না। ধীরে ধীরে এই প্রবণতা ছাত্রলীগকে প্রগতিবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের কাছাকাছি নিয়ে যায়। এভাবে একটা পর্যায়ে এসে ছাত্রলীগের সাধারণ সদস্য এবং নেতৃবৃন্দের একটা বড় অংশের মধ্যে শক্ত কমিউনিজম বিরোধী মনোভাব কাজ করতে থাকে। ভিয়েৎনাম যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন

---

৩৯. পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে (১৯৬৮) গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট, পৃষ্ঠা, ১৪-১৫ (জনাব মতিউর রহমান, সম্পাদক, একতা-র কাছে সংরক্ষিত)

হস্তক্ষেপের নিন্দা প্রস্তাব ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে তিনদিন প্রবল বিরোধিতা ও বিতর্কের পর নেওয়া সম্ভব হয়।[৪০]

শেখ মুজিব ফিরে গেলেন

১৯৫৬-৫৭ সালের ডাকসু সর্ব সম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা সভা করার জন্য ঢুকবেন না। এই সময় ডাকসুর সঙ্গে ছাত্রলীগের এ ব্যাপারে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ছাত্রলীগ নেতা আবদুল আউয়াল জিদ ধরেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিবকে আনবেই।

এঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। নির্দিষ্ট দিনে শেখ মুজিবকে নিয়ে ছাত্রলীগের মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করার মুহূর্তে ডাকসুর সহ-সভাপতি (ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত) একরামুল হকের নেতৃত্বে একদল ছাত্র ফটকে শেখ মুজিবকে প্রবেশ করতে বাধা দান করে। শেখ মুজিব ডাকসু নেতৃবৃন্দের যুক্তি মেনে নেন এবং সভা না করে ফিরে যান।

শিক্ষা সংস্কার কমিশন

ছাত্র-শিক্ষকদের দীর্ঘদিনেব চাহিদা নিরূপণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালের ৩ জানুয়ারী প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান নেতৃত্বাধীন যুক্তদলীয় মন্ত্রীসভা তখন ক্ষমতায়। কমিশনের সুপারিশে বাস্তবভিত্তিক বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশও কমিশন উপস্থাপন করে।

---

৪০. সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী (সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ১৯৬৭-৬৮)।
এদিকে ছাত্রলীগের অপর একজন নেতা সিরাজুল আলম খান (সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, ১৯৬৩-৬৫) আমাকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সাধারণভাবে ছাত্রলীগ সমাজতন্ত্র বিরোধী ছিল না। তবে ছাত্রলীগে তীব্র ছাত্র ইউনিয়ন বিরোধী মনোভাব কাজ করতো। এটা সংগঠনের উচুঁ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরেই ছিল। তাঁর মতে, ছাত্র ইউনিয়ন কোনো দিনই সমাজতন্ত্রের পক্ষে কাজ করে নি, সুতরাং ছাত্র ইউনিয়ন বিরোধিতা মানেই সমাজতন্ত্র বিরেধিতা নয়।
এ প্রসঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শূণ্যতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, শূণ্যতত্ত্বের ধারণা সবসময়ই খারাপ নয়। তৎকালীন পাকিস্তানের বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণেই সোহরাওয়ার্দীকে শূণ্যতত্ত্ব হাজির করতে হয়েছিল।

রংপুরে ছাত্র-যুব উৎসব

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক মঞ্চের বলা চলে একমাত্র বিপ্লবী চেতনা সম্পন্ন সংগঠন। এর ফলেই আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল, আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতিশীল কিন্তু নির্দলীয় যুবক শ্রেণী, এমনকি মুসলিম লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক যুবকও এই সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিল; (১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগ সম্মেলনে অবশ্য এই দলের কর্মীদের জন্য যুবলীগ করা অথবা যুবলীগ কর্মীদের জন্য আওয়ামী লীগ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। যুবলীগের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আপোষহীন মনোভাব আওয়ামী লীগে প্রভাব ফেলেছিল এবং শঙ্কার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল)।

দেশ যখন চরম নৈরাজ্যের দিকে চলে যাচ্ছিল তখন পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ রংপুরে (১৯৫৭ সালের ৪ জানুয়ারী থেকে ৭ জানুয়ারী পর্যন্ত) এক ছাত্র-যুব উৎসবের আয়োজন করে সকল মহলে এক প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে নতুন উদ্যম আনার প্রয়াস পায়। প্রাদেশিক পরিষদের ৩ জন মন্ত্রী জনাব খয়রাত হোসেন, মশিউর রহমান এবং মাহমুদ আলী উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করে অনুষ্ঠানের ব্যাপকতা আরো বৃদ্ধি করেছিলেন।

ঘনঘন মন্ত্রীসভার পতন

১৯৫৪—১৯৫৮ পাকিস্তান এবং পূর্ব বাঙলার রাজনৈতিক জীবনে এক ভয়ঙ্কর দুঃসহ ও যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এর পেছনে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর অসামান্য অবদান ছিল এ সম্পর্কে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু তৎকালীন রাজনীতিবিদদের ছেলেমিপনা, স্বার্থপরতা এবং দায়িত্বহীনতা সেদিন জাতিকে যেভাবে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিপতিত করে দেয় তাতে এক মাত্র প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর ঘাড়ে দোষ চালালে আসল ঘটনাকে চাপা দেওয়া হয়। বরং বলা চলে, সে সময় তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ছিল প্রতিক্রিয়ারই নামান্তর।

৫৪ সালের ৩ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। কোন্দলের কারণে ১৫ মে সম্প্রসারিত মন্ত্রীসভা শপথ নেয়। ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট বাতিল করে ৯২(ক) ধারা জারী করা হয়। ২৩ জুলাই ফজলুল হকের রাজনীতি থেকে অবসর ঘোষণা এবং সোহরাওয়ার্দীর সুইজারল্যাণ্ড যাত্রা। ১৪ নভেম্বর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের ঢাকা আগমন এবং কৃষক-

শ্রমিকপার্টির স্বঘোষিত অবসর গ্রহণকারী ফজলুল হক ও আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খানের মধ্যে ঢাকা বিমান বন্দরে তাঁকে মালা দেওয়ার এক নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পুরস্কার স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকারে আওয়ামী লীগ শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে (২০ ডিসেম্বর) আইন মন্ত্রী হিসেবে এবং কৃষকশ্রমিকপার্টি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে আবু হোসেন সরকারকে (৪ জানুয়ারী ১৯৫৫) হিসাবে লাভ করে। তাঁদের প্রভু কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী ৩ জুন (১৯৫৫) পূর্ব বাঙলা থেকে ৯২(ক) ধারা প্রত্যাহার করেন। ৬ জুন আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে পূর্ব বাঙলায় নতুন সরকার গঠন করেন। ৫ আগষ্ট (১৯৫৫) গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ বিদায় নেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা নতুন গভর্ণর জেনারেল হন। ১০ আগষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারে (কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায়িত) শেরেবাঙলা ফজলুল হক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিদায় নিয়ে বিরোধী দলে বসেন। কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী বিদায় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পুনরায় রাষ্ট্রদূতের চাকুরী ধরেন। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (আগষ্ট ১৯৫৫) নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন কেন্দ্রীয় সরকারে।

ফজলুল হককেও এক পর্যায়ে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু পূর্ব বাঙলার গভর্ণর হওয়ার জন্য কয়েকদিন পরই তিনি ইস্কান্দার মীর্জাকে একটি সনদ দিলেন, "ইস্কান্দর মীর্জা একজন বাঙালী এবং তার দেহে 'রয়েল ব্লাড' বা রাজরক্ত রহিয়াছে ...প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইস্কান্দার মীর্জা নিজেকে বরাবরই মুর্শিদাবাদী মীর জাফর আলী খানের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন।"[৪১] বিনিময়ে ৫ মার্চ ফজলুল হক পূর্ব বাঙলার গভর্ণর নিযুক্ত হন।

আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমান সংগঠিত একটি অনাস্থা প্রস্তাব আবু হোসেন সরকারকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলে। ৩০ আগষ্ট (১৯৫৬) তাঁর মন্ত্রী-সভা পদত্যাগ করে। প্রবল খাদ্য সংকট চলছিল দেশে। ভুখ মিছিল হচ্ছিল প্রতিদিন। ৪ সেপ্টেম্বর মিছিলে গুলি বর্ষণে ৪ জন নিহত হলে বিচলিত গভর্ণর ফজলুল হক বিরোধী দলের নেতা আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান

৪১. তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, পৃষ্ঠা, ৭১

খানকে সরকার গঠন করার আহ্বান জানালে জনাব খান ৬ সেপ্টেম্বর গণতন্ত্রী দল, কৃষক শ্রমিক পার্টি (কফিলউদ্দিন চৌধুরী উপদল) সমবায়ে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

এদিকে কেন্দ্রে ইস্কান্দার মীর্জা (গভর্ণর জেনারেল) ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (প্রধানমন্ত্রী) দ্বন্দ্ব দেখা দিলে মীর্জা কর্তৃক রাতারাতি গঠিত রিপাবলিকান পার্টি ও আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১২ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন নেই এই অজুহাতে ইস্কান্দার মীর্জা ১১ অক্টোবর (১৯৫৭) সোহরাওয়ার্দীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন এবং মুসলিম লীগ নেতা আই, আই, চুন্দ্রীগড় নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

এদিকে পূর্ব বাঙলায়ও গভর্ণর ফজলুল হক অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন নেই, এই অভিযোগে ৩০ মার্চ (১৯৫৮) মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমানকে পদচ্যুত করান এবং আবু হোসেন সরকারকে নতুন মুখ্যমন্ত্রী করেন। প্রতিশোধ নেওয়ার তাড়নায় সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুনকে (ইতোমধ্যে আবার চুন্দ্রীগড় বিদায় নিয়েছিলেন) ধরে গভর্ণর ফজলুল হককে ক্ষমতাচ্যুত করান। ১ এপ্রিল (১৯৫৮) চীফ সেক্রেটারী অস্থায়ী গভর্ণরের দায়িত্ব নেওয়ার ১ ঘণ্টার মধ্যেই আবু হোসেন সরকারকে এক কলমের খোঁচায় উৎখাত করেন। নতুন করে আবার আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

১৮ জুন (১৯৫৮) সংসদ অধিবেশন আরম্ভ হলে ন্যাপ সদস্যরা নিরপেক্ষ ভূমিকা নিলে আতাউর রহমান আবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে ফেললে ১৯ জুন আবু হোসেন সরকার পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পান। কিন্তু ২২ জুন আওয়ামী লীগ-ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) সমঝোতা হলে অনাস্থা ভোটে আবু হোসেন সরকার আবার ক্ষমতাচ্যুত হন।

দুঃখময় স্মৃতি

আতাউর রহমান পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পান ২২ জুলাই। সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) পূর্ব বাঙলার সংসদ অধিবেশন আহূত হল। সরকার দলীয় স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব তুললেন একজন সদস্য। অন্য একজন সদস্য প্রস্তাব উঠালেন "স্পীকার আবদুল হাকিম পাগল"। দুটো প্রস্তাবই গৃহীত হয়ে গেল।

ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী দায়িত্ব নিলেন বটে, কিন্তু ততোক্ষণে পরিষদ অভ্যন্তর পাগলা গারদে পরিণত হয়েছে এবং চলছে দাঙ্গা। ২৩ সেপ্টেম্বর বিধ্বস্ত সংসদের সঙ্গে আহত হয়ে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী হাসপাতালে নীত হলেন কিন্তু পূর্ব বাঙলার এই কালিমাপূর্ণ রাজনীতিতে ইহজীবনের মতো আর ফিরে আসলেন না।

আসার প্রয়োজনও ছিল না। এবং সে সুযোগ ও সময় দিতেও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী রাজী ছিল না। ঘরের কোণে তারা ছিল প্রস্তুত। দেশবাসীও অস্থির হয়ে পড়েছিল। মুক্তি চাচ্ছিল তারা রাজনীতিবিদদের কাণ্ডজ্ঞানহীন অরাজকতা থেকে। তথাকথিত গণতন্ত্রের প্রতি থুঁক ফেলে মানুষ ফিরেও তাকাতে চাইলোনা সেদিকে।

সুযোগ সন্ধানী সামরিক অফিসাররা নেমে পড়লো রাজপথে। সেদিন ছিল ৭ অক্টোবর ১৯৫৮।

প্রথম সামরিকআইন : সাধারণ মানুষের উল্লাস

ঘন ঘন ক্ষমতার রদবদল, একের প্রতি আরেকজনের কূটচাল, বিভেদ এবং ধ্বংসাত্মক রাজনীতি সাধারণ মানুষের মনকে যেমন বিষিয়ে তুলেছিল, সমগ্র ছাত্র সমাজকে করে তুলেছিল তেমনি রাজনীতি ও আন্দোলনবিমুখ। তাই একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, প্রথম সামরিক আইন জারীর সংবাদ মানুষ শুধু মেনেই নিল না, তারা অতিরিক্ত আশাবাদীও হয়ে উঠলো।

সারাদেশের দূর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সামরিক শাসন, সাধারণেরা ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবেই গ্রহণ করলো। পাশাপাশি রাজনীতিবিদ ও ছাত্রনেতাদের নির্বিচারে গ্রেফতার ও নির্যাতনকে মানুষ আলাদা করে দেখতে চাইলো না।

জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় এই অবস্থায় রাজনৈতিক নেতাদের সামরিক আইনের বিরুদ্ধে আর কিছু করার থাকে না। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারীর কয়েকদিন পরই ঢাকায় আসলে সর্বস্তরে তিনি প্রাণঢালা সংবর্ধনা লাভ করেন। ঢাকা ষ্টেডিয়ামে এক বিশাল জনসভায় তিনি একটি বক্তৃতাও দিয়ে ফেলেন এবং তাতে তিনি রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

এর মধ্যে (আইয়ুব খানের ঢাকা অবস্থানকালীন সময়েই) সামরিক শাসকদের মধ্যে ছোট একটি ঘটনা ঘটে। প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার আলী মীর্জা আইয়ুব খানকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ২৪ অক্টোবর ঘোষণা দেন। এবং আইয়ুব খান ২৭ অক্টোবর (১৯৫৮) শপথ নিয়েই রাতের অন্ধকারে ইস্কান্দার মীর্জাকে পদচ্যুত এবং দেশত্যাগে বাধ্য করেন।

জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে বহুদিন পর একটি দুষ্টগ্রহের অপমানজনক পরিণতি ঘটে।

তবে প্রথম সামরিক আইন জারীতে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিল ময়মনসিংহের ছাত্ররা। সামরিক শাসনের বিধি জারীর সঙ্গে সঙ্গেই ময়মনসিংহের রাস্তায় রাস্তায় প্রাক্তন ছাত্রনেতা কাজী আবদুল বারীর (প্রাক্তন ন্যাপ [হারুন] নেতা) নেতৃত্বে ছাত্ররা প্রতিবাদ মিছিল বের করে। (পরে অবশ্য কাজী আবদুল বারী এই অপরাধে গ্রেফতার হন এবং সামরিক আদালতে তাঁকে শাস্তিস্বরূপ দশটি বেত্রদণ্ড প্রদান করা হয়। বেত্রদণ্ডগুলি তাঁকে এমনভাবে মারা হয় যে তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয়গুলি আক্রান্ত হয় এবং তিনি চিরজীবনের জন্য বধির হয়ে পড়েন)।[৪২]

সামরিক শাসন জারীর সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষ এক ঘোষণার বলে পূর্বপাকিস্তানের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত সংসদগুলোকে বাতিল করে দেন। বিক্ষুব্ধ ও সচেতন ছাত্রদের ঘাঁটি বলে পরিচিত অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধই করে দেওয়া হল। বিক্ষোভ সৃষ্টির 'উস্কানীদাতা' বলে পরিচিত অনেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা রাজনৈতিক মামলা দায়ের করা হয়। ছাত্র সংগঠনগুলোর অফিস কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

নতুন কৌশলে ছাত্র সংগঠন

সামরিক শাসনে প্রকাশ্যে ছাত্র সংগঠনের নামে রাজনীতি বা আন্দোলন পরিচালনা কিংবা নির্বাচনে অংশ নেওয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ফলে ছাত্র আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ নিল। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেই নয় শুধু, নির্বাচনেও তারা সংস্কৃতিমনা নাম নিয়ে আসরে নামলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নের ছিল সংস্কৃতি সংসদ, ছাত্রলীগের শিল্পসাহিত্য সংঘ, ছাত্রশক্তির

৪২. সাক্ষাৎকার, মোহাম্মদ ফরহাদ (সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি), পঙ্কজ ভট্টাচার্য (ন্যাপ ঐক্য)

সাংস্কৃতিক পরিষদ এবং ছাত্র মজলিস-তামিরে মিল্লাত নামে ইসলামী ছাত্রসংঘ কাজ করে। এমন নাম সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেই ছড়িয়ে পড়লো, যেমন, অগ্রদূত, প্রগতি, অগ্রগামী, যাত্রিক, দিশারী ইত্যাদি নামের মধ্যে ছাত্র সংগঠনগুলো আত্মগোপন করলো।[৪৩]

বাম বিরোধী নির্বাচনী জোট

ডাকসুতে ১৯৫৮-৫৯-এর আগ পর্যন্ত ছাত্র ইউনিয়নের একাধিপত্য চলতে ছিল। এ বছর ক্রমাগত বামধারা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ছাত্রলীগ, ছাত্র শক্তি ও এন.এস.এফ—এই তিন সংগঠন একটি মৈত্রীজোট গঠন করে। জোটের পক্ষে ছাত্রলীগ থেকে সহসভাপতি হিসাবে আবুল হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসাবে এ.টি.এম মেহেদী মনোনয়ন পায় এবং জয়লাভ করে। এর পরেও এই ধরণের বাম বিরোধী নির্বাচনী জোট অব্যাহত ছিল।

সামরিক শাসনে প্রথম একুশ

সামরিক শাসনের মধ্যে কিভাবে একুশ উদযাপন করা যায় তা নিয়ে ছাত্র সমাজকে ভাবনায় ফেলে দিয়েছিল। ছাত্র সংগঠনগুলি অনেকটা কিংকর্তব্য বিমূঢ়। ডাকসুতে তখন ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত বদরুল আলম-ফজলী হোসেন প্যানেল ক্ষমতায়। ৩০ জানুয়ারী (১৯৫৯) সকল ছাত্রদলের এ বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফেব্রুয়ারীর ১ তারিখে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক ফজলী হোসেন একুশে উদযাপনের আহবান জানিয়ে এক বিবৃতি দেয়। একমাত্র মর্নিং-নিউজ ব্যতীত সকল জাতীয় দৈনিকেই তার বিবৃতি ছাপা হয়।

ফেব্রুয়ারীর ২ তারিখে এই জন্য তৎকালীন উপাচার্য হামুদুর রহমান তাকে কৈফিয়ত তলব করেন যে, কেন তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেওয়া হল। তিনি ডাকসুর সাধারণ সম্পাদককে সঙ্গে করে গেলেন পূর্ব পাকিস্তানের জি. ও. সি মেজর জেনারেল ওমরাও খানের কাছে। দীর্ঘক্ষণ আলাপের পর জেনারেল ওমরাও একুশ উদযাপনের অনুমতি দেন বটে, কিন্তু শর্ত থাকে যে, কাল পতাকা উত্তোলন ও মিছিল করা যাবে না।

কিন্তু একুশের ভোরে ছাত্ররা ঠিকই ডাকসু অফিসের সামনে কালো পতাকা উত্তোলন করে। এবার এই পতাকা উত্তোলন করে আলাউদ্দিন আল আজাদ।

৪৩. সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, মতিউর রহমান, মফিদুল হক, মতিউর রহমান নিজামী (সভাপতি, ইসলামী ছাত্র সংঘ, ১৯৬৬-৬৭)

এরপর ছাত্ররা নগ্ন পদ যাত্রায় আজিমপুর গোরস্থান হয়ে মিছিল পূর্ব মতই শহীদ মিনারে নিয়ে যায় এবং সভা অনুষ্ঠিত করে।

এবারের একুশের মূল আকর্ষন ছিল ভারত থেকে গোপনে আনীত শহীদ জব্বারের মায়ের উপস্থিতি। কার্জন হলে শহীদ স্মরণের অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকেন। সামরিক শাসনের মধ্যে একুশে উদযাপনের এটাই ছিল ছাত্রদের প্রথম অভিজ্ঞতা।[৪৪]

রোমান হরফে বাঙলা

পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি দৃঢ় করার লক্ষ্যে বাংলা ও উর্দু মিলিয়ে একটি খিচুরি ভাষা তৈরীর একটি অপচেষ্টা চলতে থাকে আইয়ুবের সামরিক শাসন জারীর পর থেকেই। কারণ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব মনে করতেন যে, উর্দু অথবা বাংলা কোনটাই একক ভাবে সমগ্র পাকিস্তানের ভাষা হতে পারে না। কিন্তু সমস্যার সমাধানে তিনি একটি জাতীয় মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে, "এই ধরনের একটি মাধ্যম উদ্ভব করতে হলে আমাদেরকে বাংলা ও উর্দুর মধ্যেকার সাধারণ উপাদানগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং সেগুলোকে একটি মাত্র সাধারণ লিখন রীতির মাধ্যমে একত্রে বর্ধিত হতে দিতে হবে।"[৪৫]

প্রেসিডেন্টের এই দর্শনকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে শরীফ শিক্ষা কমিশন ও বাংলা একাডেমী, রোমান হরফ প্রবর্তন, বাঙলা বর্ণমালা সংস্কার, বাংলা-উর্দু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ইত্যাদি কতকগুলি তোঘলকি পরিকল্পনা গ্রহণ শুরু করে। এসব করতে গিয়ে চতুর পরিকল্পনাবিদরা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্যকেও সংস্কার শুরু করে দেন। কবি নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'চল্ চল্ চল্'—এর 'নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান' চরণের আংশিক সংশোধন করে তাঁরা লিখেন, 'সজীব করিব গোরস্থান'। জনপ্রিয় ছড়া,

> 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
> সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।'

---

৪৪. সাক্ষাৎকার, মোঃ ফজলী হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু, বিচিত্রা, ১৩ ডিসেম্বর'৮৫

৪৫. মুহম্মদ আইয়ুব খান, প্রভু নয় বন্ধু, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচী-ঢাকা-লাহোর, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা, ১৩২

—এটিও সংশোধিত মুসলমানী হয়ে পুনঃ লিখিত হয় এভাবে,

'ফজরে উঠিয়া আমি দিলে দিলে বলি
সারাদিন যেন আমি নেক হয়ে চলি।'

এসময় ছাত্র–ছাত্রীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেও তথাকথিত মুসলমানী আনার চেষ্টা করা হয়। যে সমস্ত ছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে শিক্ষা প্রতি–ষ্ঠানে ক্লাশ করতে গিয়ে কপালে টিপ দিয়ে যেত তাদের বহিষ্কার করা হতে থাকলো।[৪৬]

এসবের প্রক্রিয়া যেহেতু শুরু হয়েছিল ১৯৫৯ সাল থেকে এবং সে সময়তেই ছাত্র বুদ্ধিজীবী মহল থেকে এই বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। ১৯৫৯ সালে সর্বদলীয় ছাত্র সংগঠনসমূহের একুশের সম্মিলিত অনুষ্ঠানে ডঃ শহীদুল্লাহ সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাবসহ অন্যান্য সংস্কার সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখান করেন। ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, এই ধরণের প্রয়াস তারা মেনে নেবে না।[৪৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইয়ুব খান

সামরিক শাসন ও তার প্রণেতার প্রতি ছাত্রদের মোহ থাকতে থাকতেই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় UOTC-এর ক্যাডেটরা তাকে গার্ড অব অনার দেয়। এখানে তাঁকে দেখতে আসা সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি এক বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, "আপনাদের চোখে চোখে আমি দেশপ্রেম জ্বলজ্বল করতে দেখছি।"[৪৮]

বস্তুত ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেমের অগ্নিশিখা সত্যি জ্বলজ্বল করছিল এবং কিছুদিনের মধ্যেই তা প্রবল আকার ধারণ করে বিস্ফোরিত হয়। আইয়ুব খানকে শুধু সেদিন তা টের পাইয়ে দেয়নি, কাঁপিয়ে তুলেছিল সমগ্র সামরিক শাসনের ভিতকেই।

৪৬. সামসুদ্দোহা, গৌরবের সমাচার, রজত জয়ন্তী প্রকাশনা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা, ২৪

৪৭. ইত্তেফাক, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯

৪৮. কাজী আকরাম হোসেন, ছাত্র ইউনিয়ন, বায়ান্ন থেকে বাষট্টি : একটি পর্যায়ের উত্তরণ, গৌরবের সমাচার, রজত জয়ন্তী প্রকাশনা, ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৭

ডাকসু নির্বাচন : ১৯৫৯

সামরিক শাসনের মধ্যেই ৫৯ সালে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও সে সময় ছাত্র সংগঠনের নামে নির্বাচন করা যায় নি তথাপি ৪টি ছাত্র সংগঠন ৪টি দলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে—ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, সরকারী এন.এস.এফ ও ছাত্রশক্তি। নির্বাচনের ফলাফল সব মিলিয়ে আইয়ুবের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধেই যায় :

ডাকসু'তে : আমিনুল ইসলাম তুলা : ছাত্র ইউনিয়ন
আশরাফ উদ্দিন মকবুল : যুক্তপ্রার্থী

সলিমুল্লাহ হল : যুক্তপ্রার্থী
ইকবাল হল : ছাত্র ইউনিয়ন
ঢাকা হল : ছাত্র ইউনিয়ন
জগন্নাথ হল : ছাত্র ইউনিয়ন
রোকেয়া হল : ছাত্র ইউনিয়ন

এবারের নির্বাচিত পরিষদই ডাকসু ও হল সংসদসমূহের গঠনতন্ত্র তৈরি করে, যা আজো চালু রয়েছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হামলা

১৯৬০ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত 'আগ্রগামী'র (পূর্বে এসব প্রতিষ্ঠানে সরাসরি ছাত্র সংগঠনের নামে ছাত্র রাজনীতি প্রচলিত ছিল না) অনুষ্ঠানে এন.এস.এফ ও ইসলামী ছাত্রসংঘ মিলিতভাবে হামলা চালালে এক অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত হয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পী জাহেদুর রহীম তখন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি পরিবেশন করছিলেন। শ্রোতারা ছিল বিমুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট। ঠিক এই সময় দু'দিক থেকে যৌথ হামলা চালানো হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপর।[৪৯]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগ ও ৬ দফা

সামরিক শাসনের মধ্যেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক গতিধারার সফলতা প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে নতুন আশার আলো জাগ্রত করে। এর মধ্যে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর সফলতা তাঁদের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে

৪৯. পঙ্কজ ভট্টাচার্য, প্রাক্তনের স্মৃতিচারণা ও প্রত্যাশা, গৌরবের সমাচার, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা, ১৯

তোলে। বিশেষ করে এই সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থ-বৈষম্যে এবং পশ্চিম কর্তৃক পূর্বকে শোষণের স্বরূপ বুদ্ধিজীবী ও অর্থনীতিবিদদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্থানের অর্থনীতিবিদরা দুই অংশের জন্য পৃথক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ও তার গুরুত্বকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলেন। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের এই ভূমিকা পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে এবং ৬ দফা প্রণয়ন করতে উদ্বুদ্ধ করে। বিশেষ করে, এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অবদান অসামান্য। এই বিভাগের কতিপয় অধ্যাপক ডঃ মাহমুদ হোসেন, রেহমান সোবহান প্রমুখগণ সর্বপ্রথম পাকিস্তানের অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে পূর্ব পাকিস্তানের বরাতে শুভঙ্করের ফাঁকিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনগণের কাছে তুলে ধরেন।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী ও ছাত্রসমাজ

১৯৬১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মের শতবার্ষিকী পালনকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবেশ দীর্ঘদিন পর আবার আলোড়িত হয়ে ওঠে। সামরিক শাসনের পর থেকে প্রকাশ্য সাংগঠনিক-রাজনৈতিক কার্যক্রম যখন একেবারে নিষিদ্ধ হয়ে গেল তখন রাজনীতি আশ্রয় নিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আড়ালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে সংস্কৃতি সংসদ ছিল ছাত্র ইউনিয়নের, শিল্প-সাহিত্য সংঘ ছাত্রলীগের, সাংস্কৃতিক পরিষদ ছিল খেলাফতে রব্বানী পার্টির। এ ছাড়াও প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে 'ময়ূখ' (ছাত্র ইউনিয়ন), ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে 'অগ্রগামী' (ছাত্র ইউনিয়ন), চট্টগ্রামের ইউ. এস. পি. পি (ছাত্র লীগের) সংগঠন বলে পরিচিত ছিল। প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) 'ময়ূখ' সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নামে রাজ-নৈতিক তৎপরতার সূচনা করে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ এ ব্যাপারে একটি শক্তিশালী ঘাটিতে পরিণত হয়েছিল। জগন্নাথ কলেজে অবশ্য সরাসরিই রাজ-নৈতিক তৎপরতা শুরুর একটা প্রচেষ্টা চলতে থাকে।[৫০]

এমনি একটা অবস্থায় সারা দুনিয়াতেই রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি চলতে থাকলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সচেতন সংস্কৃতি কর্মী এবং ছাত্ররা "সাজ সাজ রবে" জেগে ওঠে। সামরিক সরকার এর সরাসরি বিরোধিতা করতে আসে নি বটে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের তথ্য সচিব ও

৫০. সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, মতিউর রহমান, মফিদুল হক

বি. এন. আর (Bureu of national Reconstrnction) --এর প্রধান মুসা আহমেদ (খাজা শাহাবুদ্দিনের জামাতা) এক শ্রেণীর ভারাটে বুদ্ধিজীবী সংগ্রহ করে এর বিরুদ্ধে অজস্র প্ররোচনা ও নিন্দাবাদ করতে শুরু করেন। দৈনিক আজাদ, এদের প্রধান মুখপাত্র হিসাবে কুৎসিত ভূমিকা পালন করে। 'আজাদ' তার ১২ বৈশাখ তারিখের সম্পাদকীয়তে 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তান' শীর্ষক রচনায় বলে, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান মুসলমানদের কাছে '(কোহেনদার)' ডাকের সমান এবং 'এ ডাকে সাড়া দিলে তার নিশ্চিত মৃত্যু'।

একশ্রেণীর ভারাটে বুদ্ধিজীবী ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফেনীতে এ বিষয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করে বেড়াতে লাগলেন। ঢাকা জেলা কাউন্সিল হলে রবীন্দ্র বর্জনের আলোচনায় অংশ নেন আবদুল মান্নান তালিব, দেওয়ান আব্দুল হামিদ, মাওলানা মহিউদ্দিন, অধ্যাপক গোলাম আজম প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে গৃহীত এক প্রস্তাবে তাঁরা বলেন, পাকিস্তানের ইসলাম ভিত্তিক জাতীয়তা ও রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে অখণ্ড ভারতীয় সাম্রাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি হিসাবে চালু করার জন্য এক শ্রেণীর তথাকথিত সংস্কৃতিসেবী প্রদেশ ব্যাপী যে সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে, এই সভা তাহাদের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করিতেছে।[৫১]

এমন একটা পরিস্থিতিতে সকল উৎসাহীই অনেকটা কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় ছিলেন। তবু মফস্বলের কয়েকটি সংবাদ তাঁদের উৎসাহিত করলো। দৈনিক কাগজে দেখা গেল কিছু কিছু জেলা সদরে জেলা প্রশাসককে আহবায়ক করে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের অনুষ্ঠানমালা তৈরী করা হয়েছে।

ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে তিনটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। ডাকসুতে তখন ছাত্র ইউনিয়নের জাহানারা বেগম-অমূল্য চক্রবর্তী (মতান্তরে অমূল্য রায়) ক্ষমতায়। প্রধান অনুষ্ঠানটি হলো তাদের উদ্যোগে কার্জন হলে।

তবে মূল কেন্দ্রীয় উদযাপন পরিষদটি গঠিত হয়েছিল ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এস.এম. মোর্শেদকে সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (ইংরেজী বিভাগ) ডঃ খান সরওয়ার মুর্শিদকে সম্পাদক করে। কারিগরী মিলনায়তনে এই কমিটির উদ্যোগে ৪ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান চলে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে তো

৫১. দৈনিক আজাদ, ৮ মে, ১৯৬১

প্রধান বিচারপতি ইমাম হোসেন চৌধুরী অংশ নিয়ে সকলকে শুধু অবাকই করে দিলেন না, রবীন্দ্র ভাব-সম্পদ ও মতবাদ আকীর্ণ আধুনিক দুনিয়ায় তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) মতামতের গুরুত্বকেও সবাইকে বুঝিয়ে বললেন।

ঢাকার প্রেসক্লাবে তরুণ সংস্কৃতি কর্মীদের উদ্যোগে 'রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব কমিটি' গঠিত হয়েছিল। তাদের অনুষ্ঠানও ছিল বর্ণাঢ্য।

তবে কার্জন হলে ডাকসু'র অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গ্রেফতার হয়ে গেলেন ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আনোয়ার জাহিদ ও জহির রায়হান। দীর্ঘদিন ধরে ডাকসু কার্যালয়ে এসে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা ছাত্র নেতাদের জিজ্ঞসা-বাদ ও জবানবন্দী গ্রহণ করেন। অদ্ভূত অদ্ভূত প্রশ্ন করে তাঁরা রবীন্দ্র জন্মশত-বার্ষিকী অনুষ্ঠানমালা ও আঙ্গিকের রূপক তাৎপর্যের রহস্য খুঁজতে থাকেন। অনুষ্ঠানে মঞ্চের 'ব্যাকসীন' কেন লাল ছিল অথবা 'সমবেত ছাত্রীরা লাল পাড় শাড়ী ও কৃষ্ণচূড়া মাথায় দিয়ে এসেছিল কেন" ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন করে ছাত্র নেতাদের তাঁরা হয়রানী শুরু করেন।[৫২]

তবে সারা পূর্ব পাকিস্তানে এই জন্মশতবার্ষিকী পালনের ইতিহাসে দুঃখজনক ঘটনাটি ছিল, জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির রক্ষক বাংলা একাডেমীতে এ বিষয়ে শেষ পর্যন্ত কোন অনুষ্ঠানই হতে পারে নি।

বিচারপতি আসির তদন্ত কমিশন

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের মধ্য দিয়ে ছাত্র রাজনীতি কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু সামরিক সরকার তা অঙ্কুরেই দমন করার জন্য ছাত্র রাজনীতি ও নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। বিচারপতি আসির তার প্রধান নিযুক্ত হন।

কমিশন তার প্রতিবেদনে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। এ প্রসঙ্গে কমিশন অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, ছাত্র নেতারা (রাজনৈতিক নেতাদেরও এরমধ্যে জড়ানো হয়) বিদেশ থেকে টাকা পায় এবং সেই অর্থের মাধ্যমে তারা সাধারণ ছাত্রদের উস্কিয়ে দেয়। প্রমাণ স্বরূপ কমিশন মধুর রেস্তোরায় একটি হিসাবের খাতার কথা বলেন, যেখানে ছাত্ররা বাকীতে খেয়ে হিসাব লিখে রাখতো।

৫২. কাজী আকরাম হোসেন, ছাত্র ইউনিয়ন, বায়ান্ন থেকে বাষট্টি : একটি পর্যায়ের উত্তরণ গৌরবের সমাচার, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা, ৯৮-৯৯

ছাত্র ও শিক্ষকরা এ সম্বন্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন তো এর বিরুদ্ধে একটি মামলাই ঠুকে দেয়। বিশিষ্ট আইনজীবী আতাউর রহমান খান এই মামলা পরিচালনা করেন। শেষ পর্যন্ত মামলায় ছাত্ররা জয়লাভ করে এবং আসির কমিশন প্রতিবেদন মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। বরং কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেড়িয়ে পড়ে। দেখা গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার সমর্থক ও প্রতিক্রিয়াপন্থী অনেক ছাত্রদের মধ্যে অর্থ ছড়ানো হচ্ছে এবং পরীক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন সুবিধা পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকও তার সঙ্গে জড়িয়ে গেল। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক পল নিউম্যান (অষ্ট্রিয়বাসী) এন.এস.এফ (সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন National Student Federation)-এর ছাত্রদের পরীক্ষার পূর্বেই প্রশ্নপত্র সরবরাহ করার কেলেঙ্কারীতে ধরা পড়েন।[৫৩]

এই সময়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা জিয়াউদ্দীন নির্বাচিত হলে নিউম্যান তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং পুনরায় নির্বাচন দেন। দ্বিতীয়বারও জিয়াউদ্দিন অধিক ভোট পেলে নিউম্যানের না মেনে উপায় থাকে না।

দুই অর্থনীতি : ছাত্র বনাম মন্ত্রী

১৯৬১ সালের মাঝামাঝি আইয়ুব মন্ত্রীসভার সদস্য লেঃ জেনারেল কে.এম. শেখ ও জুলফিকার আলী ভুট্টো একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা এক ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতাও করেন। সমাবেশে ছাত্ররাও বক্তব্য রাখে। ছাত্রদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য। তখন পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের দ্বারা বিশ্লেষিত Two economy Theory-র আলোচনা প্রায় মুখে মুখে। ছাত্ররা নানা রকম প্রশ্নবাণে মন্ত্রীদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলে। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা জিয়াউদ্দিন মাহমুদ দুই অর্থনীতির সম্ভাব্যতা ও তার উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করে সরাসরি মন্ত্রীদের মতামত দাবী করলে তাঁরা হতভম্ব হয়ে যান এবং সদুত্তর দিতে অপারগ ও ব্যর্থ হলে ছাত্রদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন।

৫৩. প্রাগুক্ত এবং সাক্ষাৎকার, রাশেদ খান মেনন, পঙ্কজ ভট্টাচার্য

আন্দোলনের প্রস্তুতি : আওয়ামী লীগ-কমিউনিস্ট পার্টি বৈঠক

৬১ সালের শেষার্ধ থেকে বেআইনী ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক হয়। সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী এ ব্যাপারে দুই দলের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন। আওয়ামী লীগ থেকে শেখ মুজিব ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং কমিউনিস্ট পার্টি থেকে মণিসিংহ ও খোকা রায় এসব গোপন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আন্দোলনের প্রশ্নে কয়েক দফা কার্যক্রমের একটি খসড়া তাঁরা অনুমোদন করেন। ঠিক হয় যে, আইয়ুবের শাসনতন্ত্র জারী হওয়ার সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদের দিয়ে প্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত হবে এবং পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীরা সম্মিলিতভাবে তা সারাদেশে ছড়িয়ে দেবে।[৫৪]

আন্দোলনের রূপরেখা ও কর্মসূচীটি প্রণয়ন করেছিল কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। এতে, ১. পাকিস্তানের কেন্দ্রে ও প্রদেশে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠন, ২. পূর্ববঙ্গের জন্য স্বায়ত্বশাসন, ৩. পশ্চিম পাকিস্তানে এক উইনিট প্রথা বাতিল করে সেখানকার জাতিসমূহের জন্য স্বায়ত্বশাসন ৪. রাজবন্দীদের মুক্তি, ৫. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ৬. শ্রমিকের মজুরীবৃদ্ধি, ৭. কৃষকের খাজনা-ট্যাক্স হ্রাস, ৮. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অবলম্বন শীর্ষক নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের কথাও বলা হয়েছিল।[৫৫]

শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবী

বৈঠকে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব কর্মসূচীতে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবীকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বৈঠকে বলেন, "ওদের সাথে আমাদের আর থাকা চলবে না। তাই এখন থেকেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে; আন্দোলনের প্রোগ্রামে ঐ দাবী রাখতে হবে।"[৫৬]

---

৫৪. সাক্ষাৎকার, মোহাম্মদ ফরহাদ, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, হায়দার আকবর খান রণো, মতিউর রহমান এবং কাজী জাফর, পূর্বোক্ত

৫৫. পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে (১৯৬৮) গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট, পৃষ্ঠা, ৫১-৫২

৫৬. খোকা রায়, সংগ্রামের তিন দশক (১৯৩৮-১৯৬৮), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৬, পৃষ্ঠা, ১৮২

কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য নীতিগতভাবে এ ব্যাপারে একমত ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, "এই দাবীর মধ্যে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটি নিহিত রহিয়াছে' এবং ভবিষ্যতে 'পূর্ব পাকিস্তানে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠা আমরা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলিয়া মনে করি না।" কিন্তু 'বর্তমানে যেভাবে... 'স্বাধীন পূর্ব বাংলার' দাবী উঠিতেছে তাহা রাজনৈতিক দিক হইতে যুক্তি সঙ্গত ও সমর্থন যোগ্য নয়। তাহা ছাড়া, বর্তমানে এইরূপ দাবী উত্থাপন করা আমরা অপরিপক্ক এবং অসময়োচিত মনে করি।...

বাঙ্গালী ধনিক ও বুদ্ধিজীবিরা পশ্চীম পাকিস্তান বিরোধী উগ্র স্বদেশীপনা এবং একমাত্র নিজেদের সঙ্কীর্ণ শ্রেণী স্বার্থের দিক হইতে এই দাবীটি তুলিতেছেন। তাহারা ইহা অর্জনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের তথা সমগ্র পাকিস্তানের জনতার প্রধান শত্রু ও শোষক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতার আশা রাখেন... পূর্ববাংলার জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের গঠনতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের প্রধান শক্তি হইবে এখানকার শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী মানুষেরা।...

এই পরিস্থিতিতে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবী এখন একটি হঠকারী দাবী।... তাই বর্তমানে আমরা পরিপূর্ণ স্বায়াত্বশাসনের দাবী উত্থাপন করিব।...

...কিন্তু যাহারা স্বাধীন পূর্ববাংলা দাবী উত্থাপন করিবেন আমরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকিব। আমাদের খেয়াল রাখিতে হইবে যে, এই দাবীর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ রহিয়াছে, যদিও বর্তমান অবস্থায় এই দাবী হঠকারী আমরা এই কথা তাহাদেরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বর্তমানে পরিপূর্ণ স্বায়াত্বশাসনের আন্দোলন যে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সঠিক পথ ইহা বুঝাইতে এখন তাহাদিগকে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবী উত্থাপন হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিব।"[৫৭]

মাত্র দেড় মাস পরে এই পার্টির ভিন্ন আরেকটি গোপন দলিলে এই প্রসঙ্গে আরো অভিমত প্রকাশ করা হয় যে,

"এই রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা যত বৃদ্ধি পাইবে এবং জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আন্দোলন যত জোরদার হইবে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শগত ভিত্তিও তত দুর্বল হইয়া পড়িবে।

৫৭. স্বাধীন পূর্ববঙ্গ দাবী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির 'রাজনৈতিক চিঠি', পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, ১৪ জুলাই, ১৯৬২

এই অবস্থায়, বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি বিশেষতঃ পূর্ব ও পশ্চীম পাকিস্তানের মত দুইটি পৃথক অঞ্চল নিয়া একটি মাত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং ভবিষ্যতে পাকিস্তান রাষ্ট্র একাধিক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িতে পারে।"[৫৮]

কমিউনিষ্ট পার্টির এসব গোপন দলিল অনুয়ায়ী দেখা যায়, ১৯৫৯ সাল থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীন পূর্ববঙ্গের চিন্তাধারা সুস্পষ্টভাবেই এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক চেতনায় বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু আওয়ামী লীগ-কমিউনিস্ট পার্টির দিপক্ষীয় বৈঠকে, কমিউনিস্ট পার্টি তাদের দলিলের মূল্যায়নের আলোকে শেখ মুজিবের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। অবশেষে শেখ মুজিব বিষয়টির অসময়োচিততা ও অপরিপক্কতার যুক্তি মেনে নেন। এ ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির মুল্যায়ন ছাড়াও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শ শেখ মুজিব গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[৫৯]

আন্দোলন শুরু করার প্রস্তুতি স্বরূপ প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ঠিক হয়েছিল, এই লক্ষ্যে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও গণতন্ত্রের দাবীতে করাচী থেকে সর্ব-প্রথম শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটি বিবৃতি দেবেন।

কিন্তু বিবৃতিদানের পূর্বেই এই গোপন সলাপরামর্শের কথা সামরিক সরকারের কাছে পেঁৗছে যায়। ৩০ জানুয়ারী বিকালে করাচীতে কোনো প্রকার প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়েই শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়।

বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন : নূতন দিগন্ত

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং জনমত গড়ে তোলা সেসময় এক দুঃসাহসিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল (সামরিক শাসনে তৎকালীন পাকিস্তান বাসীর প্রতিক্রিয়া অধ্যায় পড়লেই তা বোঝা যাবে)। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ সেই চ্যালেঞ্জটিই সেদিন গ্রহণ করেছিলো এবং সফলও হয়েছিলো। দীর্ঘ চার বছর পর বাষট্টিতে এসে বিক্ষোভ সমাবেশ করে আইয়ুবের স্বৈরশাসনে প্রথম কাঁপন ধরাতে ছাত্ররা সক্ষম হয়।

---

৫৮. জেলা ইউনিটিগুলোর কাছে প্রেরিত পার্টির সভ্যদের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির দলিল, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, ২৮ আগষ্ট, ১৯৬২

৫৯. খোকারায়, সংগ্রামের তিন দশক, পৃষ্ঠা, ১৮৩

এই অবস্থায়, বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি বিশেষতঃ পূর্ব ও পশ্চীম পাকিস্তানের মত দুইটি পৃথক অঞ্চল নিয়া একটি মাত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং ভবিষ্যতে পাকিস্তান রাষ্ট্র একাধিক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িতে পারে।"[৫৮]

কমিউনিষ্ট পার্টির এসব গোপন দলিল অনুয়ায়ী দেখা যায়, ১৯৫৯ সাল থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীন পূর্ববঙ্গের চিন্তাধারা সুস্পষ্টভাবেই এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক চেতনায় বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু আওয়ামী লীগ-কমিউনিস্ট পার্টির দিপক্ষীয় বৈঠকে, কমিউনিস্ট পার্টি তাদের দলিলের মূল্যায়নের আলোকে শেখ মুজিবের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। অবশেষে শেখ মুজিব বিষয়টির অসময়োচিততা ও অপরিপক্কতার যুক্তি মেনে নেন। এ ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির মুল্যায়ন ছাড়াও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শ শেখ মুজিব গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[৫৯]

আন্দোলন শুরু করার প্রস্তুতি স্বরূপ প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ঠিক হয়েছিল, এই লক্ষ্যে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও গণতন্ত্রের দাবীতে করাচী থেকে সর্ব-প্রথম শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটি বিবৃতি দেবেন।

কিন্তু বিবৃতিদানের পূর্বেই এই গোপন সলাপরামর্শের কথা সামরিক সরকারের কাছে পেঁাছে যায়। ৩০ জানুয়ারী বিকালে করাচীতে কোনো প্রকার প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়েই শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়।

বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন : নূতন দিগন্ত

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং জনমত গড়ে তোলা সেসময় এক দুঃসাহসিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল (সামরিক শাসনে তৎকালীন পাকিস্তান বাসীর প্রতিক্রিয়া অধ্যায় পড়লেই তা বোঝা যাবে)। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ সেই চ্যালেঞ্জটিই সেদিন গ্রহণ করেছিলো এবং সফলও হয়েছিলো। দীর্ঘ চার বছর পর বাষট্টিতে এসে বিক্ষোভ সমাবেশ করে আইয়ুবের স্বৈরশাসনে প্রথম কাঁপন ধরাতে ছাত্ররা সক্ষম হয়।

---

৫৮. জেলা ইউনিটিগুলোর কাছে প্রেরিত পার্টির সভ্যদের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির দলিল, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, ২৮ আগষ্ট, ১৯৬২

৫৯. খোকারায়, সংগ্রামের তিন দশক, পৃষ্ঠা, ১৮৩

বাষট্টির এই ছাত্র আন্দোলনের তিনটি পর্যায় ছিল :

১, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানাতে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের সূচনা (১ ফেব্রুয়ারী থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত)

২, আইয়ুব খান প্রবর্তিত সংবিধান বিরোধী আন্দোলন (মার্চ থেকে এপ্রিল)

৩, আইয়ুব প্রবর্তিত শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন (সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর)।

আন্দোলনের প্রস্তুতি :

ছাত্রইউনিয়ন-ছাত্রলীগ যৌথ বৈঠক

ইতোমধ্যেই সামরিক শাসন সম্পর্কে ছাত্রদের মোহ ধীরে ধীরে হলেও কাটতে শুরু করেছিল, ছাত্র সংগঠনগুলো একটু একটু সংগঠিত হতে শুরু করে দেয়। এর মধ্যে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মোহাম্মদ ফরহাদের উদ্যোগে ছাত্রলীগ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের একটি গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয় ৩০ ডিসেম্বর ১৯৬১, ইস্কাটনের একটি বাড়ীতে। দুই সংগঠনের প্রায় ৩০–৩৫ জন নেতা কর্মী সেই গোপন বৈঠকে যোগ দেয়। তবে আন্দোলনের চেতনার দিক থেকে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গিগত একটা পার্থক্য ছিল। ছাত্রলীগ প্রধানভাবে সামরিক শাসনের পরিবর্তে সারা পাকিস্তান ব্যাপী একটি সংসদীয় (পার্লামেণ্টারী) গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করার কথাই চিন্তা করতো। এবং নেতৃবৃন্দের একটা বড় অংশের মধ্যেই আইয়ুব খানের পরিবর্তে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট করার স্বপ্নই ছিল প্রধান। (অবশ্য এই ধারার ব্যতিক্রম নেতৃবৃন্দও ছাত্রলীগে ছিলো)। অন্যদিকে ছাত্র ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীর সঙ্গে জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে নতুন জাতীয়তা-বাদী চেতনায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে অগ্রাধিকার দিত।[৬০]

তবু এই গোপন বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, যে কোন কিছুর বিনিময়ে সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং সামনের একুশে ফেব্রুয়ারী (১৯৬২) থেকেই তা শুরু করা হবে। কিন্তু ফেব্রুয়ারীর একুশ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকার প্রয়োজন হল না ছাত্রদের। ৩০ জানুয়ারী সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের খবর ৩১ জানুয়ারীর ঢাকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে দাবানলের মতো চারদিকে তা ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভ সঞ্চারিত হতে থাকে ছাত্র সমাজের

৬০. সাক্ষাৎকার, সাইফুদ্দিন মানিক, রাশেদ খান মেনন, পঙ্কজ ভট্টাচার্য এবং কাজী জাফর, পূর্বোক্ত

মধ্যে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষগুলিতে শুধু একটাই গুঞ্জরণ— করাচীতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একটা চাপা উত্তেজনা সমগ্র ছাত্র সমাজকে দৃঢ় প্রত্যয়ী করে তুলতে থাকে।

প্রথম পর্ব : সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন

তারিখ : ৩১ জানুয়ারী। স্থান : মধুর কেন্টিন। রাতে সকল ছাত্র সংগঠনের এক অনির্ধারিত সভা বসে এখানে। ছাত্রলীগ থেকে উপস্থিত ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক, সিরাজুল আলম খান ও মাহবুব (পরে ব্যারিষ্টার), ছাত্র ইউনিয়ন থেকে মোহাম্মদ ফরহাদ, বদরুল হক (পরে এডভোকেট, পটুয়াখালী), জয়নাল আবেদীন, হায়দার আকবর খান রণো, রহিম আজাদ ও আহমেদ জামাল (পরে ডাক্তার), ছাত্রশক্তির পক্ষ থেকে মওদুদ আহমদ (বর্তমান উপ প্রধানমন্ত্রী), এন, এস, এফ-এর পক্ষ থেকে আবুল হাসনাত (বর্তমান বি, এন, পি নেতা)।

সভা আহ্বানের মূল উদ্দেশ্য ছিল সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে সর্ব-দলীয় প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকরনে কর্মসূচী নির্ধারণ। কিন্তু সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছিল না। কারণ এন, এস, এফ এবং ছাত্রশক্তি তার বিরোধিতা করছিল এবং সরকারের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল। বিশেষ করে এন, এস, এফ এই কর্মসূচী বানচালের উদ্দেশ্যেই সভায় এসেছিল। কারণ তাদের নেতা আইয়ুব খান পরদিন ১ ফেব্রুয়ারীই ঢাকা আসছেন। আর এ দিনই ধর্মঘট বিক্ষোভ সমাবেশ সংঘটিত হওয়া 'লৌহ মানবে'র মর্যাদার পক্ষে হুমকি স্বরূপ।

সমঝোতা না হওয়ায় এক পর্যায়ে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ হটাৎ করেই সবাইকে চমকে দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ চাচ্ছিলেন অন্ততঃ ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন যৌথ উদ্যোগে আগামীকাল যে কোনো প্রতিবাদ কর্মসূচী পালিত হোক।

রাত তখন দু'টো। এন, এস, এফ ও ছাত্রশক্তির নেতৃবৃন্দ চলে যাওয়ার পর সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন তাদের কাছ থেকে সংবাদ টুকে নিলেন "আগামীকাল ধর্মঘট হচ্ছে না।"

প্রকৃতপক্ষে এন, এস, এফ ও ছাত্র শক্তির সামনে পরদিনের কর্মসূচী নিলে ছাত্র-নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা ছিল এবং ধর্মঘটও বানচাল হয়ে যেতে পারতো। সাধারণ ছাত্র সমাজে যে স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারে পুনরায় তাতে ভীতি ঢুকতে পারতো।

রাত দুটোর পর শুধু ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ সভায় মোহাম্মদ ফরহাদ পরদিন ধর্মঘটের প্রস্তাব করেন এবং তা গৃহীত হয়। সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা যখন উচচ মহলে রিপোর্ট লিখছেন, আগামীকাল ছাত্র মহলে উত্তেজনা হচ্ছেনা, তখন মধুর কেন্টিনে মোহাম্মদ ফরহাদ প্রথম পোষ্টারটি লিখলেন, 'আগামীকাল ধর্মঘট', সিরাজুল আলম খান পোষ্টারটি দেওয়ালে লাগিয়ে দিলেন। যৌথ সভায় আরো সিদ্ধান্ত হল, ধর্মঘটটি সাধারণ ছাত্রদের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত হচ্ছে এমন ভাব দেখাতে হবে। এবং এরকম ছাত্র সভায় ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ কেউই বক্তৃতা করবেন না।

বৈঠকের পর নেতৃবৃন্দ চলে যান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে স্থাপিত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে। সেখানে অপেক্ষা করছিল বিভিন্ন শাখার নেতা ও কর্মীরা। কলেজ ও হলগুলিতে ধর্মঘটের খবর পৌঁছে দেওয়া হল।[৬১]

ফেব্রুয়ারী, ১। পরদিন সকালে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হল। একজন নিরপেক্ষ প্রগতিশীল ছাত্র কর্মী আনিসুর রহমান তাতে বক্তৃতা করলেন। পরদিন ২ ফেব্রুয়ারী কোনো সংবাদপত্রে ছাত্র ধর্মঘটের সংবাদ ছাপা হল না। ফলে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা মিছিল নিয়ে এগিয়ে গেল প্রেসক্লাবের দিকে। সেখানে ছাত্ররা সরকারী পত্রিকা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিল। উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন ছাত্র ইউনিয়ন নেতা রহিম আজাদ। দীর্ঘ ৪ বছর পর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্য রাস্তায় বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোর ও হলগুলো প্রতিবাদী ছাত্রদের পোষ্টারে ছেয়ে গিয়েছিল। এন, এস, এফ ও ছাত্রশক্তি অবশ্য পূর্ব রাতের সিদ্ধান্ত ভঙ্গের অভিযোগ এনেছিল ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের কাছে। কিন্তু আন্দোলন এক পর্যায়ে এমন অবস্থায় চলে যেতে থাকলো যে তাদের অভিযোগের আর উত্তর দিতে হলো না। ক্রমাগত ৫ দিন একের পর এক বিক্ষোভ, সমাবেশ চলতেই থাকে।

এর পরদিন ৩ ফেব্রুয়ারী আইয়ুবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী পুরনো কলা ভবনের ১০৪ নম্বর কক্ষে

৬১. সাপ্তাহিক 'নতুন কথা', রাশেদ খান মেনন সম্পাদিত, প্রথমবর্ষ, ৪১শ সংখ্যা এবং কাজী আকরাম হোসেন, গৌরবের সমাচার, ১৯৭৭

একটি নির্ধারিত বক্তৃতা দেওয়ার জন্য উপাচার্যের সঙ্গে প্রবেশ করতে করতেই ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তাঁর বক্তৃতা শুরুর পূর্ব থেকেই মঞ্জুর কাদের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আঞ্চলিক বৈষম্য ইত্যাদি প্রশ্নমালার সম্মুখিন হলেন। তিনি বক্তব্য রাখার জন্য সবেমাত্র মাইকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, আর অমনি তাঁকে ছাত্ররা কলার চেপে ধরলো, একদল গায়ে থু থু পর্যন্ত ছিটিয়ে দিল। একপাশে মঞ্জুর কাদেরকে সরিয়ে দিয়ে ছাত্ররাই বক্তৃতা শুরু করে দেয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই নাজেহাল অবস্থা থেকে রক্ষা করে।

এই নিয়ে ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারী সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করে। কিন্তু কৌশলগত কারণে ছাত্র নেতৃবৃন্দ রাস্তায় মিছিল নিয়ে বের হওয়া থেকে বিরত থাকে। তবে নগরীর বড় বড় দেওয়ালগুলি গভীর রাতে শ্লোগান লিখনে ভরে যায়—'ডাউন উইথ মার্শাল ল', 'সামরিক শাসন নিপাত যাক'।

কিন্তু ৫ ফেব্রুয়ারী রাতে হটাৎ করেই ঘোষণা করা হল ৬ ফেব্রুয়ারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। প্রতিবাদে ছাত্রলীগ-ছাত্র-ইউনিয়ন যৌথভাবে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করলে কয়েক হাজার ছাত্র কার্জন হল প্রাঙ্গনে সমবেত হয়। প্রতিবাদ সভার পর এক বিক্ষোভ মিছিল নগরীর রাজপথ ও পুরানো ঢাকার জনপথ প্রদক্ষিণ করে। পুলিশ ভেবেছিল, মিছিল প্রেসিডেণ্ট আইয়ুবকে ঘেরাও করবে, তাই তারা মোড়ে মোড়ে ব্যারিক্যাডের স্মৃষ্টি করে। কার্জন হলের সামনে মিছিল পৌঁছলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। সেখানে প্রিয় উপাচার্য ডঃ মাহমুদ হোসেন ছাত্রদের দেখতে আসলে পুলিশের ইটের আঘাতে তিনি আহত হন। ছাত্ররা একটি পুলিশের বাস পুড়িয়ে দেয়। এই সময় সেনাবাহিনীর জি, ও, সি ঐপথ দিয়ে যাওয়ার সময় ছাত্ররা তাঁকে ধাওয়া করে এবং তাঁর ড্রাইভার আহত হন।[৬২]

এ সময় মিছিলের গতিপথ নিয়ে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ছাত্রলীগ চাচ্ছিলো শাহবাগের দিকে যেতে। সেখানে শাহবাগ এভিনিউতে (পূর্বতন আইয়ুব এভিনিউ) আইয়ুবের নাম ফলক, পুলিশের রেরিক্যাড ভেঙ্গে, ফেলে দেবে। ছাত্র ইউনিয়ন বলছিল, ছাত্রদের আন্দোলনে জনতার সমর্থন আদায়ের জন্য পুরানো ঢাকার দিকে নিয়ে যাবে। এমন দোদুল্যমান অবস্থায় এক পর্যায়ে উৎসাহী কিছু ছাত্রের সঙ্গে শাহবাগে পুলিশের হাতাহাতি শুরু হয়ে

৬২. সাক্ষাৎকার, সাইফুদ্দিন মানিক, হায়দার আকবর খান রণো, পঙ্কজ ভট্টাচার্য

যায়। কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার এক পর্যায়ে উত্তেজিত ভাবে ছাত্রদের পিস্তল দেখালে তা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় (পরে অবশ্য ছাত্ররা উপাচার্যের কাছে পিস্তলটি জমা দিয়ে দেয়)।

এ সময় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সুসংগঠিত ছাত্রদল সমগ্র মিছিলের গতিপথকে পরিবর্তন করে নাজিমউদ্দিন রোড দিয়ে পুরান ঢাকায় প্রবেশ করিয়ে দেয়। পুরোন ঢাকায় মিছিল চলে আসলে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। সাধারণ মানুষ এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এখানে অনির্ধারিত হলেও হরতাল পালিত হয়ে যায়।[৬৩]

ফেব্রুয়ারী, ৭। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এদিন স্বয়ং আইয়ুব খানকেই ঘেরাও করার কর্মসূচী নেওয়া হয়। এক বিশাল জমায়েত অনুষ্ঠিত হয় এদিন। পুলিশের সাথে সেনাবাহিনীও রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে থাকে। হাইকোর্ট ও কার্জন হলের সামনে দু'টি ফিল্ডকামান বসানো হয়েছিল। এমন করে চতুর্দিক ঘেরাও করা হয়েছিল যাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা বের না হতে পারে।

কিন্তু এক অদ্ভূত কৌশলে ছাত্ররা এদিন শেষ পর্যন্ত মিছিল শহরে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। কার্জন হল থেকে মিছিল ঢাকা হলের (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) ক্যান্টিনের পাশ দিয়ে ছাত্ররা প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে প্রবেশ করে। সেখান থেকে মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালের ভেতর দিয়ে বক্সীবাজারে পুরোন ঢাকায় প্রবেশ করে। পুলিশ আর সেনাবাহিনী সেদিন ছাত্রদের কাছে কৌশলে এমনি ভাবে মার খেয়েছিল।[৬৪]

মিছিল পুরানো ঢাকা অতিক্রম করে হাটখোলা রোডে এসে আবার বাধার সম্মুখিন হয়। প্রচণ্ড লাঠিচার্জের সামনে পড়ে মিছিল শেষ পর্যন্ত ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বিকালে ঢাকা হলে ছাত্রলীগ-ছাত্রইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। অধিক রাত পর্যন্ত সভা চলায় ছাত্র নেতারা ঢাকা হল ও ফজলুল হক হলেই থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ রাতেই পুলিশ ও সেনাবাহিনী সমস্ত হল ঘেরাও করে একটি মাত্র গেট দিয়ে ছাত্রদের বের হওয়ার নির্দেশ দেয়। হল ত্যাগ করতে বলা হয় সকল ছাত্রকে। ৭ দিন পর্যন্ত সময় লেগেছিল সমস্ত ছাত্রদের

৬৩. সাক্ষাৎকার, পঙ্কজ ভট্টাচার্য ও ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী এবং কাজী আকরাম হোসেন, পূর্বোক্ত

৬৪. সাক্ষাৎকার, হায়দার আকবর খান রণো, সাইফুদ্দিন মানিক, রাশেদ খান মেনন এবং সরকারী প্রেসনোট, পাকিস্তান অবজারভার, ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

বের করতে। কোনো কোনো ছাত্র বললো, বাড়ী যাওয়ার মতো কোনো টাকা তাদের কাছে নেই। তাদের টাকা পর্যন্ত দেওয়া হল, তবু বাধ্যতামূলকভাবে হল ত্যাগ করতে হয়। এই ৭ দিন গোয়েন্দা পুলিশ সারাক্ষণ গেটে বসে থাকলো ছাত্রনেতাদের ধরার জন্য, তাদের কাছে এই সংবাদ ছিল যে, ছাত্র নেতারা এই হলেই আছে।

বের হওয়ার আর কোনো পথ ছিল না। সপ্তম দিবসে প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি শুরু হলে সেনাবাহিনী ও পুলিশের লোকজনকে কিছুটা গুটিয়ে নিলে সন্ধ্যার পর মোহাম্মদ ফরহাদ, শেখ ফজলুল হক মণি প্রমুখ পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু ছাত্রনেতাদের নামে হুলিয়া জারী করায় সাময়িকভাবে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে।

এই পর্যায়ের আন্দোলনে বহু ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। ৭ ফেব্রুয়ারী থেকে ৯ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঢাকায় প্রায় ২২৯ জনের গ্রেফতারের সংবাদ দৈনিক কাগজ-গুলিতে প্রকাশ পায়। এতেও ছাত্র আন্দোলন দমিত হলো না, বরং ঢাকার বাইরে বরিশাল, পিরোজপুর, সিলেট, খুলনা, নোয়াখালী কুমিল্লায় প্রবল আকার ধারণ করে।৬৫

মার্চ মাসে শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানসমূহ খুললে আবার আন্দোলন শুরু হয়। ১৫ মার্চ থেকে অব্যাহত ভাবে ছাত্র ধর্মঘট চলতে থাকে। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে প্রকাশ্য রাজপথে মিছিল করায় বেশ কিছু ছাত্র গ্রেফতার হয়। ডাকসুর সহ-সভাপতি রফিকুল হক ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতা হায়দার আকবর খান রনো প্রমুখকে সহ গ্রেফতারকৃত সকলকে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রথম চিকামারা

বর্তমানে দেওয়ালে রং দিয়ে শ্লোগান লেখাকে রাজনৈতিক মহলে 'চিকামারা' বলা হয়ে থাকে। 'চিকামারা' শব্দটি চালু হয় ৬২ সাল থেকে।

৬২-র ৬ ফেব্রুয়ারী আইয়ুব বিরোধী শ্লোগান গভীর রাতে রাজপথে লিখে চল-ছিলো ছাত্র নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলো মোহাম্মদ ফরহাদ, রেজা আলী, হায়দার আকবর খান রনো, এ,কে, বদরুল হক, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক,

৬৫. দৈনিক আজাদ, ৮, ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

প্রমুখ। মাঝে মাঝেই হটাৎ করে পুলিশ দ্বারা তারা আক্রান্ত হতো। পুলিশ যখন আসতো, তখন ছাত্র নেতৃবৃন্দ লাঠি-ইট নিয়ে ছুটাছুটি শুরু করে দিতো। এতো রাতে তারা কি করছে, পুলিশ জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তর দিতো, 'চিকা মারছি'। এভাবে কথাটি চালু হয়ে যায়। ছাত্ররা যেদিন দেওয়ালে শ্লোগান লিখবে সেদিন তারা বলতো, আজকে রাতে 'চিকা মারবো'। ৬ ফেব্রুয়ারী রাতে এদেশের প্রথম দেওয়াল লিখনটি ছিল 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' এবং 'Down Ayub', 'পূর্ব বাংলাকে শোষণ করা চলবেনা'। এভাবে প্রথম চিকাটি মারা হয়েছিল ঢাকা হলের পূর্ব পাশে রেলওয়ে হাসপাতালের পাশে টি, এন, টি'র একটি দেওয়ালে। পরদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রলীগ নেতা শাহ্ মোয়াজ্জেম, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মোহাম্মদ ফরহাদকে 'পূর্ব বাঙলা' লেখার জন্য সমালোচনা করে। উদ্যোক্তরা বলেছেন, ইন্দোনেশিয়ায় তখন এসব দেওয়াল লিখনের প্রচলন ছিল এবং খবরের কাগজে তার ছবি দেখে তারা এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন।[৬৬]

বাষট্টি, দ্বিতীয় পর্ব : শাসনতন্ত্র

এই সময় সামরিক শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিল বটে এবং সামরিক আইনের ভয়াবহতা কতখানি মাত্রায় যেতে পারে ছাত্ররা তার টের হাড়ে হাড়ে পাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু তাতেও ছাত্র সমাজ একেবারে দমিত হল না। বরং কিছু দিন পর ৬২-র সংবিধান প্রশ্নে আবার সংগঠিত হয়ে উঠলো। আইয়ুব খান ১৯৬০ সালে জানুয়ারী মাসে তার মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন শেষে ১৫ ফেব্রুয়ারী ৯৫'৬ শতাংশ মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর দুদিন পরই তিনি শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। এর সুপারিশের ভিত্তিতে ৬২ সালের ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদ এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে এপ্রিলের মাঝামাঝি ছাত্ররা 'শপথ দিবস' পালন করে। মূলতঃ এই দিবসটির মধ্য দিয়ে নেতৃবৃন্দ ঝিমিয়ে পড়া ছাত্র অন্দোলনে একটা 'ওয়ার্ম আপ' করে নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও কেন্দ্রীয় ভাবে মধুর রেস্তোরায় ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানেও শপথ দিবসের কর্মসূচী পালিত হয়। এই কর্মসূচীটি পালিত হয় প্রধানত ছাত্র ইউনিয়নের ডাকে।

৬৬. সাক্ষাৎকার, রাশেদ খান মেনন, সাইফুদ্দিন মানিক

অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ নীতিগতভাবে মনে করতো "যদিও বর্তমান শাসনতন্ত্র গণবিরোধী ও একনায়কতন্ত্রের পরিপোষক, তবু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী" বলে এ নির্বাচনে অংশ গ্রহন করা উচিৎ।[৬৭]

ছাত্ররা এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুললে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকে।

এমনকি পরে দেখা গেছে, নির্দলীয় এ নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যরা আইয়ুব খানের প্রবল চাপ ও প্রলোভনের পরও ছাত্র আন্দোলনের তোড়ে প্রেসিডেণ্টের দলে সবাই যোগ দিতে প্রথমে ইতস্ততঃ করেছে। (অবশ্য পাকিস্তানের সেই অকর্মণ্য সংসদেও শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে কাজ হয়েছিল)।[৬৮]

এই সময়ের ছাত্র আন্দোলন এই প্রশ্ন ছাড়াও বন্দী ছাত্র নেতাদের মুক্তি, হুলিয়া প্রত্যাহার, রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি, বাক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া, মৌলিক অধিকার প্রত্যার্পণ ইত্যাদি দাবীর প্রেক্ষিতে জঙ্গী হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি আরো জটিলতার দিকে মোড় নিতে পারে ভেবে ৩১ মে বিশ্ববিদ্যালয় আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এর মধ্যে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক রাজনীতিবিদদের মধ্য থেকেও ছাত্রদের দাবীর পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। ফলে কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ ছাত্রকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। কিন্তু সকল ছাত্রের মুক্তি না দেওয়ায় ছাত্রদের আন্দোলন অব্যাহত থাকে এবং জুন মাসে পরীক্ষা পেছানোর দাবী নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের আন্দোলন জমে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশেষে এ দাবীও মেনে নেন।[৬৯]

নির্বাচনের পর ছাত্র নেতৃবৃন্দ অন্য একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করে। নির্বাচনের সময়ে যারা বয়কট আন্দোলনে কর্ণপাত না করেও দাঁড়িয়েছিল তাদের ধরে ধরে পার্লামেণ্টে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার কথা বলার প্রতিশ্রুতি আদায় করে। আন্দোলনের অংশ হিসাবে এক পর্যায়ে ছাত্ররা সবুর খানের কাছে যায়। সবুর

---

৬৭. ঘোষণাপত্র, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, প্রচার সম্পাদক, নাসিরউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা, ৭

৬৮. "প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাহীন সেই জাতীয় পরিষদ মঞ্চ হইতেও দেশবাসীর বক্তব্য যথার্থভাবে উপস্থিত করা যে সম্ভব হইয়াছে, তাহা এক ঐতিহাসিক সত্য।"—অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি, পৃষ্ঠা, ৩১৪

৬৯. দৈনিক আজাদ, ১০,১৪,২৮ জুন, ১৯৬২

খান বিস্মিত হয়ে ছাত্রদের বলেন, "তোমরা কি পাগল হয়েছো যে, আইয়ুব মন্ত্রী-সভায় ভূট্টো-(জুলফিকার আলী ভূট্টো—লেখক) বরকীদের (লেঃ জেনারেল বারকী—লেখক) সঙ্গে আমি মন্ত্রী হবো?" (এই ঘটনার আট-দশ দিন পরই সবুর খান আইয়ুবের যোগাযোগ মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। অথচ আইয়ুবের সামরিক শাসনের প্রথম পর্যায়ে তিনি দুর্নীতির অভিযোগে সামরিক আদালতের রায়ে চারটি বেত্রদণ্ডের শাস্তি ভোগ করেছিলেন)।

ছাত্ররা ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সকল সদস্যকেই স্মারকলিপি দিচ্ছিল এবং প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিচ্ছিল। কিন্তু যাঁকে ছাত্ররা খুব বেশী করে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তিনি হচ্ছেন মোনায়েম খান। সংসদ সদস্য হিসাবে পাশ করেই তিনি ময়মনসিংহ থেকে এক বিবৃতি দিয়ে রাজবন্দীদের 'দেশদ্রোহী' হিসাবে আখ্যায়িত করেন এবং সরকারের কাছে তাঁদের মুক্তি না দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। ছাত্ররা চাচ্ছিল তাঁকে দিয়েই সংসদে প্রথমে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী উত্থাপনের প্রতিশ্রুতি আদায় করবে। কিন্তু মোনায়েম খান কিছুতেই ছাত্রদের কাছে ধরা দিলেন না। অধিক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেও তাঁর বাসা থেকে ছাত্রদের ফিরে আসতে হয়। কিন্তু ছাত্ররা ঠিক করে যে সংসদে যোগদানের নির্দিষ্ট দিনে তারা এ ব্যাপারে বিমান বন্দরেই মোনায়েম খাঁকে ধরবে।

বিমান বন্দরে এ উপলক্ষে ছাত্ররা নির্দিষ্ট দিনে এক ব্যাপক জমায়েত করে। মোনায়েম খান যখন বিমান বন্দরের লাউঞ্জে আসেন তখন প্রথমেই উপস্থিত ছাত্র-দের দ্বারা এক দফা 'ধোলাই-পর্ব' হজম করেন। এরপর কাজী জাফর আহমদ তাঁর শেরওয়ানীর কলার চেপে ধরে এক লম্বা বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেন। এক পর্যায়ে ধস্তাধস্তিতে তাঁর মাথার টুপি পর্যন্ত পড়ে যায়। অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে উঠলে উপস্থিত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী এবং তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মধ্যস্থতা করে মোনায়েম খানকে এ যাত্রা রক্ষা করেন। মোনায়েম খান কয়েকদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং দু'মাসের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হয়ে প্রাপ্য পুরস্কার নিয়ে স্বদেশে ফিরেন।[৭০]

বাষট্টি, তৃতীয় পর্ব : শরীফ কমিশন বিরোধী আন্দোলন

আগষ্ট মাস থেকে বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের নতুন দিগন্তের শুরু। ইতোমধ্যে শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে শরিফ কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

---

৭০. কাজী জাফর আহমদ, প্রাগুক্ত

ছাত্ররা এই কমিশনের প্রতিবেদন অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করলো। এই অগ্রহণ-যোগ্যতার কারণসমূহ নির্ণয়ের জন্য শরীফ কমিশন প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

শরীফ কমিশন এবং তার প্রতিবেদন

আইয়ুব খান প্রেসিডেণ্ট হয়েই শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠন করার চিন্তা ভাবনা করেন। এ সম্পর্কে একটি ঘোষণা ৩০ ডিসেম্বর (১৯৫৮) সাধারণ্যে প্রচার করা হয়। আইয়ুব খান নিজেই ৫ জানুয়ারী (১৯৫৯) কমিশনের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। পশ্চিম পাকিস্তান শিক্ষাবিভাগের সচিব এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আইয়ুবের প্রাক্তন শিক্ষক জনাব এস, এম শরীফকে চেয়ারম্যান করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৬ জন এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪ জন সদস্য নিয়োগ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যগণ ছিলেন নিম্নোক্ত :[৭১]

১, ডঃ মোমতাজুদ্দিন আহমদ, উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২, আবদুল হক, প্রেসিডেণ্ট, ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

৩, অধ্যাপক আতোয়ার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪, ডঃ এ, রশীদ, অধ্যক্ষ, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

১৯৫৯ সালের ২৬ আগষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন হিসাবে এই কমিশনের সুপরিশসমূহ প্রেসিডেণ্টের কাছে দাখিল করা হয় এবং গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে।

কমিশনের সুপারিশে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বলা হয়েছিল :

"আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজীর বিরাট প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেই জন্য ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে ডিগ্রী স্তর পর্যন্ত ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক পড়া হিসাবে শিক্ষা দিতে হইবে।" (কমিশন প্রতিবেদন : ৩৪৯ পৃষ্ঠা),

এবং 'উর্দুকে মুষ্টিমেয় লোকের পরিবর্তে জনগণের ভাষায় পরিণত করিতে হইবে।' অন্যত্র, "উর্দু ও বাঙলা ভাষার সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠতর করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।' (পৃষ্ঠা : ৫১৯)

---

৭১. জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, পাকিস্তান সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জানুয়ারী-আগষ্ট, ১৯৫৯ (করাচী, ১৯৬১), পৃষ্ঠা-৪০৫

শরিফ কমিশন পাকিস্তানের একটি অভিন্ন বর্ণমালার জন্যও সুপারিশ করেন। স্মর্তব্য যে, এর মাত্র সাত বছর আগে তৎকালীন পূর্ব বাঙলায় সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন। জাতীয় ভাষা ও জাতীয়তার প্রশ্নে পূর্ব বাঙলা তখনো সরগরম। শরীফ কমিশন অত্যন্ত সুকৌশলে বিতর্ক টেনে বলেন যে, "পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার জন্য যদি একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তন করিতেই হয় তাহা হইলে পবিত্র কোরাণ যাহাতে লেখা এবং যাহা সকল মুসলমানই পাঠ করে সেই আরবীয় (নাস্খ্) দাবী কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।" (পৃষ্ঠা : ৩৭০)

লক্ষ্যযোগ্য বিষয় যে, তৎকালে বাঙলার ওপর উর্দু চাপিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়ে পাকিস্তানী শাসকচক্র অত্যন্ত সুকৌশলে ধর্মীয় আবেগকে হাতিয়ার করে আরবীকে বাঙলার বিকল্প হিসাবে সামনে নিয়ে আসে।

কিন্তু শরীফ কমিশন শেষ পর্যন্ত এই বিতর্কের অবসানকল্পে সিদ্ধান্ত টানেন অন্যরকম, যা মাতৃভাষা বাঙলার বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের ছাত্র সমাজের কাছে আরেকটি ষড়যন্ত্র হিসাবেই আবিষ্কৃত হয় :

"আমরা মনে করি যে, একদিকে উর্দু ও বাঙলা বর্ণমালাসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন করা উচিত এবং অপরদিকে রোমান বর্ণমালায় এমন একটি আকারের উদ্ভব ও মান নির্ধারণ করা উচিত যাহা পাকিস্তানী ভাষাসমূহকে অক্ষরান্তর করার উপযোগী হইবে।" (পৃষ্ঠা : ৩৭৩)

কমিশন আরো সুপারিশ করেন যে,
"বিকল্পভাবে সরকারের পক্ষে তিনটি ভাষাবিদ কমিটি নিয়োগ করা উচিত যাহাদের একটি নির্দিষ্ট মানে উন্নয়নকৃত মুদ্রণযোগ্য একটি উর্দু বর্ণমালা নির্ধারণ করিবে, দ্বিতীয়টি বাঙলা বর্ণমালা সংস্কার করিবে এবং তৃতীয়টি উর্দু ও বাঙলার জন্য একটি রোমান বর্ণমালা গঠন ও মান নির্ধারণ করিবে।" (পৃষ্ঠা : ৩৭৩)

শিক্ষার উন্নয়নের জন্য শরীফ কমিশন অর্থ সংস্থান সম্পর্কিত যে সুপারিশ ও মন্তব্য করেন তা-ই সম্ভবতঃ ছিল, এই কমিশন গঠনের মূল উদ্দেশ্য। এখানে শিক্ষাকে একটি 'বিনিয়োগ' তথা লাভ লোকসানের ব্যবসা হিসাবে দেখানো হয়। শরীফ কমিশন তার প্রতিবেদনে সরাসরি এই বাক্যটিই লিপিবদ্ধ করেন---"শিক্ষা সস্তায় পাওয়া সম্ভব নয়।" (পৃষ্ঠা : ৩৯৬)

কমিশন অত্যন্ত খেদের সঙ্গে আবিষ্কার করেন,

"সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অর্থনীতিবিদগণের রীতি ছিল শিক্ষাকে সম্পদ সৃষ্টির অন্যতম উপায় হিসাবে না দেখিয়া একটি ব্যয় বহুল সমাজ সেবামূলক কাজ হিসাবে দেখা।" (পৃষ্ঠা : ৩৯৫)

সুতরাং তাঁরা নতুন তত্ত্ব হাজির করলেন যে, শিক্ষা হচ্ছে এক ধরণের মূলধন বিনিয়োগ, অর্থনীতির সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে :

"শিল্পে মূলধন বিনিয়োগকে (investment---লেখক) আমরা যে নজরে দেখি অনেকটা সেই নজরে শিক্ষা বাবত অর্থ ব্যয়কে দেখার যৌক্তিকতা প্রতীয়মান হয়।" (পৃষ্ঠা : ৩৯৫)

শরীফ কমিশনে 'অবৈতনিক শিক্ষার ধারণাকে অবাস্তব কল্পনা' বলে পরিহাস করা হয় এবং সর্বজনীন শিক্ষার গণদাবীকে নির্বিচারে ব্যঙ্গ করে বলা হয় :

"শিক্ষার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে খুব সামান্যই অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে এবং আরও স্কুলের জন্য জনসাধারণ যতটা দাবী জানাইয়া থাকে উহার অনুপাতে ব্যয় বহনের অভিপ্রায় তাহাদের কখনই দেখা যায় নাই। অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল ও নামমাত্র বেতনের মাধ্যমিক স্কুল স্থাপনের জন্য সরকারের উপর নির্ভর করাই জনসাধারণের রীতি। তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে অবৈতনিক শিক্ষার ধারণা বস্তুতঃ অবাস্তব কল্পনা মাত্র।" (পৃষ্ঠা : ৩৯৮)।

শরীফ কমিশনের আরেকটি সুপারিশ এখানে অত্যন্ত উল্লেখ্য এই জন্য যে, নিম্নোক্ত এই বিষয়টিও বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করে সাধারণ ছাত্রদের চেতনাকেও নাড়া দিয়েছিল :

"বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে আমরা অতীব জোরের সহিত সুপারিশ করিতেছি যে, স্নাতক (Graduate) ডিগ্রী কোর্সকে সম্প্রসারণ করিয়া তিন বৎসর মেয়াদী করা উচিত হইবে।" (পৃষ্ঠা : ২৪)

ছাত্র সমাজের মূল্যায়ণে শরীফ কমিশন প্রতিবেদনকে একটি প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি হিসাবে চিহ্নিত করে।[৭২] শিক্ষা সঙ্কোচন নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে

---

৭২. অনেকে মনে করেন, এমনকি বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের কয়েকজন নায়কও আমার কাছে বলেছেন, বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল হামুদুর রহমান কমিশনের বিরুদ্ধে। অথচ হামুদুর রহমান কমিশন গঠিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর। প্রকৃতপক্ষে বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল শরীফ কমিশনের বিরুদ্ধে। হামুদুর রহমান কমিশন গঠিত হয়েছিল বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান ও শরীফ কমিশনের মূল্যায়ন করার জন্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রতিবছর আমাদের দেশের সংবাদ-পত্রগুলি পর্যন্ত ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসের সংবাদ ছাপাতে গিয়ে হামুদুর রহমান কমিশনের কথাই লিখে থাকে।

'শিক্ষা বিনিয়োগ' শব্দ দ্বারা মূলতঃ যে সন্তানের পিতার টাকা আছে তার জন্যই শিক্ষার দ্বার খোলা রাখার প্রস্তাব করা হয়। এতে দরিদ্র পিতার সন্তান মেধাবী হলেও শিক্ষার দ্বার তার জন্য বিলাসিতা হিসাবেই গণ্য হয়।

শরীফ কমিশন বিরোধী আন্দোলন

খুব স্বাভাবিক কারণেই ছাত্ররা এই প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করলো। এমনিতেই সেই সময় ছাত্ররা বিভিন্ন প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় ইস্যু পেলেই আইয়ুব খান তথা সামরিক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলছিল। এমন একটা অবস্থায় শরীফ কমিশনের গণবিরোধী সুপারিশ ছিল "ভিমরুলের চাকে খোঁচা" দেওয়ার মতো। ছাত্ররা অত্যন্ত সংগঠিতভাবে এই আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিল। এবং শুধুমাত্র শিক্ষা সমস্যাকে কেন্দ্র করেই এতো বিশাল ও ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে আর হয়নি। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের ছাত্ররা এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করে।

প্রথমে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ঢাকা কলেজ থেকে। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এতে অংশ নেয়। তবে এই আন্দোলন চলছিল অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে (অন্ততঃ আগষ্ট মাস পর্যন্ত)। অবশ্য এই সময় সারাদেশের মেডিক্যাল স্কুল ও ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনিষ্টিউটের ছাত্ররাও তাদের দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে আন্দোলন, এমনকি অনশন ধর্মঘটের পর্যন্ত আশ্রয় নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল।[৭৩]

তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী পাশ কোর্সের ব্যাপারে ঢাকা কলেজের ছাত্ররা সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ডিগ্রী ছাত্র জনৈক এম, আই চৌধুরী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।[৭৪] এর পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরাও আন্দোলন শুরু করে। তাদের ব্যাপার ছিল উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ইংরেজীর অতিরিক্ত বোঝা। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন কলেজে এই আন্দোলন চলছিল। স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের লাগাতার ধর্মঘট এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রদের ইংরেজী ক্লাশ বর্জনের মধ্যে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। জুলাই ভরে এভাবেই আন্দোলন চলে। 'ডিগ্রী ষ্টুডেণ্টস ফোরাম' নামে সংগঠন পরে 'ইস্ট পাকিস্তান ষ্টুডেণ্টস ফোরাম' নামে সংগঠিত হয়ে আন্দোলন চালাতে থাকে। জগন্নাথ কলেজ, কায়দে

---

৭৩. দৈনিক আজাদ, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

৭৪. মাহবুবউল্লাহ, ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতি, বিচিত্রা, ঈদসংখ্যা, ১৯৭৭

আযম কলেজ (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী কলেজ) এবং ইডেন কলেজে এদের মূল শক্তি নিয়োজিত ছিল।

তবে আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তন ঘটে ১০ অগাষ্ট (১৯৬২)। এদিন বিকালে ঢাকা কলেজ ক্যান্টিনে স্নাতক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় শ্রেণীর ছাত্ররা এক সমাবেশে মিলিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করে ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছাত্র ইউনিয়নের নেতা কাজী ফারুক আহমদ। সে তার বক্তৃতায় উপস্থিত ছাত্রদের একথা বুঝাতে সক্ষম হয় যে শিক্ষার আন্দোলন ও গণতন্ত্রের আন্দোলন এক সূত্রে গাঁথা। এই সভার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলির কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলনের কোনো যোগসূত্র ছিল না। কেন্দ্রীয় নেতারা মনে করতেন, শুধু মাত্র শিক্ষা সংক্রান্ত দাবী-দাওয়া নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা অসম্ভব। ঢাকা কলেজের ছাত্রনেতা নূরুল ইসলাম (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতির সভাপতি), সুলতান মাহমুদ খান, আবদুর রশিদ, আহসান আলী, শাহ সালাউদ্দিন প্রমুখ যখন কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করে তখন তা বড়ো একটা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়নি।[৭৫]

১০ অগাষ্টের এই সভায় ১৫ অগাষ্ট সারাদেশে ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । এবং দেশব্যাপী সকল ছাত্রসমাজের কাছে তা ব্যাপক সাড়া জাগায়। এরপর আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী হিসাবে ১০ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ের সামনে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৫ অগাষ্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বরের সময়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় বেশ কয়েকটি ছাত্রসভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল-কলেজের ব্যাপক ছাত্র-ছাত্রী এতে প্রতিনিয়ত অংশ গ্রহণ করে। ১০ সেপ্টেম্বরের পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ায় সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এক সভায় মিলিত হয়। এতে যোগদান করে ডাকসুর পক্ষে এনায়েতুর রহমান, জামাল আনোয়ার বাসু, ঢাকা কলেজ ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক কাজী ফারুক, জগন্নাথ কলেজ সংসদের সহ-সভাপতি আবদুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম, ইডেন কলেজ সংসদের সহ-সভানেত্রী মতিয়া চৌধুরী, নাজমা বেগম, কায়দে আযম কলেজ

৭৫. মাহবুবউল্লাহ, পূর্বোক্ত এবং সাক্ষাৎকার, নূরুল ইসলাম (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (১৯৬৯-৭০)

সংসদের সহ-সভাপতি নুরুল আরেফীন খান, তোলারাম কলেজ (নারায়ণগঞ্জ) সংসদের সাধারন সম্পাদক আবদুল আজিজ বাগমার প্রমুখ।

কাজী ফারুক (ছাত্র ইউনিয়ন) ও আবদুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম (ছাত্রলীগ) যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন ইস্ট পাকিস্তান ষ্টুডেণ্টস ফোরামের। দুই সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক হওয়ায় একটা নীতিগত দ্বন্দ্বও চলছিল আন্দোলনের মূল ধারায়। ছাত্রলীগ প্রভাবিত অংশ চাচ্ছিল শুধুমাত্র তিন বছর ডিগ্রী কোর্স বাতিলের মধ্যেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকুক। ছাত্র ইউনিয়ন প্রভাবিত অংশ একটা ব্যাপক আন্দোলনের পটভূমিকা হিসাবে একে দাঁড় করাতে চেয়েছিল। আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু এতোদিন ছিল স্কুল-কলেজগুলি। এখন তা চলে আসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের দোর-গোড়ায়। ডিগ্রী ষ্টুডেণ্টস ফোরাম থেকে ইস্ট পাকিস্তান ষ্টুডেণ্টস ফোরাম হয়ে সংগঠন রূপ নিল সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় বিরাট ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা করছিলো ছাত্রলীগ নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং ছাত্র ইউনিয়ন নেতা কাজী জাফর আহমদ। দুই অনলবর্ষী তুখোর বক্তার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মোহিত হয়ে হ্যামিলনের বংশীবাদকের আহ্বানের ন্যায় প্রায় পঁচিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়ে। এই সময় সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে চলছিল অবিরাম ধর্মঘট। নয়-দশ বছরের স্কুল বালক-বালিকারাও আস্তে আস্তে মিছিলে সামিল হতে থাকে। ১৫ অগাষ্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এটা একটা নিত্য-দিনের দৃশ্য হয়ে দেখা দেয়।

শেষ পর্যন্ত ১০ সেপ্টেম্বরের সচিবালয়ের অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারী করে এদিন এক প্রেসনোটে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘট থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। অন্যথায় পরিস্থিতি মারাত্মক হবে বলে হুমকি প্রদান করে।

১০ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচী প্রত্যাহার করা হলেও ছাত্ররা ১৭ সেপ্টেম্বর হরতালের ডাক দেয়। এবং এর পক্ষে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে থাকে। পথসভা, খণ্ডমিছিল সহ ব্যবসায়ী সমিতি, কর্মচারী সমিতি, রিকশা ইউনিয়ন,, শ্রমিক ইউনিয়নগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।

এর মধ্যে ১০ সেপ্টেম্বর শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মুক্তি পেয়ে ১৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা আসেন। হরতালের পূর্ব দিন তাঁর ঢাকা আগমনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন উভয় সংগঠনের পক্ষ থেকে বিমান বন্দরে সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁকে নিয়ে শহরে ফেরার পথে হরতালের পক্ষে এবং কোনো রকম আপোষের বিরুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়ন থেকে শ্লোগান দেওয়া হয়। এই সময় গুজব রটেছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক ছাত্র অসন্তোষ ও বিরাজমান আন্দোলনের পরিস্থিতিতে মধ্যস্থতা করার জন্য সরকারই শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে ঢাকায় পাঠিয়েছে।

গুজব পরে সত্যি হয়ে উঠেছিল। কারণ শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছাত্রলীগের নেতা-দের এব্যাপারে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, পরিস্থিতি ক্রমাগত এভাবে চললে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ছাত্র ইউনিয়নের হাতে চলে যাবে এবং পরিশেষে এ থেকে লাভবান হবে কমিউনিস্টরাই।[৭৬]

ফলে ছাত্রলীগে আন্দোলনের প্রশ্নে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং নেতৃবৃন্দ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সময় ছিলনা। দেরী করে হলেও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ ১৬ সেপ্টেম্বরের রাতে নির্ধারিত ডাকসু অফিসে আয়োজিত যৌথ সভায় যোগদান করে। কিন্তু উভয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে তাদের নেতার প্রতি কটাক্ষ করায় ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নকে অভিযুক্ত করে।

এরপরও বৃহত্তর স্বার্থে সভা চলে এবং আগামীকালের হরতালের কর্মসূচী চূড়ান্ত করা হয়। একই সঙ্গে নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। পরদিন ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ছাত্রসভার স্থান নির্দিষ্ট করা হয়।

পরদিন ১৭ সেপ্টেম্বর খুব ভোর থেকেই ছাত্ররা রাস্তায় রাস্তায় পিকেটিং শুরু করে। পিকেটিং-এর আওতায় পড়ে কার্জন হলের সামনে মোনায়েম মন্ত্রীসভার সদস্য হাসান আসকারীর মার্সিডিজ গাড়ী ভস্মিভূত হয়। একই সঙ্গে জ্বলতে থাকে দু'তিনটি পুলিশের জীপও। রাস্তায় বিক্ষোভকারী মানুষে টই-টুম্বুর হয়ে যায়। সার্জেণ্ট হাফিজের নেতৃত্বে একদল পুলিশ নবাবপুর রেলক্রসিং থেকে সদরঘাট পর্যন্ত বিক্ষোভকারী ছাত্র-জনতাকে ধাওয়া ও গ্রেফতার করে চলছিল। সকাল ৯টা না বাজতেই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা লোকে-লোকারণ্য হয়ে যায়। শৃঙ্খলা রক্ষা করা একটা বড় সমস্যা হয়ে ওঠে। সভা করার কোনো পরিবেশ

৭৬. সাক্ষাৎকার, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সিরাজুল আলম খান এবং মাহবুবউল্লাহ, পূর্বোক্ত

ছিলনা। এমন সময় খবর আসে নবাবপুরে গুলি হয়েছে এবং কয়েকজন তাতে শহীদও হয়েছে। তৎক্ষণাৎ সমস্ত জমায়েতে এক অগ্নিশিখার ঢেউ বয়ে যায়। মিছিল শুরু হওয়ার কথা ছিল ১০টায়। কিন্তু এই সময়েই মিছিল বের করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কাজী জাফর আহমদ কোনো রকমভাবে সংক্ষেপে একটা বক্তৃতা করেন।

এরপর বের হয় জঙ্গী মিছিল। এতে নেতৃত্ব দেন সিরাজুল আলম খান, মহিউদ্দিন আহমদ, হায়দার আকবর খান রণো, রাশেদ খান মেনন, আইয়ুব রেজা চৌধুরী, রেজা আলী প্রমুখ। মিছিল যখন হাইকোর্ট পাড় হয়ে আবদুল গণি রোডে প্রবেশ করছিল তখন মিছিলের পেছনে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। নিহত হয় বাবুল এবং গোলাম মোস্তফা (ই, পি, আর, টি, সি, সরকারী বাসের মেহনতী কণ্টাকটর)। একই সঙ্গে আহত হয় ওয়াজিউল্লাহ (গৃহভৃত্য)। সে হাসপাতালে পরের দিন ইন্তেকাল করে। আহত হয় এছাড়া অনেকে। সিরাজুল আলম খান অন্যান্য ছাত্রকর্মীদের নিয়ে আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। অন্যান্যদের সঙ্গে গ্রেফতার হয় ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী কিন্তু সকল সংগঠনের প্রিয়মুখ আবদুল হালিম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র আবদুল হামিদ।

এসব ঘটনা বিক্ষোভকারীদের আরো জঙ্গী করে তোলে। এবং মিছিল এগিয়েই যেতে থাকে। রথখোলার সামনে মিছিল পৌঁছলে দেখা যায় কয়েক হাজার পুলিশ ঐ মিছিলের উপর ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে। ব্যারিকেডের অপর পাশে জগন্নাথ কলেজের দিক থেকে আসা অপর একটি বিরাটকায় মিছিল। দু'টি মিছিল যাতে মিলতে না পারে সেই জন্য এই ব্যবস্থা। ব্যারিকেড ভাঙ্গার জন্য এক পর্যায়ে চললো ইষ্টক বৃষ্টি। সামান্য হটে যেতে বাধ্য হয় সেনাবাহিনী ও পুলিশ। পরে এলোপাতাড়ী গুলি ও টিয়ার গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে বিক্ষোভকারীরা হটে যেতে বাধ্য হয়। আহত হয় অসংখ্য। প্রায় ২৫০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ দিনের বিক্ষোভ মিছিলে মেহনতী মানুষের অংশ গ্রহণ ছিল শতকরা ৯৫ জন। দেখা গেছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুড়ীগঙ্গার ওপার থেকে পর্যন্ত নৌকার মাঝিরা বৈঠা হাতে মিছিল নিয়ে চলে এসেছে।[৭৭]

---

৭৭. সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, রাশেদ খান মেনন, সাইফুদ্দিন মানিক এবং পাকিস্তান অবজারভার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

সারা বিশ্ববিদ্যালয় এই সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘেরাও করে ফেলে। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ পরবর্তী কর্মপন্থা নিয়ে একটি ছোট সভায় দ্রুত মিলিত হয়। কিন্তু একে অপরকে দায়িত্বহীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে থাকে। বিশেষ করে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়া ও গুলি বর্ষণের জন্য এককভাবে ছাত্র ইউনিয়নকে দায়ী করা হয়।

এমন উত্তেজনা মুহূর্তে নেতৃবৃন্দ কোনো ঐক্যমতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সর্বশেষ পরিস্থিতি অবলোকন করতে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজের মধ্যবর্তী রেলিং টপকিয়ে নেতৃবৃন্দ হাসপাতালে আসে। সেখানে ছিল এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। আহত আর নিহতদের রক্তে সমস্ত মেঝে ভেসে যাচ্ছিল। শহীদদের আত্মীয়-স্বজনরা দাফনের জন্য লাশ নিতে চাইলে সেনাবাহিনী বাধা দেয় এবং লাশ গায়েব করার চেষ্টা করতে থাকলে উপস্থিত বিক্ষুব্ধ জনতার বাধা পায়। লাশ মর্গ থেকে সরিয়ে ছাত্ররা পাহাড়ার ব্যবস্থা করে।

যশোরে এদিন কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ৪৩ জন আহত হয়। এরমধ্যে ৪১ জনই ছিল পুলিশ। চট্টগ্রামে অবনতিকর পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। প্রায় ২৭ জন ছাত্রসহ মোট ১০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। (পাকিস্তান অবজারভার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২)।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকে সারা প্রদেশে ৩ দিন ব্যাপী শোকের প্রস্তুতিতে পরদিন ১৮ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় সলিমুল্লাহ হলে আয়োজিত গায়েবানা জানাযায় অংশ নেন বেলুচিস্তানের প্রগতিশীল নেতা খায়ের বক্স মারী এবং গাউস বক্স বেজোঞ্জো। মোনাজাতের পর দু'জন দু'জন করে পাঁচ হাতের ব্যবধানে লাইন করে এক বিরাট শোক মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। পুলিশ বা ই, পি. আর মিছিলে বাধা প্রদান করে নি।

২৩ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম সরকার হাটের স্কুল ছাত্ররা একই কর্মসূচী নিয়ে যখন ধর্মঘট ও মিছিল করে, তখন পুলিশের গুলিতে একজন স্কুল ছাত্র নিহত হয়। কিন্তু ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন একতা ভেঙ্গে পড়ায় বিশেষ কিছু করাই সম্ভব হয়না।

২৪ সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে এক ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অবিলম্বে দাবী মেনে নেওয়ার জন্য সরকারকে 'চরমপত্র' দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আপাততঃ আন্দোলনকে স্থগিত ঘোষণা করা হয়।[৭৮]

শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর গোলাম ফারুকের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। তাঁরই পরামর্শে ছাত্র অভ্যুত্থানের তৃতীয় দিনের মধ্যে সরকার শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে এক উদ্ভট সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১৯৬৩ সালের জন্য যে সকল ছাত্র স্নাতক পরীক্ষায় ফরম পূর্ণ করেছিলো, পরীক্ষা না নিয়েই তাদের সকলকে পাশ করিয়ে দিয়ে ডিগ্রী প্রদান করার কথা ঘোষণা করা হয়।[৭৯]

এভাবে আংশিক বিজয়ের মাধ্যমে ৬২-র ছাত্র আন্দোলন আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ আন্দোলন ছাত্র সমাজ ও ছাত্র সংগঠন সমূহের জন্য অভিজ্ঞতার দ্বার খুলে দেয়। শুধু মাত্র শিক্ষা-বিষয়ক ব্যাপার নিয়ে ব্যাপক ও বিশাল ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে তা ছিল ছাত্র নেতৃবৃন্দের জন্য একটি বিরাট শিক্ষা।

৫২-র ভাষা আন্দোলন এ দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজের জন্ম দেয়। ৬২-র ছাত্র আন্দোলনে এ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে জাতীয় চেতনার সঙ্গে প্রগতি-শীলতার স্ফুরণ ঘটায়। অন্দোলনের সময়ে ছাত্রদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতো নানা ধরণের কথকথা। কি করে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারীর পরে কারা-গারের নির্জন প্রকোষ্ঠে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হাসান নাসিরকে হত্যা করা হয়েছে, বেলুচিস্তানের মেহনতী মানুষের উপর সামরিক অফিসারদের নির্মম নিপীড়ণ ও বলৎকারের কথা, ময়মনসিংহের প্রাক্তন ছাত্রনেতা

---

৭৮. সাক্ষাৎকার, পঙ্কজ ভট্টচার্য এবং মাহবুবউল্লাহ, পূর্বোক্ত

৭৯. অনেকে মনে করেন, এই উদ্ভট সিদ্ধান্তটি সরকার ছাত্রদের উৎকোচ প্রদানের উদ্দেশ্যে অথবা ছাত্র আন্দোলনকে হেয় করার জন্যই নিয়েছিলেন। অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে এই সময়ের ফলভোগকারী একজন ছাত্র আমাকে বলেছেন, "একদিন হলে তিনি দেরী করেই ফিরেছেন, হঠাৎ তাকিয়ে দেখেন, রুমে রুমে ডিগ্রী পরীক্ষার্থী ছাত্ররা গলায় (টাই) বাধছে। সকল পরীক্ষার্থীকে এমন করতে দেখে তিনি জানতে পেরে আশ্চর্য হয়ে যান যে, ইতোমধ্যে পরীক্ষা না দিয়েই আজকের দুপুরেই এক সরকারী ঘোষণায় তিনিও গ্রাজুয়েট হয়ে গিয়েছেন।

কাজী আবদুল বারীকে মিছিল করার অপরাধে বেত্রদণ্ডের মাধ্যমে বধির করে ফেলা, কৃষক নেতা মণি সিংহ ও নগেন সরকারের দীর্ঘ কারাজীবনের কাহিনী তখন ছাত্র জনতার মুখে মুখে।

সমগ্র দেশে ৬২-র আন্দোলন তাই অসামান্য স্পর্শী প্রাণের জোয়ার বয়ে আনে। যদিও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব ও আপোষকামীতার জন্য এই আন্দোলন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গণ্ডি অতিক্রম করে কৃষক ও শ্রমিকের মৈত্রী জোট গঠনে সক্ষম হয়নি, তথাপি তা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের জন্য এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার সূচনা করে।

এই সময়টা এভাবেই শিক্ষা ইস্যুকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের বৃহত্তর আন্দোলন ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে। তবে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক পড়াশুনায়রত ছাত্ররা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন দাবী আদায়ের আন্দোলন তবু চালিয়ে যাচ্ছিল। ঢাকা পলেটেকনিক ইনিষ্টিউট, তেজগাঁও কৃষি কলেজ এবং টেক্সটাইল ইনষ্টিউটের ছাত্ররা এই আন্দোলনের সূত্রপাত করে। আন্দোলনের তোড় অত্যন্ত জোড়ে প্রবাহিত হলে সরকার এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি ঘোষণা করেন।

সব মিলিয়ে এ বছর মাত্র ২৭ দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্লাশ হয়।[৮০]

মোনায়েম খানকে কাল পতাকা

৬২ সালের ২৮ অক্টোবর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী আবদুল মোনায়েম খান আইয়ুব খানের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহচর হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। (সামরিক আইন জারীর পর থেকে লেঃ জেঃ আজম খান পূর্ব পাকিস্তানে গভর্ণর হিসাবে কাজ করছিলেন। তিনি ঢাকার শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আইয়ুব খানের সঙ্গে মত বিরোধ ঘটলে ৬২-র এপ্রিল মাসে গোলাম ফারুক নতুন গভর্ণর হিসাবে নিযুক্ত হন। ছয় মাস পরেই মোনায়েম খান দায়িত্ব লাভ করেন)।

এই সময় ঢাকা কলেজের শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধন করতে গেলে গভর্ণর মোনায়েম খানকে ছাত্ররা কাল পতাকা প্রদর্শন করে।[৮১]

---

৮০. আইয়ুব খান, প্রভু নয় বন্ধু, পৃষ্ঠা-১৩০
৮১. আজাদ, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৬২

ছাত্র ও বাঙালী সামরিক অফিসারদের গোপন বৈঠক

আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কয়েকজন বাঙালী অফিসার ছাত্রনেতাদের সঙ্গে একটি গোপন সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মাজেদ খানের মধ্যস্থতায় তাঁরই বাসায় এই গোপন বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ছাত্রদের পক্ষ থেকে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এই আলোচনায় যোগদান করেন। সেনাবাহিনী থেকে এসেছিলেন বেলুচ রেজিমেণ্টের তরুণ অফিসার ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে U.O.T.C. ক্যাডেটদের দায়িত্ব পালন করতেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে মিলিটারী কায়দায় তিনি বলেন, "তোমাদের আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করা হয়, তাহলে আমরা বাঙালী অফিসারেরা রাইফেল তোমাদের পক্ষ হয়ে ওদের দিকে ঘুরিয়ে দেবো। কিন্তু তোমরা কি সেজন্য মানসিকভাবে ও সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত আছো"।[৮২]

স্বাভাবিকভাবেই সামরিক অফিসারের এই তেজোদীপ্ত বক্তব্য তার চেয়েও তেজী ছাত্রনেতাদের হতচকিত করে দিয়েছিল। এর উত্তর দেওয়ার জন্য তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

ন্যাশনাল ছাত্র ফেডারেশন (এন. এস. এফ)-এর জন্ম

মোনায়েম খান গভর্ণর হয়েই পরিচিত এবং বিশ্বস্ত ডঃ ওসমান গণিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেন (গর্ভণর সে সময় পদাধিকার বলে আচার্য ছিলেন)। একই সঙ্গে আইয়ুব ও সামরিক শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনের জন্য ছাত্রদের মধ্যে তিনি একটি পেশাদার বাহিনী গঠন করেন। নাম দেন 'ন্যাশনাল ছাত্র ফেডারেশন'। এভাবে তিনি এন, এস, এফ-কে নতুন করে পুনর্গঠন করেন। এই বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের প্রথম জনক। ৬৩ সাল থেকে এদের পালিত গুন্ডা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু ছাত্রদের ওপরই নয়, শিক্ষক কর্মচারীদের উপরেও ক্রমাগত এক বর্বর সন্ত্রাস কায়েম করে। এরা পরবর্তী কালে এন, এস, এফ নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে।

বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়ন

১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে পার্টি সভ্যদের গোপন সমাবেশে সাধারণ সম্পাদক যে রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করেন তাতে

৮২. কাজী জাফর আহমদ, পূর্বোক্ত

বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের এক দীর্ঘ প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রতি-বেদনে প্রথমে বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের প্রথম পর্ব সম্পর্কে বলা হয়:

"১৯৬১ সনের শেষের দিকে গণআন্দোলন গড়িয়া তোলার যে পরিকল্পনা আমরা করিয়াছিলাম, ১৯৬২ সনের প্রারম্ভে তাহা বাস্তবায়িত হইয়াছিল। ইতি-মধ্যে, নিম্নতম কর্মসূচী ও আন্দোলনের কর্মপন্থা নিয়া অন্য গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে আমাদের একটা সাধারণ সমঝোতা হইয়াছিল। ইহার ফলশ্রুতিতে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের ভিতর একটা একতা হইয়াছিল। ...এবং ১৯৬২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস হইতে ছাত্রদের আন্দোলন শুরু হইবে বলিয়াও স্থির হইয়াছিল।

কিন্তু শহীদ দিবসের পূর্বেই ১৯৬২ সনের ৩০শে জানুয়ারী করাচীতে সোহরাও-য়ার্দী সাহেবের গ্রেফতার উপলক্ষ করিয়া যে আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছিল। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের যুক্ত উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণ সোহরাওয়ার্দী ও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে ১লা ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট করিয়া সংগ্রাম শুরু করিয়াছিলেন। সামরিক শাসনের পর ইহাই ছিল পূর্ববঙ্গে প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রাম। ঢাকায় ছাত্রদের সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর বরিশাল এবং আরও কয়েকটি শহরে উহা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।...

...তিন বৎসরের সামরিক সন্ত্রাস ও জুলুমের ফলে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধ ও বিক্ষোভ এত চরমে পৌঁছায়াছিল যে, ঐদিন ঢাকা নগরীতে আইয়ুব খানের উপস্থিতির সময়েই ছাত্ররা আইয়ুব খানের ফটোকে জুতা ও ঝাটার মালায় সজ্জিত করিয়া উহা হাতে নিয়া ঢাকা নগরীর রাস্তা-সমূহ প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন দোকান হইতে আইয়ুব খানের ফটো-সমূহ সংগ্রহ করিয়া উহা দ্বারা রাজপথে বহ্নুৎসব করিয়াছিলেন।...

ঢাকা নগরীতে ছাত্রদের ঐ সংগ্রামের পর ছাত্র আন্দোলন সারা পূর্ব বঙ্গের প্রায় সমস্ত শহরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীর সঙ্গে সঙ্গে "সামরিক শাসন ও আইয়ুব শাহীর অবসান', 'গণতান্ত্রিক শাসন-তন্ত্র রচনা', পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও পূর্ব বঙ্গের স্বায়ত্বশাসন প্রভৃতি জাতীয় রাজ-নৈতিক দাবীগুলি ঐ আন্দোলনের মৌল আওয়াজ হইয়াছিল।...

কিন্তু সামরিক এক নায়কত্বের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক দাবী সমূহের জন্য এরূপ একটা গৌরবময় সংগ্রামের সময়েও বিভিন্ন বিরোধী দলের যেসব নেতা জেলের বাইরে ছিলেন তাঁহারা দীর্ঘকাল চুপ করিয়াছিলেন। আড়াই মাস যাবত আন্দোলন চলার পর তাঁহারা আন্দোলনের সমর্থনে একটা বিবৃতি (১৪ই এপ্রিল) দিয়া তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছিলেন।

যদিও ছাত্রদের এই বিরত্বপূর্ণ সংগ্রামে ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলির সাংগঠনিক শক্তির চাইতে ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ অনেক বেশী প্রবল ছিল, তথাপি উহার গুরুত্ব ছিল যে, সামরিক শাসনের পর পূর্ববঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল; ঐ আন্দোলন তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া গণআন্দোলনের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে এবং লণ্ডনে অবস্থানরত পাকিস্তানী ছাত্রদের ভিতরেও ঐ আন্দোলন সাড়া জাগাইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ ঐ আন্দোলনে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠিত হইলে এবং নেতৃত্বের দৃঢ়তা থাকিলে সামরিক শাসনের অধীনেও বিক্ষুব্ধ জনগণের আন্দোলন গড়িয়া তোলা সম্ভব।

তৃতীয় যেহেতু আন্দোলনের মৌল দাবী ছিল কতকগুলি জাতীয় রাজনৈতিক দাবী। সেইহেতু ঐ আন্দোলন প্রধানতঃ শহরগুলির ছাত্রদের ভিতর সীমিত থাকিলেও, রাজনৈতিক দিক দিয়া ঐ আন্দোলন একটা জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ গ্রহন করিয়াছিল। তাই, সাধারণ জনগণ ঐ সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।"

বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়:

"সামরিক সরকার প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষানীতি চালু করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা কমিশনের যে রিপোর্ট কার্যকরী করিতে চেষ্টা করিতেছিল, ঐ সংগ্রাম ছিল উহারই প্রতিবাদে। জুলাই মাস হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলন শুরু হওয়ার পর ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ সম্মিলিতভাবে দাবী করিয়াছিল যে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করিতে হইবে। এই দাবীতে আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য তাহারা সমস্ত ছাত্র সমাজের নিকট আহ্বান জানাইয়াছিল। পূর্ববঙ্গের গোটা ছাত্র সমাজ ইহাতে সাড়া দিয়াছিল এবং এই আন্দোলন ঢাকা নগরী হইতে সুদূর গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ছাত্র সমাজের এক ঐক্যবদ্ধ ব্যাপকতম গণ-

সংগ্রামের রূপ ধারণ করিয়াছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন শহরেও এই আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছিল।

১৯৬২ সনের ফেব্রুয়ারীর ছাত্র আন্দোলনের দাবীগুলি ছিল মূলতঃ রাজনৈতিক। কাজেই, সে আন্দোলনে অংশ গ্রহন করিয়াছিল সাধারণতঃ ছাত্র সমাজের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর অংশ। পক্ষান্তরে, সেপ্টেম্বরের আন্দোলন ছিল ছাত্রদের নিজস্ব শিক্ষাগত দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে। তাই এই আন্দোলনে সাধারণ ছাত্ররাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগাইয়া আসিয়াছিলেন, ছাত্রীদের ব্যাপক অংশও ইহাতে অংশ গ্রহন করিয়াছিলেন এবং অভিভাবকরাও ইহার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। ফলে, এই আন্দোলন ফেব্রুয়ারী আন্দোলন হইতে অনেক ব্যাপক হইয়াছিল।[৮৩]

'শিখা'র ভিন্ন মূল্যায়ন

বেআইনী ঘোষিত পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির গোপন মুখপত্র 'শিখা' বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের একটি ভিন্ন মূল্যায়ণ করে। 'শিখা' বিশেষ করে যে কারণে আন্দোলনের বিপুল সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল তার ওপর ব্যাপক ও সরাসরি মন্তব্য করে। 'শিখা' উল্লেখ করে, "বাস্তব ভিত্তি না থাকিলে যেমন কোন আন্দোলন গড়া যায় না, তেমনি শুধু বাস্তব ভিত্তি থাকিলেই গণ-আন্দোলন সংগঠিত হয় না ...আন্দোলন গড়িয়া তোলার একটি অপরিহার্য্য শর্ত হইল সচেতন ও সক্রিয় নেতৃত্ব।... ১৯৬২ সনেও ছাত্র সমাজের অগ্রণী অংশ আন্দোলনে উদ্যোগী হইলে ছাত্র সমাজ তাঁহাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়ায় এবং বিরাট ছাত্র সংগ্রাম গড়িয়া উঠে।...

...দেখা যায় যে, বিভিন্ন দলের নেতারা যখন ঐক্যবদ্ধ হইয়া জন-জমায়েত ও প্রচার আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন গণবিরোধী সরকারের দমননীতি সত্বেও আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ নেতারা আরও অগ্রসর হয় নাই।

তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যকলাপ প্রমাণ করে যে, তাঁহারা আপোষমুখী, সংস্কারবাদী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। গণশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া উপর তলার ষড়যন্ত্র ও বিদেশী শক্তির উপর নির্ভর করাই তাঁহাদের চরিত্র। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, কিছুটা জন-জমায়েত অনুষ্ঠান করিয়া তাহার জোরে তাঁহারা আয়ুব খাঁকে

৮৩. পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে গৃহীত কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট, পৃষ্ঠা, ৫৩-৬০

একটা আপোষে সম্মত করাইতে পারিবেন। কিন্তু ইহা যখন সম্ভব হইল না তখন তাঁহারা অনেকটা হতাশ হইয়া যান এবং ক্রমে ক্রমে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়েন। নেতাদের এই নিষ্ক্রিয়তা গণ-আন্দোলনে ভাটা পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ। জনগণও এই নেতাদের উপর আস্থা রাখিতে পারিতেছেন না।...

...আওয়ামী লীগের কোন কোন নেতা এরূপ হামবড়া ও সঙ্কীর্ণ মনোভাব পোষণ করেন যে, আওয়ামী লীগ যথেষ্ট শক্তিশালী, সে একাই আয়ুবশাহীর মোকাবিলা করিতে পারে। কাজেই, অন্যান্যদের সহিত ঐক্যের প্রয়োজন নাই। ন্যাপের কোন কোন নেতা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঐক্য গঠনকে গুরুত্ব না দিয়া বলিতেছেন যে, এন,ডি, এফ নেতারা 'সুবিধাবাদী'। কাজেই তাহাদের সহিত ঐক্য গঠন করা যায় না।

এইভাবে বিভিন্ন দলের নেতারা বিভিন্ন যুক্তিতে ঐক্য বিরোধী পথ নিয়াছেন। নেতাদের ব্যক্তিগত রেষারেষিও ঐক্যের পথ ব্যাহত করিতেছে।

বস্তুত: আন্দোলন গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে নেতাদের নিষ্ক্রিয়তা এবং তাঁহাদের ঐক্য-বিরোধী মনোভাবের দরুণ আজ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। ছাত্র সমাজ তীব্র দমননীতি অগ্রাহ্য করিয়া এবং বহু স্বার্থত্যাগ করিয়া ১৯৬২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে যে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের দুর্বলতার জন্য সে আন্দোলনে আজ ভাটা আসিয়াছে।...

...গণ-সংগ্রামের ধরণ ও রূপ সম্পর্কেও আজ নানারূপ প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। যাঁহারা শুধু মুখে মুখে "সশস্ত্র সংগ্রামের রক্তাক্ত বিপ্লব" প্রভৃতির কথা বলেন তাঁহাদের কথা বাদ দিলেও অনেক নিষ্ঠাবান কর্মীর মনেও আজ স্বৈরাচারী সরকারের তীব্র দমননীতি ও বৈধ কাজের সুযোগ সংকুচিত হওয়ার ফলে গণ-সংগ্রামের ধরণ ও রূপ সম্পর্কে নানারূপ চিন্তার উদ্রেক হইতেছে। স্বৈরাচারের অবসানের জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমাদের দেশে পরিণামে কি রূপ পরিগ্রহন করিবে উহা শান্তিপূর্ণ পথে কিংবা অ-শান্তিপূর্ণ পথে অগ্রসর হইবে তাহা সরকারী নীতি ও কর্মপন্থার উপর নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক মহল শান্তিপূর্ণ পথে অগ্রসর হইতে চায়। কিন্তু, স্বৈরাচারী সরকার যদি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বল প্রয়োগের পথই অবলম্বন করে, এবং অন্য সব পথ রুদ্ধ করে, তখন পরিণামে

গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেও দেশ ও জনতার স্বার্থে অস্ত্র নিতে হইবে। সেখানে কোনও দ্বিধা নাই।...

তবে, এগুলি হইল ভবিষ্যত কর্মপন্থার কথা, স্বৈরাচার অবসানের জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে গণবিরোধী সরকারের হিংস্র বল প্রয়োগের বিরুদ্ধে যদি অস্ত্র ধারণ করিতেই হয়, তবে জনগণকেই অগ্রসর হইয়া সে অস্ত্র ধারণ করিতে হবে। কিন্তু আজ নিপীড়িত জনগণের চেতনা ও আন্দোলনের যে অবস্থা তাহাতে এখন তাহাদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করার কথা চিন্তা করাও যায় না। এই জনগণকে রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করিতে না পারিলে অস্ত্র ধারণ করার লোকই পাওয়া যাইবে না।...

মূল কথা হইল, নিপীড়িত জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করা ও সংঘবদ্ধ করা। এই কাজই পিছনে রহিয়া গিয়াছে। এখানেই আগে হাত দেওয়া দরকার। এবং বর্তমান অবস্থাতে এখানে বৈধ আন্দোলনের সুযোগ নিতে হইবে। 'সশস্ত্র বিপ্লব' বা 'রক্তাক্ত সংগ্রামের' কথা বলিয়া এখন শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ার জন্য বৈধ কাজের সুযোগ ব্যবহার না করিলে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রসরই হওয়া যাইবে না—'সশস্ত্র সংগ্রাম' ত দূরের কথা।"৮৪

ডাকসু : ১৯৬৩

বাষট্টির ঝিমিয়ে পড়া ছাত্র আন্দোলন ৬৩-তে প্রাণ চাঞ্চল্য এনে দেয় ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনে ভিন্ন রীতি প্রচলিত ছিল। হল সংসদ নির্বাচনে পরিচিতি সভায় সংগঠনের নেতারা বিভিন্ন মঞ্চ থেকে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিতেন। এ রীতিকে বলা হতো 'প্লাটফর্ম প্রচার'। সাধারণত কেন্দ্রীয় নেতারা বাঙলাতেই বক্তব্য রাখতেন। কিন্তু হল সংসদের নেতা ও নির্বাচন প্রার্থীকে ইংরেজীতেই বক্তৃতা দিতে হতো।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি সকল কিছুর উপরই তাদের ব্যুৎপত্তি দেখাতে হতো। যে প্রার্থী ইংরেজীতে এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল করতো সে-ই উচ্চ মেধা এবং প্রিয় প্রার্থী হিসাবে আলোচিত হতো।

১৯৬৩ সালে ডাকসু নির্বাচনে কোনো কোনো ছাত্রাবাসে এন, এস, এফ-এর বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ-ছাত্রইউনিয়ন যৌথ প্যানেলে অংশ গ্রহন করে। তবে, কেন্দ্রীয়

৮৪. আবদুল কাদির (খোকা রায়—লেখক), গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যা, শিখা, (রাজনৈতিক সাময়িকী), ষষ্টবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন, ১৯৬৪, মূল্য একটাকা, পৃষ্ঠা, ২৮-৩৯

সংসদ ডাকসুতে ছাত্র ইউনিয়ন মনোনীত রাশেদ খান মেনন ও মতিয়া চৌধুরী জয়লাভ করে। বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বের ভূমিকা তাদের এই ফলাফলে সহায়তা করে। সর্বমোট ৯৩টি আসনের মধ্যে ছাত্রইউনিয়ন একাই এ বছর লাভ করে ৮০টি আসন।

ছাত্রাবাস থেকে জিন্নাহর ছবি অপসারণ

৬৩ সালের এপ্রিলের প্রথম দিকে সলিমুল্লাহ হলে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এ হল প্রথম থেকেই বামপন্থী ছাত্রদের প্রাধান্য বলে স্বীকৃত ছিল। হলের প্রগতিশীল ছাত্ররা একদিন 'জাতির পিতা' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি হল সংসদ ও কার্যালয় থেকে অপসারণ করে।

এর প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য এন, এস, এফ-এর বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক জঘণ্য সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ধরে ধরে তারা প্রগতিশীল ছাত্র-কর্মীদের আক্রমণ করে এবং ত্রাস সৃষ্টি করে।

এ সময় কায়দে আযম কলেজে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী কলেজ) এক মর্মান্তিক ছাত্র সংঘর্ষ হয়। কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন।[৮৫]

কিছুদিন পর এমনি অনাহূত ছাত্র সংঘর্ষ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানেও ছড়িয়ে পরে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র সংঘর্ষের ফলে অনেকদিন বন্ধ থাকে।[৮৬]

ছাত্রলীগে আবার আদর্শিক দ্বন্দ্ব

ছাত্র ইউনিয়ন জন্মের পূর্বে আর কোনো সংগঠন না থাকায় সমাজতন্ত্র মনোভাবাপন্ন ছাত্ররাও সাধারণত ছাত্রলীগেই কাজ করতো। ছাত্র ইউনিয়ন আসার পর এ ব্যাপারে সাধারণের মাঝে স্পষ্টতই দুটি ধারা কাজ করতো---গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক। কিন্তু এতো সবের পরেও ছাত্রলীগে যুগে যুগে সমাজতন্ত্র ও প্রগতিশীল নীতিসমূহের ব্যাপারে আদর্শের সংঘাত হয়েছে।

বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রভাবে ছাত্রলীগকে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রগতিশীল নীতি সমূহের প্রশ্নে বারবার আপোষই করতে হয়,

---

৮৫. আজাদ, ২৮ এপ্রিল, ১৯৬৩
৮৬. ঐ, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৩

কখনো কখনো এসব প্রচার প্রপাগণ্ডার বাহনও হতে হয় ছাত্রলীগকে। কিন্তু এরপরও ছাত্রলীগে আন্তঃমতাদর্শগত সংগ্রাম নিয়তই ক্রিয়াশীল ছিল।

১৯৬৩ সালের সম্মেলনে তা আবার ধরা পড়ে। পাকিস্তান ময়দানে এবারের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংগঠনে এই সময় ভিন্নমতাবলম্বী বলে পরিচিত ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কর্মসূচীর একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু সম্মেলনে এই প্রস্তাব নিয়ে তীব্র মতানৈক্য সৃষ্টি হয়।[৮৭]

এই সময় ছাত্রলীগের কমিটি গঠনেও দ্বন্দ্ব বাধে। একদল সিরাজুল আলম খানকে সাধারণ সম্পাদক চায়, অন্যদল ফেরদৌস আহমদ কোরেশীকে। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, সিরাজুল আলম খানের সমর্থক ছিলেন। ফলে বিদায়ী সভাপতি হিসাবে তিনি ফেরদৌস আহমদ কোরেশীর খসড়া ঘোষণাপত্র (যাতে সমাজতন্ত্রের কথা ছিল) সম্মেলনে পড়তে অনুমতিই দেননি।

পুর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রথম ঘোষণাপত্র

৫৮ সালের সামারিক আইন জারীর পর বিভিন্ন সংগঠন দেশব্যাপী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেন্দ্রের সমন্বয় ছাড়াই জেলায় জেলায় সংগঠনগুলি কিছুটা সংগঠিত হওয়া শুরু করে দিয়েছিল।

এই সময় ছাত্রলীগের চট্টগ্রামের কর্মীরা নিজেদের সংগঠিত করার জন্য জেলা সম্মেলনের আয়োজন করে। কেন্দ্রীয় কমিটির তখন পর্যন্ত কোনো মুদ্রিত আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী ছিল না। চট্টগ্রামের সম্মেলনেই প্রথম চার পৃষ্ঠার একটি ঘোষণাপত্র (ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী কর্তৃক প্রণীত) অনুমোদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এটাই ছাত্রলীগের 'Founding literature' হিসাবে পরিচিত।

এই ঘোষণাপত্রটিই খসড়া হিসাবে ১৯৬২ সালের জুন সম্মেলনে কেন্দ্রে গৃহীত হয়। কিন্তু গোল বেধেছিল ১৯৬৩ সালের সম্মেলনে ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, এনায়েতুর রহমান ও জিয়াউল হক কমিটি প্রণীত সংশোধিত ঘোষণাপত্রের খসড়া নিয়ে। 'সমাজতন্ত্র' শব্দ থাকায় সম্মেলনে যেহেতু তা তুলতেই দেওয়া হল না, সেহেতু সম্মেলনের পরে ৬৩ সালের শেষের দিকে কে, এম, ওবায়দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় তা ১২-১৭ ভোটে

৮৭. সাক্ষাৎকার, আবদুর রাজ্জাক, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী

গৃহীত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের এটাই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ঘোষণাপত্র। দলের আদর্শের ভিত্তি এখান থেকেই।[৮৮]

পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও

আইয়ুব বিরোধী মনোভাব যখন দেশবাসীর মনে তুঙ্গে তখন সরকার পরিচালিত এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সমগ্র জনমানস বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঘটনা শুরু কাশ্মীরের হরতালকে কেন্দ্র করে। প্রথমে হিন্দু-মুসলমান, পরে বাঙালী-বিহারীতে তা রূপান্তরিত হয়। ১৯৬৪ সালের ৭ জানুয়ারী থেকে ঢাকা, আদমজী এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে পেশাদার গুণ্ডাবাহিনীর নেতৃত্বে এক বিভৎস বাঙালী-বিহারী দাঙ্গায় শত শত মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১০ জানুয়ারী তা প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। ১৫ জানুয়ারী দাঙ্গা বিধ্বস্ত হিন্দু সম্প্রদায়কে বাঁচাতে গিয়ে নবাবপুর রেলক্রসিং-এর সামনে নিহত হন কবি আমির হোসেন চৌধুরী (তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরামের চেয়ারম্যান)। ১৬ জানুয়ারী বিহারীদের আক্রমণে জীবন দান করেন নটেরডাম কলেজের অধ্যাপক ফোদার নোভার্ক। তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। মোহাম্মদপুরে অবস্থানরত বিহারীরা ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের ছাত্রী-আবাসে হামলা চালিয়ে মেয়েদের শ্লীলতা হানি করে। সমগ্র পরিস্থিতি এভাবে ভয়াবহ এবং নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। জাতির এমনি দুর্যোগ মুহূর্তে ছাত্র সংগঠনগুলি ছিল দ্বিধাগ্রস্থ এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়। গণতান্ত্রিক ছাত্র

---

৮৮. এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী বলেছেন, সংগঠনের সম্মেলনে শাহ মোয়াজ্জেম 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি নিয়ে যে আপত্তি তুলেছিলেন, তার পেছনে অন্য ক্ষুদ্র কারণ ছিল। তা হলো, শেখ ফজলুল হক মণি চাচ্ছিলেন, এই সম্মেলনে আমিই সাধারণ সম্পাদক হই। কিন্তু শাহ মোয়াজ্জেম চাচ্ছিলেন সিরাজুল আলম খানকে। ফলে সংগঠনে এই নেতৃত্বের প্রশ্নে এসেই বিরোধ বেধে উঠেছিল। আমি নিজে থেকে উদ্যোগ নিয়ে নিজের নাম এবারের মতো প্রত্যাহার করে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাই।

এ প্রসঙ্গে জনাব কোরেশী সাক্ষাৎকারে আমাকে আরো জানিয়েছেন, ষাটের দশকের প্রথমার্ধ থেকে ছাত্রলীগে সমাজতন্ত্রের আদর্শের একটি গোপন 'নিউক্লিয়াস' কাজ করত বলে অধুনা যে প্রচার করা হচ্ছে (জাসদের জন্মের ভ্রূণ বলে) তার প্রকাশ সত্য নয় এবং এমন প্রচার রাজনৈতিক অসততারই পরিচায়ক।

এ সময়ের ছাত্রলীগের অপর দুই নেতা জনাব আবদুর রাজ্জাক ও সিরাজুল আলম খানের মতে, 'ষাটের শুরুতে গোপন একটি পাঠচক্র ছিল যেখানে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের কথা চিন্তা করা হত'। পরবর্তীকালে এই চক্রের চেতনা ১৯৭১ সালে মুজিব বাহিনী এবং ১৯৭৩ সালে রক্ষী বাহিনী ও গণবাহিনীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

সংগঠন ছাত্রলীগ দিশেহারা অবস্থায় প্রায় কর্তব্যহীন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠন ছাত্র ইউনিয়নে দাঙ্গা প্রতিরোধের ধরণ নিয়ে তীব্র তাত্ত্বিক বিরোধে প্রায় কর্মহীন হয়ে যায়।

পরবর্তী সময়ে ছাত্র ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেলে যারা মতিয়াপন্থী বলে চিহ্নিত হয় তাদের বক্তব্য ছিল, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতা করার জন্য শান্তি মিছিল ইত্যাদি করা প্রয়োজন, কিন্তু কোনো ক্রমেই ভারতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে নিন্দা করা উচিৎ হবে না। কারণ তাতে এখানকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরো উস্কানি পেতে পারে। কিন্তু যারা মেননপন্থী বলে পরবর্তীকালে চিহ্নিত হয়, তারা দুটো কাজই এক সঙ্গে করতে চাইলে সংগঠনে দ্বন্দ্ব বাঁধে (এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন ছাত্র ইউনিয়নে আদর্শিক দ্বন্দ্ব অধ্যায়ে)।

তবু দাঙ্গা বিরোধী বক্তব্য ও কর্মসূচী গৃহীত হয়। ছাত্র সংগঠনসমূহ বুদ্ধিজীবীদের শান্তি মিছিল সংগঠনে এবং দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠনে অকৃপণ সাহায্য করে। শুধুই তাই নয়, দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় মানবতা রক্ষার কাজে ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশেষ করে এক্ষেত্রে ছাত্র ইউনিয়নের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও দৃঢ়তা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিব ও সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার অকৃপণ প্রশংসা লাভ করে। বলা চলে এই সাংগঠনিক তৎপরতা ও দৃঢ়তার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে "পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাঁড়াও' আন্দোলনের ভিত্তি।[৮৯]

দেশের এমনি ভয়াবহ অবস্থায় ঢাকায় আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সভাপতিত্বে এক সভায় মিলিত হয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন এবং একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন। ১৭ জানুয়ারী ইত্তেফাক, আজাদ ও সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে এই ইশতেহার প্রকাশিত হলে তা এক ঐতিহাসিক আবেদন হিসাবে পরিগণিত হয়। আবেদনটি প্রচারপত্র হিসাবে ছাপিয়েও বিলি করা হয়। ১৯৬৪-র ১০ এপ্রিল এই আবেদন ছাপানোর অপরাধে

৮৯. পঙ্কজ ভট্টাচার্য, গৌরবের সমাচার, ঢাকা, ১৯৭৭ এবং সাক্ষাৎকার, মোহাম্মদ ফরহাদ, হায়দার আকবর খান রণো, আবদুর রাজ্জাক, সিরাজুল আলম খান, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, মতিয়া চৌধুরী

মোনায়েম খাঁ সরকার ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ঢাকা (দক্ষিণ) মহকুমা প্রশাসকের এজলাসে এক মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর ধরে এই মামলা নিয়ে হয়রানী চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৬৯ সালে ৫ এপ্রিল এই মামলা প্রত্যাহার করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন ও ছাত্র বিক্ষোভ

মোনায়েম খান গভর্ণর হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আচার্য ছিলেন। ফলে তিনি এক শখ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের অনুষ্ঠানগুলিতে তিনি যোগদান করবেন।

প্রথম পর্যায়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে শেষ করেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে এসে ছাত্রদের দ্বারা তিনি প্রথম হোঁচট খেলেন তা-ই নয়, এক লঙ্কাকাণ্ডও ঘটিয়ে দিলেন। ২২ মার্চ, '৬৪, কার্জন হলে সমাবর্তনের এই অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা ছিল। ছাত্ররা পূর্বেই মোনায়েম খান কর্তৃক সনদপত্র বিতরণে অস্বীকারও আপত্তি করছিল এবং প্রতিবাদে খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।

ছাত্র সংগঠনগুলো এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত সংগঠিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ডাকসু'র সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদিকা রাশেদ খান মেনন ও মতিয়া চৌধুরী, ইকবাল হলের (বর্তমান জহুরুল হক হল) সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নুরুদ্দ চৌধুরী ও আলী হায়দার খান, সলিমুল্লাহ হলের সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ফরাসউদ্দীন ও মোহাম্মদউল্লাহ ভুইঞা, ঢাকা হলের (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) সহসভাপতি বজলুর রহমান এবং ফজলুল হক হলের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক এ উপলক্ষে এক যুক্ত বিবৃতি দেন। সেখানে তাঁরা ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে আচার্য নিয়োগের দাবী জানান।

২২ মার্চের সমাবর্তন অনুষ্ঠান বর্জনের বিষয় নিয়ে ২১ মার্চ ডাকসু অফিসে একটি সর্বদলীয় ছাত্র নেতাদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা চলাকালীন সময়ে এন, এস, এফ-এর বাহিনী এক অতর্কিত কিন্তু পূর্ব পরিকল্পিত আক্রমণ দ্বারা সভা লণ্ডভণ্ড করে ফেলে। অভিযোগ হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টরও এই আক্রমণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কারণ এন, এস, এফ-এর বাহিনী প্রোক্টর অফিস থেকেই হকিষ্টীক ও রড সংগ্রহ করেছিল।[১০]

১০. সাক্ষাৎকার, রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরী, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী

এমতাবস্থায়ও অনুষ্ঠানের দিন ঘটনা অত্যন্ত চরম আকার ধারণ করে। পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে জটিল ও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়লে গভর্ণর মোনায়েম সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। এই সময় ছাত্র-পুলিশ উভয়েই এক মারাত্মক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। পাইকারী হারে চলে গ্রেফতারী পরোয়ানা। কাঁদুনে গ্যাস ও অন্যান্য আঘাতে বহু ছাত্র আহত হয়।

রাতের অন্ধকারে ছাত্রাবাস ঘেরাও করে প্রায় ১৫০ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।[৯১]

ডাকসুর সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদিকা রাশেদ খান মেনন ও মতিয়া চৌধুরী সহ অন্যান্য ছাত্র নেতৃবৃন্দ ঘটনার নিন্দা করে এক বিবৃতি দেয়। কিন্তু দমননীতি বন্ধ হয় না। উল্টো ৩০ মার্চ রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রণো, গিয়াস কামাল, এ.কে বদরুল হক (ছাত্র ইউনিয়ন), শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, কে, এম, ওবায়দুর রহমান, এন, এম, সিরাজুল আলম (ছাত্রলীগ) প্রমুখের নামে হুলিয়া জারী করে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

কিন্তু এতে আন্দোলন দ্বিগুন তেজে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি এমনি একটা পর্যায়ে চলে যায় যে, সরকার উপায়ন্তর না দেখে, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের ৭৪টি কলেজ, ১৪০০টি উচ্চবিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। সারাদেশে ছাত্র গ্রেফতারের সংখ্যা প্রায় ১২০০ জন।[৯২]

ঢাকা কলেজ ও ঢাকা আর্ট কলেজের ১২ জন ছাত্রকে রাস্টিকেট করা হয়।[৯৩] ছাত্রলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও আসমত আলীর এম, এ ডিগ্রী কেড়ে নেওয়া হয়।[৯৪]

৫ বছরের জন্য ছাত্রলীগ নেতা কে, এম ওবায়দুর রহমান ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতা এ, কে, বদরুল হক ও রাশেদ খান মেনন এবং সওগাত আলমকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়।

---

৯১. আজাদ, ২৩ মার্চ, ১৯৬৪
৯২. ঐ, ৫ মে, ১৯৬৪
৯৩. ঐ, ২৬ মার্চ, ১৯৬৪
৯৪. ঐ, ২৮ এপ্রিল, ১৯৬৪

৩ বছরের জন্য বহিষ্কৃত হয় হারাৎ হোসেন, আনোয়ারুল হক চৌধুরী, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, আনোয়ার আলী, আলী হায়দার খান ও শহীদুল হক।

দুই বছরের জন্য বহিষ্কৃত হন গিয়াসুদ্দিন আহমদ চৌধুরী, মনসুর উদ্দীন আহমদ, জাকির আহমদ, আবদুল করিম, সৈয়দ মতিউর রহমান, আবদুর রাজ্জাক, সিরাজুল আলম খান, কাজী মোজাম্মেল ইসলাম, আরিফুর রহমান, হুমায়ুন কবির, কামালউদ্দিন শিকদার।

সদাচারের 'মুচলেকা-পত্র' দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় ২০ জনকে। একমাত্র ফেরদৌস আহমদ কোরেশী (ছাত্রলীগ) তা দিতে অস্বীকার করলে তাঁকেও ১ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। তিনি প্রতিবাদে উপাচার্য বরাবর এক দীর্ঘ পত্র লেখেন যা জাতীয় সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়।[১৫]

নির্যাতন-নিপীড়ন এই সময়ে ছাত্রদের উপর এতো চরম আকার ধারণ করে যে, উপরে উক্ত চিত্রটিই যথেষ্ট। এ সংবাদ যাতে জনগণের কাছে না পৌছে তার জন্য বিধি-নিষেধ জারী করা হয়। শুধু তাই নয়, ইতোপূর্বে 'আপত্তিকর' সংবাদ পরিবেশনের দায়ে 'কারণ দর্শাও নোটিশ' ও ত্রিশ হাজার টাকা করে জামানত তলব করে আজাদ, সংবাদ ও ইত্তেফাককে সমন দেওয়া হয়।

পত্রিকাগুলিও প্রতিবাদে সম্পাদকীয় পাতা শূণ্য করে প্রকাশ করে। এবং হাইকোর্টে বিচারপতি মোর্শেদের কক্ষে মামলা দায়ের করে জয়লাভ করে। এরপর ২৮ মে (১৯৬৪) তারিখে পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলি ছাত্র নির্যাতনের ৩০ দিনের এক খতিয়ান প্রকাশ করে।

এদিকে ছাত্ররাও বসে থাকেনি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। রীট আবেদনে ছাত্র পক্ষে এসে দাঁড়ান এডভোকেট জাকির আহমদ (তিনি নিজেও একজন ভুক্তভোগী ছিলেন) ও আহমদ ফারুক। হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ ৮ জুলাই এক ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে ছাত্র বহিষ্কারের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করেন।

মামলায় জিতে ছাত্ররা বিজয় মিছিল বের করে শহর প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু এখানেও পুলিশ বাহিনী ছাত্রদের শোভাযাত্রার ওপর লাঠিচার্জ করে।

---

১৫. সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী

৮ মে (১৯৬৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ঘোষণা দেওয়া হলে ৪ মে সকল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এক যৌথ সভায় উপাচার্য ডঃ ওসমান গণির পদত্যাগ দাবী করে।

এই সময় আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

যে সমস্ত ছাত্র নেতাদের শিক্ষাবর্ষ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল চাপের মুখে তখন অনেককে আবার কর্তৃপক্ষ নিয়মিত করে নেন। কিন্তু একমাত্র মতিয়া চৌধুরীকে আর ভর্তি করা যায়নি।

৬৪ সালের ১৮ জুন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ময়মনসিংহ) ছাত্ররা ও ঢাকা কৃষি কলেজের ছাত্ররা তাদের নিজস্ব দাবী দাওয়ার প্রশ্নে ধর্মঘট পালন করে। সেখানেও পুলিশ হামলা করে এবং বহু ছাত্রকে আহত ও গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ছাত্রাবাস ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেও ছাত্ররা তা অবজ্ঞা করে। ফলে পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রদের বিতাড়িত করা হয়। এখানে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অপরাধে ৪৮ জন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়।

প্রতি ৪২ ঘণ্টায় ১ জন গ্রেফতার

১৯৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলন এতো ব্যাপকতা লাভ করেছিল যে সরকার টলটলায়মান অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। ছাত্র নির্যাতনও অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এই সময়ের একটি পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে, ৬৪ সালের ১ জানুয়ারী থেকে মাত্র ২২ জুন পর্যন্ত গড়ে প্রতি ৪২ ঘণ্টায় ১ জন করে ছাত্র বা রাজনৈতিক কর্মী গ্রেফতার হয়েছে।[৯৬]

অগাষ্ট (১৯৬৪) মাস থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমগ্র প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবার ধর্মঘট শুরু হয়। ২৯ অগাষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশ দ্বারে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়।[৯৭]

ঢাকা কলেজ থেকে এই সময় দু'জন ছাত্রকে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়।

---

৯৬. রফিকুল ইসলাম, বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, (বাঙলাদেশ, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মনসুর মুসা সম্পাদিত), ঢাকা, ১৯৭৪ গ্রন্থে উল্লেখিত

৯৭. আজাদ, ৩০ আগষ্ট, ১৯৬৪

২২ দফা রচনা

আন্দোলনের নতুন দিগন্ত প্রসার ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে আরো সুনির্দিষ্ট এবং সুসংবদ্ধ করার জন্য ৬ সেপ্টেম্বর (১৯৬৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মধুর ক্যান্টিনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধির মিলিত বৈঠক নতুন করে বৃহত্তর আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের ২২ দফা রচনা করে। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি মূল্যায়ণ করে সর্বদলীয় ছাত্রনেতাদের এই সমাবেশ প্রস্তাবনায় উল্লেখ করে যে, "দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে এগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়"।[৯৮]

২২ দফার ভিত্তিতে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সংগঠনগুলি সারাদেশব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৯৬৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রদেশব্যাপী ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ভীত, সন্ত্রস্ত আইয়ুব ও মোনায়েম সরকার পরদিন ১৮ তারিখ প্রদেশের সকল স্কুল-কলেজ এবং ১৯ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ) অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। পত্রিকাগুলোতে আবার সেন্সরশীপ জারী করা হয়।

বাইশ দফার রূপরেখা

১. স্কুল শিক্ষা :

ক, বৈজ্ঞানিক পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে হবে,

খ, পাঠ্যসূচী থেকে অপ্রয়োজনীয় বিষয়সূচী বাদ দিতে হবে,

গ, বিকৃত তথ্য তুলে দিয়ে ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরতে হবে,

ঘ, কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি বাতিল করে সারা দেশে একই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে,

ঙ, ১৯৭০ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এবং ১৯৭৫ সালের মধ্যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনের ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে,

চ, ছাত্র বেতন শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়ে দিতে হবে এবং গরীব ছাত্রদের বিনামূল্যে বই বিতরণ করতে হবে।

---

৯৮. আজাদ, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ এবং সাক্ষাৎকার, রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরী, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী

২, মহাবিদ্যালয় শিক্ষা :

ক, বিদ্যালয়সমূহে নৈশ বিভাগ চালু করতে হবে,

খ, প্রত্যেক জেলায় নতুন সরকারী মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে,

গ, মহাবিদ্যালয়সমূহে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে,

ঘ, গবেষণাগার ও গ্রন্থাগারসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করতে হবে,

ঙ, সরকারী ও বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ে একই পরিমান বেতন নির্ধারণ করতে হবে,

চ, ন্যায্যমূল্যে বই সরবরাহ করতে হবে,

ছ, নতুন করে অপ্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচী প্রবর্তন না করা,

জ, প্রত্যক্ষ ভোটে সকল মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে,

ঝ, অভিভাবকদের ভোটে পরিচালনা পরিষদ গঠন করতে হবে,

ঞ, রাজনৈতিক কারণে মহাবিদ্যালয়ের স্বীকৃতি (এফিলিয়েশন) ও অনুদান বন্ধ করা চলবে না।

৩. বৃত্তিমূলক শিক্ষা :

ক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে,

খ, অটোমেশন প্রথা বাদ দিতে হবে,

গ, সেমিষ্টার পদ্ধতি চালু করতে হবে,

ঘ, পলেটেকনিক ডিপ্লোমার পর দুই বছরের কোর্স করে স্নাতক প্রকৌশলী হওয়ার ব্যবস্থা চালু করতে হবে,

ঙ, পশ্চিম পাকিস্তানের মতো পূর্ব পাকিস্তানেও অধিক হারে বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

৪. চিকিৎসা বিদ্যা :

ক, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সংলগ্ন হাসপাতাল সমূহে আসন সংখ্যা কমপক্ষে চারশত করতে হবে,

খ, এসব মহাবিদ্যালয় স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে হবে,

গ, মেডিক্যাল স্কুলগুলিকে উন্নীত মানে নিতে হবে,

ঘ, দেশীয় রোগ নিরাময় চিকিৎসা ও গবেষণা কেন্দ্র খুলতে হবে,

ঙ, এম,ডি, ও এম,এস কোর্স চালু করতে হবে,

চ, আরো অধিক সংখ্যক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৫. কৃষি শিক্ষা :

ক, আরো কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে,

খ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে,

গ, গবেষণা ক্ষেত্রে আরো উন্নয়ন আনতে হবে।

৬. বিশ্ববিদ্যালয় :

ক, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে নৈশ বিভাগ চালু করতে হবে,

খ, মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে স্নাতক (সম্মান) পাঠ্যসূচী চালু করতে হবে,

গ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আরো বিভাগ চালু করতে হবে।

৭. ভাষা :

শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হবে বাঙলা।

৮. নারী শিক্ষা :

ক, প্রতি থানায় একটি করে সরকারী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে,

খ, প্রতি জেলাসদরে মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে,

গ, আরো অধিক সংখ্যক ছাত্রী নিবাস নির্মাণ করে মেয়েদের আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. মাদ্রাসা শিক্ষা :

ক, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক, বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে,

খ, ইসলামিক একাডেমী ও গবেষণা কেন্দ্রে সরকারী মঞ্জুরী আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

১০. সামরিক শিক্ষা :

ক, পূর্ব পাকিস্তানে সকল প্রকার সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং

খ, তাতে বাঙালীদের প্রবেশাধিকারের সুযোগ বাড়াতে হবে।

১১. সকল প্রকার ছাত্রাবাস সমস্যার সমাধান করতে হবে।

১২. ক, শুধু মাত্র রাজনৈতিক কারণে বিদেশে বৃত্তি ও গবেষণার সুযোগের ক্ষেত্রে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না,

খ, ছাত্রদের শিক্ষা সফরের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

১৩. পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূর করে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দ্বিগুণ করতে হবে।

১৪. স্বাস্থ্য ও ছাত্র কল্যাণ :

ক, ছাত্রদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করে বিনামূল্যে চিকিৎসা করতে হবে,

খ, খেলাধূলার উন্নত মানের ব্যবস্থা করতে হবে,

গ, কক্সবাজারে ছাত্রদের জন্য স্বানাটেরিয়াম নির্মাণ করতে হবে।

১৫. শিল্পকলা ও সংস্কৃতি :

ক, অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধ করতে হবে,

খ, সুস্থ এবং দেশাত্মবোধক জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করতে হবে।

১৬. শিক্ষকদের উচচন বেত ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭. ব্যয় বরাদ্দ :

ক, দেশের প্রশাসনিক ও সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে শিক্ষাখাতে মোট ব্যয় ২৫% করতে হবে।

১৮. ক, ১৯৫৯ সালের শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন পুরোপুরি বাতিল করতে হবে,

খ, শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, অভিভাবক, ছাত্র প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।

১৯. নির্যাতন :

ক. যে সব ছাত্রের ডিগ্রী বাতিল করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে,

খ, বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে,

গ, সকল মামলা প্রত্যাহার করতে হবে,

ঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দূর্নীতির তদন্ত করতে হবে,

ঙ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসভা করার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

২০.ক, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্বশাসন দিতে হবে,

খ, নিরপেক্ষ শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করতে হবে,

গ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম, ও, গণি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মমতাজউদ্দিনকে বরখাস্ত করতে হবে।

২১. ২১ ফেব্রুয়ারী ও ১৭ সেপ্টেম্বরকে সরকারী ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা দিতে হবে।

২২. প্রধান বিচারপতি বা একজন নিরপেক্ষ শিক্ষাবিদকে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আচার্য হিসাবে নিয়োগ করতে হবে।[৯৯]

হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন

প্রকৃত পক্ষে হামুদুর রহমান কমিশন কোনো শিক্ষা কমিশন ছিল না। অন্ততঃ নতুন করে কোনো শিক্ষানীতি প্রণয়নও তার উদ্দেশ্য ছিল না। বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের রেশ চৌষট্টিতে এসেও থামছিল না। সারাদেশে প্রবল ছাত্র বিক্ষোভের মুখে ৫৯ সালে গঠিত এবং ৬২ সালে প্রকাশিত শরীফ কমিশন প্রতিবেদন বাস্তবায়ন স্থগিত রাখতে হয়েছিল। এই পটভূমিতেই প্রেসিডেন্ট ছাত্র বিক্ষোভের কারণসমূহ অনুসন্ধান ও শরীফ কমিশন প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য একটি নতুন কমিশন গঠন করেন। কমিশনের প্রতিবেদনেও সে উদ্দেশ্যের কথাই লেখা আছে :

৯৯. Report of the commisson on Student problem and welfare, Govt: of Pakistan, Ministry of Educaiton, Karachi, 1966, P-228-234. (হামুদুর রহমান কমিশন প্রতিবেদন—লেখক)

"The high power commission would be appointed to investigate in to the problems of the student.[১০০]

বিচারপতি হামুদুর রহমান এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন:

১, বিচারপতি এম, এ, মাহমুদ, হাইকোর্ট, পশ্চিম পাকিস্তান
২, কাজী আনোয়ারুল হক, চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন
৩, নাসির আহমেদ, চেয়ারম্যান, পশ্চিম পাকিস্তান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

কমিশন গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল ১৯৬৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর (সুতরাং বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন হামুদুর রহমান কমিশনের বিরুদ্ধে হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, অনেক পুস্তকাবলী ও সংবাদপত্রে প্রতি বছর যা লেখা হয়ে থাকে). এবং কমিশনের সুপারিশ মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে।

কমিশন তার প্রতিবেদনে ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে অত্যন্ত অপমানজনক মন্তব্য করেন। ছাত্র সংগঠনগুলো সম্পর্কে কমিশন বলেন যে, এদের নিজস্ব কোনো ঘোষণাপত্র বা আদর্শ নেই, রাজনৈতিক দলগুলোর কল-কাঠিতে এরা নড়ে; কমিশন অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করে বলে যে, তাঁরা ছাত্রদের অনেক সমস্যা ও দাবীর যৌক্তিকতাই খুঁজে পান নি।

কোনো কোনো দাবীর (যেমন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত) বাধ্যতামূলক এবং বিনা বেতনে শিক্ষার যৌক্তিকতা পেয়েও কমিশন মন্তব্য করে:

"We appreciate their desire for the attainment of a high level of universal education but we regret that we are unable to hold that this demand in their realistic or economically sound."[১০১]

শুধু তাই নয়, ৬২ সালের মহান শিক্ষা আন্দোলনকে কমিশন শুধুমাত্র তিন বছর ডিগ্রী কোর্স বাতিলের আন্দোলন বলেও চিত্রিত করে।

হামুদুর রহমানের দৃষ্টিতে ছাত্রসংগঠন

বিচারপতি হামুদুর রহমান তাঁর প্রতিবেদনে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রায় সকল ছাত্র সংগঠন সম্বন্ধেই কিছু না কিছু মন্তব্য করেন। তবে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ

১০০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৬
১০১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৩৩

ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য যথার্থ অর্থেই কৌতূহলোদ্দীপক। কমিশন প্রতিবেদনে তিনি বলেন,

"বিভিন্ন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সংগঠন ছাড়াও পূর্ব ও পাশ্চম পাকিস্তানে প্রচুর অস্বীকৃতি প্রাপ্ত ছাত্র সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে। সাধারণতঃ ছাত্র বিক্ষোভ ও অসন্তোষের সময় এগুলির অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। যেমন, পশ্চিম পাকিস্তানে :

১, গণতান্ত্রিক ছাত্র ফেডারেশন (D.S.F)
২, আন্তঃকলেজ পরিষদ (I.C.B)
৩, নিখিল পাকিস্তান ছাত্র সংস্থা (A.P.S.O)
৪, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (N.S.F)
৫, করাচী ছাত্র ফেডারেশন (K.S.F)
৬, ইসলামী জামায়াতে তালেবা
৭, ছাত্রী কংগ্রেস
৮, জাতীয় ছাত্র সংস্থা (N.S.O) [কেবল মাত্র লাহোরে কার্যরত]
৯, পশ্চিম পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

পূর্ব পাকিস্তানে এমন ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে রয়েছে :

১, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (E.P.S.U)
২, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ (E.P.S.L)
৩, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (N.S.F)
৪, ছাত্রশক্তি (S.F)
৫, ইসলামী ছাত্রসংঘ।

পূর্ব পাকিস্তানের এই সকল সংগঠনসমূহকে খুব সহজেই চিহ্নিত করা চলে এবং এই বিষয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে এরা মূলতঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেরই অংশবিশেষ যা মূলতঃ ছাত্র সমাজের মধ্যে কার্যরত"।

ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন সম্পর্কে হামুদুর রহমান :

"এটা সর্বজনবিদিত যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন হচ্ছে, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অঙ্গ সংগঠন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ হচ্ছে আওয়ামী লীগের, ইসলামী ছাত্রসংঘ হচ্ছে নেজামে ইসলাম বা জামায়াতে ইসলামের, এন, এস, এফ হচ্ছে মুসলিম লীগের এবং ছাত্রশক্তি হচ্ছে কাউন্সিল মুসলিম লীগ অথবা কৃষক-শ্রমিক

পার্টির অঙ্গ সংগঠন। এগুলি অত্যন্ত সুসংগঠিত এবং পাঁচস্তর বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোতে বিভক্ত। প্রত্যেকটিরই বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসে শাখা রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের তো মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত শাখা রয়েছে। সর্বোপরি তাদের রয়েছে মহকুমা, জেলা শহর ও প্রাদেশিক কাঠামো। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের তিন ধরণের সদস্যের অস্তিত্ব দেখা যায়, ১, সাধারণ সদস্য ২, গোপনীয় কর্মী সদস্য, ৩, প্রতিনিধি কর্মী সদস্য। দুই-তিন বছর পর্যবেক্ষণ করার পর গোপন সদস্য কর্মী পদে নির্বাচন করা হয়। আর এদের থেকেই প্রতিনিধি সদস্য করা হয়ে থাকে। তারা প্রতি বছরই সম্মেলন করে থাকে এবং তা সর্বদাই অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। বিভিন্ন কলেজ ও ছাত্রাবাসের নির্বাচনে এরা প্রার্থী মনোনয়ন দিয়ে থাকে। কিন্তু যখন কোনো সদস্য এতে নির্বাচিত হয় তখন তাকে তার সংগঠনের দায়িত্ব প্রাপ্ত পূর্ব পদ থেকে অব্যাহতি নিতে হয়।

...এভাবে দেখা যায় যে, ছাত্র সংগঠনের কর্মকর্তাদের যারা ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ নামে দুটি বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত তাদের বড় ধরণের কোনো ব্যাপারে স্বাধীন কোনো ক্ষমতা নেই। শুধু মাত্র তারা নিজেদের পিতৃ সংগঠনের নিদেশ অনুসারে কাজ করে থাকে। এই ধরণের তৎপরতা ১৯৬২ সালের পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলনের সময় থেকেই পরিলক্ষিত হয়। বিগত ছাত্র নির্বাচনেও দেখা গেছে সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদ থেকে এন, এস, এফ-কে উৎখাত করার জন্য প্রদেশ ব্যাপী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন মৈত্রী জোট গঠন করেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় জোট গঠনের কৌশলের সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া ভার'।...

হামুদুর রহমানের বোধদয় :

...'এই সমস্ত অস্বীকৃতিপ্রাপ্ত ছাত্র সংগঠনসমূহ যা ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে তাতে স্বভাবতই আমাদের উদ্বেগ বয়ে আনে। অবস্থাটা সত্যিকার অর্থেই এমন যে, কর্তৃপক্ষ তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এবং অবজ্ঞা ভরে পাশে ঠেলে দিচ্ছেন, তথাপি বাস্তবে এই সমস্ত সংগঠনগুলিই ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র সংস্থাসমূহের পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

...সকল ছাত্র অসন্তোষকে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বৈরীভাবাপন্ন মনে করার মানসিকতা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমরা যারা ছাত্রদের মঙ্গলার্থী অথবা যারা মনে করি ছাত্রদের আন্দোলনে যাওয়া উচিৎ নয়, তাদের উচিৎ, সময় মতো এবং দ্রুততার সঙ্গে ছাত্রদের ক্ষোভ ও অভিযোগে (রক্ত ঝরার পূর্বেই) মনযোগ দেওয়া। এ ধরণের বিলম্বিত ও দমনমূলক কার্যক্রম, ছাত্রদের এই বিশ্বাসকেই শুধু দৃঢ়তর করে যে, তাদের সমস্যাদি কেবল মাত্র সংগ্রামের মধ্যেমেই আদায় হতে পারে এবং তা মূলতঃ এসবের মধ্য দিয়ে যারা নেতা হয়েছে তাদের আন্দোলনের উপকরণে এ বিরাট শক্তি যোগায়।

আমাদের মতে, যদি আমরা ছাত্র বিক্ষোভ বন্ধ করতেই চাই, তাহলে আমাদের উচিৎ (ক) ছাত্ররা যাতে আন্দোলন করার মতো সত্যিকারের কোনো ইস্যু না পায় তার ব্যবস্থা করা এবং (খ) সব এক সঙ্গে দূর না করতে পারলেও বিক্ষোভের মূল কারণসমূহ যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করা।"১০২

আইয়ুব খান বিচারপতি হামুদুর রহমানকে ছাত্র অসন্তোষের কারণসমূহ বের করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু হামুদুর রহমান অনাহূতই ছাত্রদের সম্বন্ধে বিভিন্ন অপ্রীতিকর মন্তব্য করে সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তুললেন এবং শরীফ কমিশনের প্রতিবেদনের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করলেন। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্ররা এই কমিশনের প্রতিবেদন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে এবং এই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধেই ছাত্রদের আবার নতুন করে রাজপথে নামতে হয়।

কিন্তু হামুদুর রহমান কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন দানা বেধে ওঠার আগেই ১৯৬৫ সাল ছাত্রদের কাছে আগমন করে নতুন রকম সঙ্কটের বছর হিসাবে। এ বছর অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের প্রেডিডেন্ট নির্বাচন। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী হলো মিস্ ফাতেমা জিন্নাহ্ (মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন)। আইয়ুব বিরোধী ছাত্র সমাজ স্বাভাবিক ভাবেই এই নির্বাচন নিয়ে মেতে ওঠে। প্রবল গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের তাতে করার কিছু ছিল না। ভোট দাতা ছিলেন মৌলিক গণতন্ত্রীরা—এদের সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার (প্রচলিত ছিল আইয়ুবের আশি হাজার ফেরেস্তা বলে)। চরম দুর্নীতি ও ভয়-ভীতি দেখায়েও আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র আড়াই হাজার

১০২. প্রাগুক্ত, (হামুদুর রহমান কমিশন প্রতিবেদন-লেখক), পৃষ্ঠা, ৪-৯৩

ভোট বেশী পান (আইয়ুব খান ২১,০১২ ভোট এবং মিস্ ফাতেমা জিন্নাহ ১৮,৪৩৪ ভোট)।[১০৩]

এরপরই ছাত্র আন্দোলনের মূল সঙ্কট দেখা দেয় ছাত্র ইউনিয়নের ভাঙ্গন নিয়ে। ৬৫ সালেই ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া চৌধুরী ও রাশেদ খান মেননের দুই বিবদমান নেতৃত্বে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

তারপর আসে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যকার অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ। ৬ সেপ্টেম্বর (১৯৬৫) এই যুদ্ধ শুরু হয়ে মাত্র সতের দিন চললেও বহুদিন তার রেশ চলতে থাকে।

ফলে হামুদুর রহমান কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রবল অসন্তোষ দেখা দিলেও বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই বড় ধরণের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

শিক্ষা কমিশন গঠন ও শিক্ষানীতি প্রণয়নের ইতিহাস

আইয়ুবের শাসনামল থেকে শুরু করে শেষ অবস্থা পর্যন্ত (১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত) মোট তিনটি অত্যন্ত আলোচিত শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে শরীফ কমিশন, ১৯৬৪ সালে হামুদুর রহমান কমিশন, ১৯৬৯ সালে নূর খান শিক্ষা কমিশন (আইয়ুবের বিদায়ের অল্প পরেই এই কমিশনটি গঠিত হয়েছিল)।

এরও পূর্বে ১৯৫২ সালে গঠিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গ শিক্ষা কমিটি, ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকাকালীন গঠিত হয়েছিল (মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান কর্তৃক) পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা কমিশন।

মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে গঠিত হয় কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, জিয়াউর রহমানের শাসনামলে কাজী জাফরের উদ্যোগেও একটি শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল। (আমাদের গ্রন্থ লেখার সময় পর্যন্ত) এদেশের সর্বশেষ শিক্ষা কমিশন হচ্ছে আবদুল মজিদ খানের।

বৃটিশ আমলে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন গঠিত হয়েছিল। ১৯৩৪ সালে গঠিত হয়েছিল সাপ্রু কমিটি, ১৯৪৪ সালের সার্জেন্ট কমিটিও শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিল। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মেকলে প্রবর্তিত Filteration Theory-র কথা তো অত্যন্ত সবিদিতই আছে।

১০৩. আইয়ুব খান, প্রভু নয় বন্ধু, পৃষ্ঠা, ৩১৭

তবে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এছাড়াও বহু শিক্ষা সম্মেলন, শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রস্তাবাকারে সেসব গ্রন্থিতও হয়েছে।

ইতিহাসের জানা মতে, বৃটিশ ভারতে ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃক কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং এর দশ বছর পর ১৭৯১ সালে জোনাথান ডানকান কর্তৃক কাশীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর জন্য ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য উদঘাটিত হয়। দ্রুত জেগে ওঠা ভারতীয় ছাত্র সমাজকে ধর্মান্ধতায় সুপ্ত রাখা এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে একে পরিচিত না করাই ছিল তাদের মৌল উদ্দেশ্য।

এ দেশবাসীর জন্য একটা শিক্ষানীতি উপহার দেওয়ার তরে সর্বপ্রথম ১৮২৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় জনশিক্ষা পরিষদ (পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন কমিটি)। পরিষদ এদেশের ছাত্রদের দেশীয় বিষয় ও পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সুপারিশ করেন। ফলে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তৎকালে প্রচলিত মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন টোল ও মক্তব প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী সাহায্য দেওয়া হতে থাকে। এদেশের মোল্লা এবং পুরোহিতরা এই উদ্যোগে সমর্থন জানান এবং ইংরেজদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন।

কিন্তু এদেশের 'জাতীয় শিক্ষানীতি'র প্রশ্নে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ সমাজ হিতৈষী গোষ্ঠি। রাম মোহন রায় এক প্রতিবাদ পত্রে তৎকালীন লর্ডকে এদেশের ছাত্রদের জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গণিত, রসায়ণ, পদার্থবিদ্যা, জীব-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানান।[১০৪]

কিন্তু জন শিক্ষা পরিষদ তাঁর এ প্রস্তাব বাতিল করে দেন। এবং এরই মধ্য দিয়ে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যত স্বরূপ ও দিক নির্দেশনার প্রশ্নে প্রাচীনপন্থী ও আধুনিকপন্থীর আগমন ঘটায়।

তবে এই সময় সমাজের উচ্চবিত্ত সম্পদায়ের মধ্যে ইংরেজী ভাষা শেখার একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। আর এই সুযোগে মেকলে প্রবর্তন করেছিলেন এক জঘণ্য ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা। তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থার নাম Filteration Theory.

১০৪. শিক্ষা ও পরিকল্পনা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ১৯৮১, পৃষ্ঠা, ৮৭-৮৮

এর এমনিতে সহজ অর্থ হল, সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা ইংরেজীর মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান তাদের মাতৃভাষার মারফত সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে।

কিন্তু এর গূঢ়ার্থ ছিল ভিন্ন। মেকলে সেদিন বলেছিলেন।

"We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions who we govern—a class of persons Indian in blood and colour but English in tastes in opinions in morals and intellect."[১০৫]

অর্থাৎ এর মূল কথা হল, ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করতে হবে, যারা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে, মতবাদে, নীতিতে এবং হাব-ভাবে হবে সম্পূর্ণ ইংরেজ।

বলাবাহুল্য মেকলের এই আশা আশঙ্কাজনকভাবে পূর্ণ হয়েছিল। বৃটিশ প্রবর্তিত এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এ দেশের এক শ্রেণীর বিদ্বজ্জন এখন পর্যন্ত বশংবদ বৃটিশ মানসিকতায় এদেশবাসীর ওপরে ছড়ি ঘুরাচ্ছেন।

১৮৫৩ সালে কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালেণ্টাইন কলকাতা কলেজ পরিদর্শনের পর তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের কাছে এক রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন, এ দেশবাসীকে যদি ইংরেজী পড়াতেই হয়, তবে সাংখ্য ও বেদান্তের দর্শনের সঙ্গে বার্কলের Inquiry-কেও পড়ানো উচিৎ। শিক্ষাবিদ বিদ্যাসাগর এই দুই দর্শন পড়ানোরই বিরোধিতা করে বলেছিলেন, এ দেশের ছাত্ররা এতে সুফলের চেয়ে কুফলই বেশী ভোগ করবে।

পাশাপাশি পশ্চাদপদ ভারতীয় মুসলমান ছাত্রদের জন্য এদেশের মুসলিম জন নায়করা ঠিক এই সময়ে পরিকল্পিতভাবে কি চিন্তা করেছিলেন তা বিশেষ জানা যায় না। তবে বাঙলার মুসলমান ছাত্র সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় নানা কারণেই পিছিয়ে পড়েছিলো। তবে এর অন্যতম কারণটি ছিল,

---

১০৫. Sateyendranath Roy, selectories from Educational Research, (শহিদুল ইসলাম, আমাদের শিক্ষানীতি : অতীত ও বর্তমান), শিক্ষা ও পরিকল্পনা, এবং আবুজাফর, আর বক্তৃতা নয়, ভিন্নমত, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ প্রবন্ধে উদ্ধৃত

"It is mainly in Bengal that Mislims had some reason for complaining of being backward and underprivilizeged, for this was the province where they were hardest hit by British rule.১০৬

(এটা বিশেষ করে বঙ্গদেশে, যেখানে মুসলমানদের নিজেদের পশ্চাদপদ এবং বঞ্চিতদের দলভুক্ত বলে দাবী করার মধ্যে যুক্তি ছিল, কারণ এই প্রদেশটি হচ্ছে সে অঞ্চল যা বৃটিশ শাসনে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ হয়)।

আর এছাড়া এ কথা তো সর্বজনবিদিতই ছিল যে,

"Muslims held aloof from the new system of education because it was opposed to their tradition, unsuited to their requirements and hate ful to their religion ; that they Kept away from English schools because of the want of Muslim teachers, the absence of any provision for teaching the Muslim languages and the absence of religious education in thease schools."১০৭

(মুসলমানরা নতুন ধারার শিক্ষা পদ্ধতি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এর পেছনে যে কারণগুলো ছিল তা হচ্ছে, এ পদ্ধতির শিক্ষা ছিল তাদের ঐতিহ্যের বিরোধী, চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিহীন এবং ধর্মচেতনার সঙ্গে দ্বন্দ্বপূর্ণ। ইংরেজী বিদ্যালয়গুলি থেকে যে তারা নিজেদের দূরে রাখলো, তার পিছনে আরো কারণের মধ্যে ছিল, পর্যাপ্ত মুসলিম শিক্ষকের অভাব, মুসলমানী ভাষা শেখার কোনো রীতি না থাকা এবং এসব বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষাদনের বিধান অনুপস্থিতিও এর অন্যতম কারণ ছিল)।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনে তাঁর রিপোর্ট দিতে গিয়ে হাণ্টার সাহেব ১৮৮২ সালে মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষায় পিছিয়ে থাকার ব্যাপারে আরো লক্ষ্য করে বিশ্লেষণ করেছিলেন,

"the most Powerful deterrentes to muslim education were pride of race, a memory of bygone superiority, religious fears and a not unnatural attachment to the learning of Islam".১০৮

---

১০৬. Apparna Basu, The Grouth of Education and Political Development in India (1918-1920), Delhi, oxford univesity Press, 1974, P. 150

১০৭. Hunter, Indian Musalmans, PP. 177, 181-2

১০৮. Report of the Indian Education commission 1883-4, Vol-I P. 483

"It is mainly in Bengal that Mislims had some reason for complaining of being backward and underprivilizeged, for this was the province where they were hardest hit by British rule.১০৬

(এটা বিশেষ করে বঙ্গদেশে, যেখানে মুসলমানদের নিজেদের পশ্চাদপদ এবং বঞ্চিতদের দলভুক্ত বলে দাবী করার মধ্যে যুক্তি ছিল, কারণ এই প্রদেশটি হচ্ছে সে অঞ্চল যা বৃটিশ শাসনে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ হয়)।

আর এছাড়া এ কথা তো সর্বজনবিদিতই ছিল যে,

"Muslims held aloof from the new system of education because it was opposed to their tradition, unsuited to their requirements and hate ful to their religion ; that they Kept away from English schools because of the want of Muslim teachers, the absence of any provision for teaching the Muslim languages and the absence of religious education in thease schools."১০৭

(মুসলমানরা নতুন ধারার শিক্ষা পদ্ধতি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এর পেছনে যে কারণগুলো ছিল তা হচ্ছে, এ পদ্ধতির শিক্ষা ছিল তাদের ঐতিহ্যের বিরোধী, চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিহীন এবং ধর্মচেতনার সঙ্গে দ্বন্দ্বপূর্ণ। ইংরেজী বিদ্যালয়গুলি থেকে যে তারা নিজেদের দূরে রাখলো, তার পিছনে আরো কারণের মধ্যে ছিল, পর্যাপ্ত মুসলিম শিক্ষকের অভাব, মুসলমানী ভাষা শেখার কোনো রীতি না থাকা এবং এসব বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষাদনের বিধান অনুপস্থিতিও এর অন্যতম কারণ ছিল)।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশনে তাঁর রিপোর্ট দিতে গিয়ে হাণ্টার সাহেব ১৮৮২ সালে মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষায় পিছিয়ে থাকার ব্যাপারে আরো লক্ষ্য করে বিশ্লেষণ করেছিলেন,

"the most Powerful deterrentes to muslim education were pride of race, a memory of bygone superiority, religious fears and a not unnatural attachment to the learning of Islam".১০৮

---

১০৬. Apparna Basu, The Grouth of Education and Political Development in India (1918-1920), Delhi, oxford univesity Press, 1974, P. 150

১০৭. Hunter, Indian Musalmans, PP. 177, 181-2

১০৮. Report of the Indian Education commission 1883-4, Vol-I P. 483

(মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণের প্রধান বাধাসমূহ ছিল নিজেদের জাতিগত অহঙ্কার, অতীত বীর্যশীলতার স্মৃতি অহমিকা, ধর্মভীরুতা এবং ইসলামী শিক্ষার প্রতি স্বভাবসুলভ অনুরাগ)।

তবে এই সময় উচ্চশ্রেণীর মুসলমান শিক্ষাবিদদের ভূমিকা ছিল খুবই প্রতিক্রিয়াপন্থী। ১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী লর্ড রিপন কর্তৃক গঠিত ভারতীয় শিক্ষা কমিশনে (হাণ্টার কমিশনে) মুসলিম চিন্তানায়ক নবাব আবদুল লতিফ তাঁর লিখিত বক্তব্যে উচ্চ শ্রেণীর জন্য ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় শিক্ষাদানের কথা বলেছিলেন। বাঙলা ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জঘণ্য মন্তব্য করে বলেন যে, নিম্নশ্রেণীর মুসলমান, যারা জাতিগতভাবে হিন্দুদের থেকে পৃথক নয়, তাদের জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে বাঙলায় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।[১০৯] ফলে ইংরেজী মাধ্যমে পরিচালিত এবং হিন্দু অধ্যুষিত ও প্রভাবিত পূর্ব বাঙলার অধিকাংশ কলেজের মাধ্যমে এ অঞ্চলের গরীব মুসলমান ছাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার যথার্থ অর্থেই বন্ধ থাকে।[১১০]

ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে এক অঘোষিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৬৪ সালে আক্রমণ তীব্রতর করে তুলে যুক্তরাষ্ট্র। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্য-বাদের এই হামলা বন্ধের দাবীতে ঢাকার বার কাউন্সিলে সর্বদলীয় ছাত্র জনতার এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে এই জমায়েতের আয়োজন করা হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে অবিলম্বে ভিয়েত-নাম থেকে হাত গুটানোর আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বক্তব্য রাখেন।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে এ ব্যাপারে তিন দিন ধরে বিতর্ক চলে। ছাত্র-লীগের যে সব নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্ট বিরোধী ছিলো তারা এ প্রস্তাব গ্রহণের তীব্র বিরোধিতা করছিলো। কিন্তু প্রস্তাবকরা যুক্তি প্রদর্শন করে যে, এটা কমিউনিজমের ব্যাপার নয়, এটা আগ্রাসনের ব্যাপার। যে কোন আগ্রাসনকে ছাত্রলীগের নিন্দা করা উচিৎ। অবশেষে তিন দিন পর সর্বসম্মতভাবে ছাত্রলীগ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটা নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।[১১১]

---

১০৯. শিক্ষা ও পরিকল্পনা, পৃষ্ঠা, ৯২-৯৩

১১০. M. A. Rahim, The History of the University of Dhaka, 1981, P. 3

১১১. আব্দুল কাইয়ুম মুকুল, সাম্রাজ্যবাদ হাত গুটাও, গৌরবের সমাচার, পৃষ্ঠা, ৪১ এবং সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, আবদুর রাজ্জাক

ছাত্র ইউনিয়নে ভাঙ্গন

ছাত্র ইউনিয়ন জন্মের পর থেকে তাদের বিঘোষিত নীতির মধ্যে অন্যতম ছিল 'ঐক্য' প্রশ্ন। এই নীতিমালার বশবর্তী হয়েই প্রধানত ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে ছাত্রলীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ হিসেবে একটি মাত্র ছাত্র সংগঠন গড়ার দু'দুবারের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল।[১১২]

সেই ছাত্র ইউনিয়নই ১৯৬৫ সালে কতক মতাদর্শগত কারণে, কতক নেতৃত্বের প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ছাত্র ইউনিয়নের এই ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে

---

১১২. ছাত্রলীগ-ছাত্রইউনিয়ন ঐক্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জানিয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির (১৯৫৫) দপতর সম্পাদক ও বর্তমান শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের নেতা নির্মল সেন। তিনি বলেছেন, দুই সংগঠনের এক মঞ্চ গড়ার প্রচেষ্টা ১৯৫৫ সালের শেষার্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ৫৪ সালে যুক্ত ফ্রণ্টের নির্বাচনে দুই সংগঠনের এক সঙ্গে কাজ করার মধ্য দিয়েই এ সম্ভাবনা বড় হয়ে দেখা দেয়।

১৯৫১ সালেই ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ সংশোধন করার প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে প্রবল উত্তেজনায় কাউন্সিল না করতে পারায় সংশোধনী চূড়ান্ত করা যায় নি।

তবু ছাত্রলীগের কার্যধারা ছাত্রইউনিয়নও অসাম্প্রদায়িকই মনে করতো। ছাত্রলীগ তাদের সব কাজে ব্যবহার করতো—"শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি" শ্লোগানটি। ছাত্রইউনিয়ন লিখতো, "ঐক, শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি"। ফলে দুই সংগঠনের একত্রীকরণে খুব কম বাধাই সামনে ছিল। (এই সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থেরই ১৫, ১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠায়)। ১৯৫৪ সালের ঐক্য প্রচেষ্টা স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর ১৯৫৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে আরেকটি প্রচেষ্টা শুরু হয়। ছাত্রলীগ-ছাত্রইউনিয়নের জেলে আটক নেতৃবৃন্দ তা মেনে নেয়। কিন্তু ছাত্রলীগ থেকে একটি শর্ত ছিল যে, কমিটি যা-ই হোক, নাম হবে 'ছাত্রলীগ'। ছাত্রইউনিয়ন কার্যনির্বাহী পরিষদে একত্রীকরণ কর্মসূচী পাশ হলেও জরুরী কাউন্সিলে কর্মীরা তা মেনে নিল না। সেখানে (U.S.L.—United student league) নামকরণের প্রস্তাব হলে তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। ১৫৭, নবাবপুরে, ছাত্রলীগ কার্যালয়ে যৌথ সভায় ছাত্রলীগ নেতা আবদুল আউয়াল ছাত্রইউনিয়নের নতুন প্রস্তাবের উপর আক্রমণাত্মক মন্তব্য করে। ফলে আলোচনা শেষবারের মতো ভেঙ্গে যায়।

এই ঐক্য প্রচেষ্টার সঙ্গে ছাত্রলীগ থেকে জড়িত ছিল আবদুল আউয়াল, আবদুল মোমেন তালুকদার, নির্মল সেন এবং ছাত্রইউনিয়ন থেকে এস.এ. বারী, এটি, আনোয়ারুল আজিম এবং আবদুস সাত্তার প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনেরও বড় ভূমিকা ছিল। সে সময় সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ আন্তঃমতাদর্শগত বিরোধে কার্যতঃ বিভক্ত হয়ে পড়ে। চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের পূর্বেই এই দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল।

১৯৬০ সালে মস্কোতে দুনিয়ার ৮১টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলনে এ মতাদর্শগত বিরোধ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সম্মেলনে যে দলিল গৃহীত হয়েছিল, অনেকে মনে করেন, তা ছিল চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার একটা আপোষ ফর্মুলা। তবে যেরকম ফর্মুলাই হোক না কেন, চীন-সোভিয়েত উভয়েই তখন মিলিতভাবে সংশোধনবাদের লাইন ধরায় যুগোশ্লোভিয়ার নিন্দা করে:

"কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে আন্তর্জাতিক সুবিধাবাদের যুগোশ্লাভ সংস্করণকে নিন্দা করছে। এই সুবিধাবাদের মধ্যে আধুনিক সংশোধনবাদী 'তত্ত্ব' সমূহের কেন্দ্রীভূত রূপ প্রকাশ পেয়েছে।"[১১৩]

তবে এই ঐতিহাসিক দলিলে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ একাশিটি পার্টি মিলিতভাবে দুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিতে সমর্থ হয়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের নীতি সম্পর্কিত। এতে বলা হয়,

"শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের নীতি হচ্ছে জনগণকে সমবেত ও সঙ্ঘবদ্ধ করার, শান্তির শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান চালানোর নীতি। সংশোধনবাদীরা যা বলে তা ঠিক নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের অর্থ শ্রেণী সংগ্রাম বাতিল করে দেওয়া নয়। বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার রাষ্ট্রের সহ-অবস্থান সমাজতন্ত্র ও পুঁজি-বাদের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের একটি রূপ। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের অবস্থায় পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রেণী সংগ্রাম এবং উপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ব্যাপক করার অনুকূল সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়।"[১১৪]

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে প্রতিনিধি হিসাবে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন কমরেড নেপাল নাগ। দেশে ফিরে তিনি পার্টির কাছে রিপোর্ট করার পূর্বেই চীন-সোভিয়েতের দ্বন্দ্ব আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে। চীন

১১৩. ১৯৬০ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত একাশিটি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির মহাসম্মেলনের বিবৃতি, গণপ্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা, ৬৬

১১৪. ঐ, পৃষ্ঠা, ৪৫-৪৬

মূলতঃ পরে নিজ স্বাক্ষরিত একাশি পার্টির দলিলের ঘোষণা থেকে সরে যেতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দু'জন সদস্য (মোহাম্মদ তোয়াহা ও সুখেন্দু দস্তিদার) ব্যতীত সকল সদস্যই চীনের লাইনের বিরোধিতা করেন।

ছাত্র ইউনিয়ন সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিকভাবে ছিল কমিউনিস্ট প্রভাবাধীন। তরুণ ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের মনে এই বিরোধ অত্যন্ত ভালভাবেই দোলা দিতে থাকে। এই সময়ে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্বেও তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হয়। ১৯৬৩ সালের সম্মেলনে এই বিরোধ দ্বন্দ্বে পরিণত হলে দুই পক্ষের সমঝোতা হিসাবে বদরুল হককে সভাপতি ও হায়দার আকবর খান রণোকে সাধারণ সম্পাদক করে একটা জোড়াতালি দেওয়া হয়। কাজী জাফর আহমদ এই সময় সভাপতি পদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু মোহাম্মদ ফরহাদের বিরোধিতার কারণে তিনি সফল হন না। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বও কাজী জাফরকে আবার সভাপতি হিসেবে চান নি।

এর পূর্বে ১৯৬২-তে গোপীবাগ কাউন্সিলে মোহাম্মদ ফরহাদের সভাপতি হওয়ার কথা ছিল। কারণ ৬২-র ছাত্র আন্দোলনে মোহাম্মদ ফরহাদের বুদ্ধিমত্তা ও নেতৃত্ব কর্মী মহলে এ আশা স্বাভাবিকভাবেই দানা বেধে উঠেছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি তাকে সভাপতি হতে নিষেধ করেন। পার্টি এই সময় মোহাম্মদ ফরহাদকে তার ছাত্র শাখার দায়িত্ব দিতে চান।

অন্যদিকে কাজী জাফরও ৬২-র দ্বিতীয় পর্বে এসে যুক্ত হয়ে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু কতক ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়। সাধারণত প্রবল আন্দোলনে তার ভীত-সন্ত্রস্ত মনোভাব সবাইকে চকিত করতো। এরমধ্যে একবার সে ব্যবসা করার জন্য খুলনাও চলে গিয়েছিল। ফলে তাকে দ্বিতীয়বার সভাপতি পদে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকেরই প্রশ্ন ছিল।

কিন্তু তার পরিবর্তে এ.কে বদরুল হকের মনোনয়নও সাধারণ কর্মী মহলে আশানুরূপ সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়। তবু ৬৩-তে বদরুল হক-রণো কমিটি শেষ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।[১১৫]

কিন্তু ৬৩-৬৪ সালের ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্র ইউনিয়নে আরেক পশলা দ্বন্দ্ব হয়ে যায়। ডাকসুতে সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে মতিয়া চৌধুরীর মনোনয়ন

---

১১৫. সাক্ষাৎকার, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, হায়দার আকবর খান রণো, মতিউর রহমান

ছিল চূড়ান্ত ও সর্বসম্মত। কিন্তু সহ-সভাপতি পদে রাশেদ খান মেনন ও জাকির আহমদ-এর দ্বন্দ্ব অত্যন্ত চরম আকার ধারণ করে। পরবর্তীকালের মতিয়াপন্থীরা, জাকির আহমদের সমর্থক ছিলো। কিন্তু পরে রাশেদ খানকে তারা সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে মেনে নেয়।

এই সময় মেনন সমর্থক হায়দার আকবর খান রণো, মেননের ব্যাপারে গোপনে ছাত্রলীগের সমর্থন কামনা করেছিলেন বলে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সংগঠন বিরোধী কাজের জন্য অভিযুক্ত হয় এবং সংগঠন থেকে বহিষ্কারের এক কঠিন প্রস্তাবের সম্মুখিন হয়। রণো অপরাধ স্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে আপোষ-রফা হিসাবে শুধু নিন্দা প্রস্তাব নেওয়া হয়।[১১৬]

তাই প্রাথমিক পর্যায়ে বিরোধের কারণ মতাদর্শগত ছিল না। নেতৃত্বের সমস্যার কারণেই শেষ পর্যন্ত দু'দল দুই শিবিরে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দুই শিবিরের এক দলের নেতা ছিলো কাজী জাফর আহমদ, অন্য দলের নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ। কাজী জাফর সমসাময়িক কালের জনপ্রিয় ছাত্রনেতা ছিলো কিন্তু সংগঠনের মূল নেতা ছিলো মোহাম্মদ ফরহাদ। কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র শাখা দেখা-শোনা করার দায়িত্ব অর্পিত হয় মোহাম্মদ ফরহাদের ওপর। কাজী জাফর পার্টির এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারে নি। ফলে তার বিরুদ্ধে শৃঙখলা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়। যেহেতু মূল পার্টির প্রায় সকলেই সোভিয়েত সমর্থক ও চীন বিরোধী ছিল সেহেতু কাজী জাফর চীনা লাইনের অনুসারী হতে বাধ্য হয়। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সংসদের চীনা লাইন অনুসারীদেরও সমর্থন কাজী জাফর পায় নি। কারণ আনুষ্ঠানিকভাবে তখনো পার্টি ভাঙ্গে নি। শৃঙখলার ব্যাপার সেখানেও ছিল। (তবে হায়দার আকবর খান রণো জানিয়েছেন, চীনা লাইন সমর্থক মোহাম্মদ তোয়াহা গোপনে একবার তাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং এতে তারা সাহসও পেয়েছিলেন)।

এমন একটা অবস্থায় ১৯৬৫ সালের এপ্রিলের ১, ২ ও ৩ তারিখে আহূত হয় ছাত্র ইউনিয়ন পরবর্তী সম্মেলন। আর তা উদ্বোধন করেছিলেন অধ্যাপক আবুল ফজল। ইঞ্জিনিয়ারিং ইনিস্টিউটে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের সময় সভাপতি এ কে বদরুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক হায়দার আকবর খান রণো ছিলো আত্মগোপনে কিংবা জেলে। ফলে কার্যকরী সভাপতি ও কার্যকরী সাধারণ

---

১১৬. সাক্ষাৎকার, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, হায়দার আকবর খান রণো

সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলো পঙ্কজ ভট্টাচার্য ও নূরুর রহমান। প্রথম থেকেই সম্মেলন ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। শুরুতেই প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক (কাউন্সিলার ও ডেলিগেট) তালিকা নিয়ে এক পশলা হাতাহাতি হয়ে যায়। এই পর্যায়ে ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে প্রচার সম্পাদক জামাল আনোয়ার বাসু (সে মতিয়াপন্থী ছিলো) হাসপাতালে নীত হয়।[১১৭] সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক নূরুর রহমানের দেওয়া তেত্রিশ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন (রিপোর্ট) নিয়ে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এ কারণেই ছাত্র ইউনিয়নের ভাঙ্গনে নূরুর রহমানের রিপোর্ট বিখ্যাত হয়ে আছে। প্রধানতঃ ১. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ২. সর্বজনীন ভোটাধিকার আন্দোলন এবং ৩. সমাবর্তন উৎসব সংক্রান্ত বিষয় তিনটিতে উল্লেখিত বিভিন্ন আন্দোলনগত কৌশল এবং কিছু শব্দাবলীর প্রশ্নে মূল্যায়নের ধরণ নিয়ে মতানৈক্য শুরু হয়। তবে এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ধরণ-ধারণ নিয়েই প্রধানত আলোচনা হয়।

নূরুর রহমান প্রতিবেদন :
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

"আমরা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলাম যে কনভেনশনী নেতারা এবং পদস্থ সরকারী ব্যক্তিরা অনেকেই একটা সাম্প্রদায়িক গোলযোগের উস্কানী দিচ্ছেন এবং খুলনার দাঙ্গা অন্যান্য স্থানেও ছড়াতে পারে। তাই কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদের প্রথম প্রস্তাবই হয় খুলনার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নিন্দা করে।' ...বস্তুতঃ এই প্রস্তাব গ্রহণের কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের সংগঠন এক চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হল। খুলনার পরে ব্যাপক দাঙ্গা শুরু হল কলিকাতায়। কলিকাতার প্রতিক্রিয়ায় নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় এবং অন্যান্য কোনো কোনো জিলাতেও ব্যাপক দাঙ্গার অবস্থার সৃষ্টি হল। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা উহার অসাম্প্রদায়িক এবং যথার্থ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পতাকাতলে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়ালেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সরকারের পৃষ্ঠপোষিত একটা মুখচেনা প্রতিক্রিয়াশীল মহল কলকাতার দাঙ্গার প্রতিবাদে সভা ও মিছিল করার প্রচেষ্টা নিল। দেশে যখন চরম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তখন এরকম সভা ও মিছিলের অর্থই যে দাঙ্গা বাঁধান, তাহা সুস্পষ্ট। তাছাড়া এর উদ্যোক্তাদের জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র আমাদের নিকট জানা ছিল। এদিকে অন্যান্য গণতান্ত্রিক ছাত্রদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি

---

১১৭. সাক্ষাৎকার, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, মতিয়া চৌধুরী, সাইফুদ্দিন মানিক, রাশেদ খান মেনন

দেখা দিল—কলকাতার দাঙ্গার প্রতিবাদে শুধু একটা সভা ও শান্তিপূর্ণ মিছিলে আপত্তি কি? এই অবস্থায় আমাদের কোনো কোনো কর্মী (এখানে কাজী জাফর-রাশেদ খান মেনন সমর্থিত অংশের কথা বলা হয়েছে—লেখক) মনে করলেন যে, প্রতিক্রিয়াশীলদের আহ্বানে সভা, মিছিল প্রভৃতি হবেই। তাই আমাদেরও এ গুলিতে যোগ দিয়ে এগুলো যাহাতে শান্তিপূর্ণ থাকে সেজন্য চেষ্টা করা উচিত; এ না করলে একদিকে আমরা ছাত্র সাধারণ হতে বিচ্ছিন্ন হব। অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীলরা দাঙ্গা বাঁধাবার সুযোগ পাবে। কেহ কেহ এমনও ভাবলেন যে মিছিল বের করা হবে না, প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্র মহলটির সাথে এই রকম একটি শর্ত করে তাদের সাথে একযোগে ধর্মঘট ও সভার আহ্বান দেওয়া উচিত। যা হোক আমরা শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম যে, ঐ পরিস্থিতিতে চিহ্নিত প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক ছাত্র মহলটার সাথে কোন রকম শর্ত করে একত্রে অগ্রসর হওয়া আমাদের অনুচিত হবে। আমাদের নাম ভাঙ্গিয়ে বড় জমায়েতের সুযোগ পেলে তখন চরম উত্তেজনার মুহূর্তে তারা শর্ত ভঙ্গ করলে তা রোধ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। তা'ছাড়া যে মুহূর্তে আমাদের নিজেদের দেশে দাঙ্গা প্রতিরোধ করা আমাদের প্রধান কাজ তখন অন্য দেশের দুষ্কর্মের সমালোচনা আমাদের মূল কাজে সাহায্য না করে বরং তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। তখন আমাদের প্রতিবাদ কলকাতার দাঙ্গা বন্ধতে কিছু মাত্রও সহায়ক হত না। কলকাতা তথা ভারতের মানুষকে দাঙ্গা প্রতিরোধে দাঁড়া করানোর একমাত্র পথ ছিল এখানে প্রত্যক্ষভাবে দাঙ্গা প্রতিরোধের কাজে আত্মনিয়োগ করা। আমরা ঠিক করলাম ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা তার ঐতিহ্য আর প্রভাব নিয়ে দাঙ্গার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। জীবন নিয়ে হলেও বিশ্ববিদ্যালয় হতে মিছিল করার বাধা দেবে। ছাত্র ইউনিয়ন এইরূপ দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করায় প্রতিক্রিয়াশীল দলটি অন্যান্য ছাত্র সংগঠনকে এবং সাধারণ ছাত্রদের বিভ্রান্ত করতে পারে নাই। সভায় বিশেষ ছাত্র জমায়েত হল না এবং মিছিল বের করা সম্ভব হয়ে উঠলো না। আমাদের সংগঠনের এই সঠিক নেতৃত্বদান শুধু ঢাকাতে সাধারণ ছাত্র সমাজকে দাঙ্গার বিরুদ্ধে সক্রিয় করেছে কিংবা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে আমাদের কর্মীদের কাজে অনুপ্রেরণা ও ও উৎসাহ জাগিয়েছে, তাই নয়, এর ফলে দেশের ব্যাপক গণতান্ত্রিক মহলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।...

এই দাঙ্গার মধ্য দিয়ে অপর একটি জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। দাঙ্গায় কোন কোন অবাঙ্গালী চটকল মালিকের হাত আছে এবং অবাঙ্গালী মজুর দাঙ্গায় নেতৃত্ব

দিয়েছে—এই ধরণের ঘটনার ফলে বিশেষভাবে ঢাকা প্রভৃতি স্থানে একটা তীব্র অবাঙ্গালী বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় এবং বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গা লাগার উপক্রম হয়। এই অবস্থায় আসে ২১শে ফেব্রুয়ারী। আমরা সেবার ২১শে ফেব্রুয়ারীর মূল শ্লোগান করি, দাঙ্গা ও সকল সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সার্বজনীন ও প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার আদায় করা।....

সার্বজনীন ভোটাধিকার আন্দোলন :

...কনভেনশনপন্থী পাণ্ডারা ও সরকারী পদস্থ ব্যক্তিরা তখনই দেশে একটি দাঙ্গার আবহাওয়া সৃষ্টি করছিল যখন সারাদেশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। দাঙ্গা আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি করলেও দুর্বার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রোধ করতে পারলো না। এই সময়, প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবীকে ভিত্তি করেই এই আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠে। পূর্বেই বলেছি, ইহা ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবসে আমাদের অন্যতম মূল শ্লোগান। প্রাদেশিক কেন্দ্রে আমরা ছাত্রলীগ ও ছাত্রশক্তির সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ করি এবং আমরা এক হয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথেও আলোচনা করি। এটা একটা আনন্দের সংবাদ যে এই প্রচেষ্টার ফলেই ১৯শে মার্চ দেশব্যাপী ভোটাধিকার দিবস প্রতিপালিত হয়। এই দিন দেশের সর্বত্র যে ব্যাপক হরতাল হয় তাকে সফল করার ব্যাপারেও আমাদের কর্মীদের তথা ছাত্র সমাজের অবদান যথেষ্ট।

এই সময়েই পত্রিকাতে খবর বের হয় যে, মার্কিন নৌ-বহর ভারত মহাসাগরে বিচরণ করবে। এটা যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকারের একটা হুমকী তাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় আমাদের কোন কোন বন্ধু (জাফর-মেনন অংশ—লেখক) বলেন, এখন সর্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে বরং মার্কিন নৌ-বহরের ভারত মহাসাগরে প্রবেশের বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা হোক।

কেহ কেহ এমন বলেন যে আমরা কেবল মোনায়েম খাঁ, আইয়ুব খাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি, দেশের মূল শত্রু সাম্রাজ্যবাদ তাঁদের সম্বন্ধে কিছু করছি না। অনেকেই তাদের যুক্তির সারবত্তা গ্রহণ করেন না। গণতান্ত্রিক ছাত্র সমাজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং ইহাও সত্য যে, আমাদের দেশের রাজ-

নীতি, অর্থনীতি, সামরিক বিভাগ প্রভৃতির উপর হইতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব দূর করতে না পারলে আমাদের দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হবে না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশ প্রত্যক্ষভাবে শাসন করছে না। আমাদের দেশের আইয়ুব-মোনায়েম তথা স্বৈরাচারী শাসনের মাধ্যমেই সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব বিদ্যমান আছে ও সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাই এদেশ হতে সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদ করতে হলে আইয়ুব-মোনায়েম তথা সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করতে হবে। ভারত মহাসাগরে ৭ম নৌবহরের অধিষ্ঠান তথা সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অবশ্যই আমাদের আন্দোলন করতে হবে। ইহা প্রধানত প্রচারমূলক প্রতিবাদমূলক আন্দোলন। এ ক্ষেত্রেও আমাদের প্রধান কাজ হল যাতে আমাদের সরকার সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহ-যোগিতা না করে এবং সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধাচারণ করে সেজন্য তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা। তাই সার্বজনীন ভোটাধিকারের আন্দোলন আর 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী' আন্দোলন—এ দুটোর একটাকে আর একটার বদলে গ্রহণ করা যায় না। দুটা কাজই আমাদের করতে হবে। স্বভাবতই যে কাজটা আমাদের সাথে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তাতেই বেশী লোক আগ্রহ দেখাবে এবং সে কাজটার উপরেই আমাদের প্রধান জোর দিতে হবে।

সমাবর্তন উৎসব

দাঙ্গাকে সারাদেশময় ছড়ান গেল না এবং দাঙ্গা বাঁধিয়ে, গণ আন্দোলনকে থামান গেল না দেখে স্বৈরাচারী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র উন্মাদ হয়ে উঠল। এবার তারা প্রত্যক্ষ গুণ্ডামীর পথ গ্রহণ করল এবং তাহাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য হলো ছাত্র সমাজ। এই কাজে তারা শুধু পুলিশ বাহিনী এবং গুণ্ডা বাহিনী নিয়োগ করলো তাই নয়, একটি প্রতিক্রিয়াশীল তথাকথিত ছাত্র সংগঠনের সভ্যদেরও কাজে লাগালো। সারা দেশময় ভোটাধিকার দাবীর আন্দোলনে ছাত্র সমাজ যখন ব্যস্ত, সেই সময় ঘোষণা করা হল যে, গভর্ণর মোনায়েম খা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের চ্যান্সেলর হিসেবে রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে পৌরোহিত্য করবেন। জনাব মোনায়েম খাঁ দেশের স্বৈরাচারী শাসকদের দালাল হিসেবে ছাত্র সমাজের চরম ঘৃণার পাত্র, তাকে গভর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারটিকে পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা বাঙ্গালীদের প্রতি অপমান হিসাবে গণ্য করে। তিনি সমাবর্তন উৎসবে যোগ দিলে ছাত্ররা সমাবর্তন

উৎসব বর্জন করবে, এই আশঙ্কায় ১৯৬২ সালে সমাবর্তন উৎসব বাতিল করা হয়। অথচ তার দুই বৎসর পরে, দেশের মধ্যে যখন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আরো তীব্র, তখন কর্তৃপক্ষ জিদ ধরলো যে, সমাবর্তন উৎসব করতেই হবে। স্বভাবতই এতে ছাত্রদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এবং স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক মহলেও এমন একটা ভাব দেখা গেল---দেখা যাক ছাত্ররা এবার কি করে? মোনায়েম খাঁর পৌরোহিত্যে সমাবর্তন উৎসব ছাত্রদের ও গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিল। ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা, ছাত্ররা যেন এর উপযুক্ত জবাব দিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ছাত্ররা তাঁদের কর্তব্য পালনে পরাঙমুখ হয় নাই। গুণ্ডা ও পুলিশের আক্রমন এবং জেল-জুলুম সত্ত্বেও রাজশাহীর ছাত্ররা সমাবর্তন উৎসবে বাধা দিল। স্বৈরাচারের প্রতিভূ মোনায়েম খাঁ শিক্ষাবিদের ময়ূর পুচ্ছ ধারণ করতে যেয়ে শেষে অপমানিত হয়ে ফিরে এলেন। এর কয়েকদিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসব। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখচেনা প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্রমহলটি খুব সক্রিয় হয়ে উঠলো। প্রথমে তারা কূটনীতির পথ ধরলো, মোনায়েম খাঁ আসছেন চ্যান্সেলর হিসেবে, শাসক হিসাবে নয়। ছাত্রদের মধ্যে একথা বিকালো না। তখন তাঁরা নানা-রকম শাসানী দিতে লাগলো এবং সক্রিয় ছাত্রকর্মীদের কাহাকে কাহাকেও একা পেয়ে মারপিট করলো। সমাবর্তন উৎসবের আগের দিন হতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতে যেভাবে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হল এবং সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন রাখা হল, তাতে মনে হলো একটা যুদ্ধ শুরু হচ্ছে। হলোও তাই---ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশের যুদ্ধ। সমাবর্তন উৎসব হলো লণ্ডভণ্ড। দেশে-বিদেশে মোনায়েম খাঁ তথা স্বৈরাচারী শাসনের "জনপ্রিয়তার" ছবি প্রকাশ পেল। দেশবাসী উৎফুল্ল হল, ছাত্র সমাজকে আশীর্বাদ জানাল।"[১১৮]

সফিকুর রহমান প্রতিবেদন

পরবর্তী সময়ে (পরের বছর) মেনন গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনে নূরুর রহমান পেশকৃত এই প্রতিবেদনের তীব্র সমালোচনা করে সফিকুর রহমান কর্তৃক ভিন্ন যে, কার্যবিবরণী পেশ করা হয়, তাতে উল্লেখিত হয়,

১১৮. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ১৯৬৫ সালে প্রাদেশিক সম্মেলনে পঠিত কার্যকরী সাধারণ সম্পাদকের কার্যবিবরণী, (নূরুররহমান পেশকৃত), পৃষ্ঠা, ৪-১০, (জনাব রাশেদ খান মেনন ও মতিউর রহমানের কাছে সংরক্ষিত)

"১৯৬৫ সালের সম্মেলনে পঠিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'সার্বজনীন ভোটাধিকারের আন্দোলন' ও 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন,— এ দুটার একটাকে আর একটার বদলে গ্রহণ করা যায় না। দুটা কাজই আমাদের করতে হবে। স্বভাবতই যে কাজটা আমাদের সাথে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তাতেই বেশী লোক আগ্রহ দেখাবে এবং সে কাজটার উপর আমাদের প্রধান জোর দিতে হবে।' রিপোর্টের এই অংশের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন এ দুটো কাজই আমাদের করতে হবে বলার সাথে সাথে 'লোকের আগ্রহের' নামে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে কৌশলে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে, এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জয়যুক্ত করতে হলে সাম্রাজ্যবাদ বিশেষভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকেও জয়যুক্ত করতে হবে।...

...এরপর আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আরেকটা ঘটনার দিকে। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে আমরা খবর পাই যে, ভারত মহাসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহর আগমন করবে। এই নৌবহর আমাদের দেশসহ গোটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শান্তি ও স্বাধীনতার প্রতি হুমকি স্বরূপ। আমরা এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমাদের প্রতিপক্ষ বন্ধুদের (এখানে মতিয়া-মানিকপন্থীদের কথা বলা হয়েছে—লেখক) বিরোধিতার জন্য আন্দোলন আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। তাদের যুক্তি ছিল (১) আজ যদি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা হয় তবে অন্যান্য সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল ও ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে আমাদের ঐক্যফ্রন্ট গড়ে উঠার যে সম্ভাবনা রয়েছে তা নষ্ট হয়ে যাবে।

(২) যেহেতু সপ্তম নৌবহর ভারত মহাসাগরে আসার পেছনে ভারত সরকারের সমর্থন রয়েছে, সেহেতু সপ্তম নৌবহর বিরোধী আন্দোলন, ভারত বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে।"[১১৯]

---

১১৯. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ-লেখক), জরুরী প্রাদেশিক সম্মেলন, ১৯৬৬, কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলীর কার্যবিবরণী, সহ-সম্পাদক সফিকুর রহমান পেশকৃত, (জনাব রাশেদ খান মেননের কাছে সংরক্ষিত)

অন্যান্য জটিলতা

ছাত্র ইউনিয়নের এই সম্মেলনে আয়োজিত সেমিনারে অতিথি বক্তা নির্ধারণেও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সেমিনার উপপরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক মতিয়াপন্থী মতিয়ুর রহমান অন্যান্যদের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানায় আলী আকসাদকে, পাল্টা অন্য যুগ্ম আহ্বায়ক মেননপন্থী মাহবুবউল্লাহ আমন্ত্রণ জানায় আনোয়ার জাহিদকে।

তবে এতোসব সত্ত্বেও ছাত্র ইউনিয়নের ভাঙ্গায় আদর্শগত বিরোধের ব্যাপারটি ছিল নিতান্তই (অন্তত: তখন পর্যন্ত) গৌণ। রাশেদ খান মেননের ভাষায়, "আমরা অনেকটা বুঝে, না বুঝেই চীনকে সমর্থন এবং রাশিয়াকে বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছিলাম। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আমরা অনুগত থাকলেও, তার নেতাদের প্রতি আমরা অনুগত ছিলাম না। বাস্তবিকভাবে ৬৩ সালের সম্মেলন থেকেই বিরোধের সূত্রপাত। এ বিরোধ যতোখানি না রাজনৈতিক আদর্শগত ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল কমিটি গঠন নিয়ে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা যেহেতু সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থক ছিল, সেহেতু পার্টির নেতাদের বিরোধিতা করতে যেয়ে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা শুরু করে দেই। অন্ততঃ ষাটের দশকে চীনকে তারুণ্যের প্রতীক মনে হতো। শুধু আমরাই নই, সমগ্র বিশ্বই এই সময়টা ছিল উত্তাল।"

মতিয়া চৌধুরীর কথায়, "তত্ত্বগত বিষয় আমার তেমন একটা মনে পড়ছে না। তৎকালীন চীনা লাইনের অনুসারীদের আইয়ুব প্রীতি আমার ভাল লাগতো না। এদের মধ্যে অনেকেই আবার সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিতেন ভারত বিরোধিতার নামে। আন্দোলনে হঠকারী ঝোঁকের আমি ছিলাম বিরোধী। ফলে চীন-প্রেমিকদের বিরোধী গ্রুপে আমাকে থেকে যেতে হল।"

শেষ পর্যন্ত ছাত্র ইউনিয়নের এই সম্মেলন ঐক্যবদ্ধভাবে আর শেষ হতে পারে নি। উত্তেজনা চরমে পৌঁছে নির্বাচনী অধিবেশনে। এই সময় রাশেদ খান মেনন ও কাজী জাফরের সমর্থকেরা সম্মেলন মঞ্চ দখল করে তাদের পছন্দসই নতুন কমিটি পাশ করে।[১২০] প্রতিবাদে মতিয়া-সাইফুদ্দিন মানিকের সমর্থকেরা সম্মেলন স্থান ত্যাগ করে। এবং সম্মেলনের শেষদিন ইকবাল হল প্রাঙ্গণে মিয়া সাদেকুর রহমানের সভাপতিত্বে শতকরা ৮০ ভাগ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে তাদের মনোনীত কমিটি চূড়ান্ত করে।[১২১]

---

১২০. মাহবুবউল্লাহ, পূর্বোক্ত, সাক্ষাৎকার, মিয়া সাদেকুর রহমান, রাশেদ খান মেনন ও রণো
১২১. সাক্ষাৎকার, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সাইফুদ্দিন মানিক, মতিয়া চৌধুরী

দুই গ্রুপের কমিটিতেই সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সাইফুদ্দিন মানিকের নাম ছিল। একটির সভাপতি হিসেবে রাশেদ খান মেনন, অপরটির সভানেত্রী মতিয়া চৌধুরী। মানিক ছিলেন মূলতঃ কাজী জাফরের লোক। কিন্তু সাইফুদ্দিন মানিক পড়ে মতিয়া গ্রুপের সঙ্গেই থেকে যান। দুইটি কমিটি হয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মধ্যস্থতা করতে আসেন করাচীর 'ডন' পত্রিকার সংবাদদাতা সিরাজুল হোসেন খান। তাঁর কাকরাইলস্থ বাসভবনে আপোষের চেষ্টা চলে। কিন্তু ব্যর্থ হয় এই বৈঠক। এমনকি ভেঙ্গে যাওয়ার তিন মাস পর্যন্ত এই ঐক্য আলোচনা অব্যাহত ছিল। গাজিউল হকের ফরিদাবাদের বাসায় এবং সুনীল রায়ের সূত্রাপুরের বাসায় অনেক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর সফল হয় না। এই সময় আনোয়ার জাহিদ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'জনতা'ও বড় করে শিরোনাম করেছিল 'দ্বিধাবিভক্ত ছাত্র ইউনিয়নে এখন সবাই ঐক্য চায়।"[১২২]

ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) পরবর্তীকালে সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থক বলে চিহ্নিত হয় এবং ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) চীনের মাও সে তুং-এর গোড়া অনুসারী হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে এই দুই সংগঠনের ব্যবধান ও রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ ও দ্বন্দ্ব আরো বৃদ্ধি পায়। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রশ্নে দুই সংগঠন পরস্পর বিরোধী ভূমিকা নিতে থাকলে এই ব্যবধান আরো বাড়তে থাকে।

১৯৬৫ সালে ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে চীন তাতে পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়ায়। এ ছাড়া ভাসানী ন্যাপের সঙ্গে আইয়ুব খানের ভাল সম্পর্ক থাকায় ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) মাতৃভূমি রক্ষার আওয়াজ তোলে এবং ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। অন্যদিকে মতিয়াপন্থী ছাত্র-ইউনিয়ন যুদ্ধের বিরোধিতা করে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পাক-ভারত বিরোধ নিষ্পত্তির কথা বলে।[১২৩] অবশ্য যখন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব খান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী একটি শান্তি চুক্তি সই করে, তখন পাকিস্তানের জামাত-মুসলিম লীগ প্রমুখ দলসমূহ এর তীব্র বিরোধিতা করলে মেনন ও মতিয়াপন্থী উভয় সংগঠনই তাসখন্দে সইকৃত এই চুক্তিকে সমর্থন করে। জাতীয় প্রশ্নে আওয়ামীলীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ৬ দফা পেশ করলে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) একে সি,আই এ প্রণীত একটি দলিল বলে প্রত্যাখ্যান

১২২. সাক্ষাৎকার, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, মতিউর রহমান, রাশেদ খান মেনন এবং মাহবুবউল্লাহ, পূর্বোক্ত
১২৩. মাহবুবউল্লাহ, পূর্বোক্ত, সাক্ষাৎকার, সাইফুদ্দিন মানিক এবং মতিয়া চৌধুরী

করে। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ৬ দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে একটি ভাল কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করেও একে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে অসম্পূর্ণ বলে ঘোষণা করে।[১২৪]

ভাসানী ন্যাপের সঙ্গে আইয়ুব খানের ভাল সম্পর্ক থাকায় মেননপন্থী ছাত্র ইউনিয়নও এই সময় আইয়ুব খান সম্পর্কে মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

চীন এই সময় জাতিসংঘের সদস্য হতে পারে নি। ফলে জাতিসংঘ বিরোধী একটা মনোভাব তাদের মধ্যে কাজ করতো। মেননপন্থীরা তখন জাতিসংঘ বর্জনের কথা প্রচার করা শুরু করে। অপর দিকে মতিয়াপন্থীরা জাতিসংঘের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করে।[১২৫]

এভাবে ক্রমাগতভাবে ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া ও মেনন গ্রুপ পরস্পর পরস্পরের থেকে অনেক দূরে চলে যেতে থাকে।[১২৬]

বাংলা প্রচলন সপ্তাহ

১৯৬৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই এক সপ্তাহ 'বাংলা প্রচলন সপ্তাহ' পালন করার আহ্বান জানায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ। নিজেদের সাহিত্য, শিল্প ও ভাষাকে সমুন্নত মর্যাদা দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রচার-পত্রসহ অন্যান্য মাধ্যমে ছাত্রলীগ কর্মীরা দেশবাসীর সমর্থন কামনা করে। ফলে সারা প্রদেশে দোকান-পাটের নাম ফলক, গাড়ীর নম্বর পর্যন্ত বাংলায় লেখার একটা উৎসাহ জাগ্রত হয়। এর পরপরই যানবাহনের নম্বর প্লেট বাংলায় লেখা বাধ্যতামূলক করে পূর্ব পাকিস্তানের সংসদে একটি আইন পাশ হয়।[১২৭]

---

১২৪. সাক্ষাৎকার, হায়দার আকবর খান রণো, রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরী, সাইফুদ্দিন মানিকএবং মাহবুবউল্লাহ, পূর্বোক্ত

১২৫. মাহবুবউল্লাহ, পূর্বোক্ত

১২৬. মাও সে তুং-এর মৃত্যুর পর ৮০-র দশকে এই দুই ছাত্র দল আবার মতাদর্শগত দিক থেকে পরস্পরের কাছাকাছি চলে এসেছে। মতিয়াপন্থীদের বর্তমান নাম বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এবং মেননপন্থীদের মধ্যে উপুর্যপুরি ভাঙ্গন ও দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত গ্রুপসমূহের মধ্যে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন উপদলের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বর্তমান বক্তব্যের মধ্যে প্রার্থক্য খুব সামান্য।

১২৭. ঘোষণাপত্র, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, তাসিরউদ্দিন আহমেদ (প্রচার সম্পাদক) কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ (১৯৬৮)

৬ দফার পটভূমি

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক ১৯৬৬ সালে ৬ দফা পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক মহলে, বিশেষভাবে শাসক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কারণ শেখ মুজিব কর্তৃক যে পটভূমিতে ৬ দফা উপস্থাপন করা হয়েছিল তা সমগ্র শাসক এবং তাঁদের লেলিয়ে দেওয়া শোষক সম্প্রদায়কে কাঁপিয়ে তুলেছিল। দিনের পর দিন অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও নিপীড়নের চালচিত্র থেকে ৬ দফা সৃষ্টি হয়েছিল। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বুঝে ফেলেছিল, তাঁরা এবার ধরা পড়ে যাচ্ছেন।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি প্রথম আলোচিত হয়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের এ ব্যাপারে প্রথম অবদান ছিল। অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান, ডঃ মাহমুদ হোসেন প্রমুখগণ প্রথম দুই অঞ্চলের বৈষম্যের পরিসংখ্যান প্রকাশ করে চোখের সামনে দেশবাসীকে এই জাজ্বল্যমান বৈষম্যের কথা তুলে ধরেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানী গোষ্ঠি কর্তৃক সর্বাধিক প্রচারিত বিষয়টি ছিল 'জাতীয় একীভবন নীতি' বাস্তবায়ন সম্পর্কিত। এর মূল বিষয় ছিল দুই পাকিস্তানের মধ্যকার আন্ত:অর্থনৈতিক সর্ম্পকে ভারসাম্য বজায় রাখা। একে তাঁরা 'এক পাকিস্তান অর্থনীতি' তত্ত্ব বলে অর্থনৈতিক সংহতির কথা প্রচার করতেন।

এরই পাশাপাশি ষাটের দশকের পূর্ব থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদদের কাছে দুই পাকিস্তানের মধ্যকার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের মারাত্মক অবনতিশীল পরিস্থিতির চিত্রটি ধরা পড়ে এবং দুই অর্থনীতি তত্ত্বের যৌক্তিক বিশ্বাসের প্রসার তাদের মধ্যে ঘটে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক ও শোষক গোষ্ঠি যে কারণে 'অর্থনৈতিক একতা', 'আঞ্চলিক সহযোগিতা', 'অর্থনৈতিক একীভবন' 'অর্থনীতির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ একীভূতকরণ' ইত্যাদি বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় শব্দগুলি প্রচার করতো--বাঙালী অর্থনীতিবিদরা তারা স্বরূপ উন্মোচন করেন।

এবং এরই ফলে আইয়ুব খান দুই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নতির মাত্রার অসমতা দূর করার বিষয়টি শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালে সাংবিধানিক নীতি হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য এই পর্যন্তই। বরং এরপর থেকে

অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্রা আরো বেড়ে যেতে থাকে যে, এক পর্যায়ে এসে পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে বিচ্ছিন্নতার চিন্তা অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করে।

এ চিন্তা প্রসারের কারণ ছিল অত্যন্ত যৌক্তিক। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকালে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমান ছিল ৮০ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ২০৫ টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নাকি দুই প্রদেশের মাথাপিছু ব্যয়ের বৈষম্য কমানো হয়েছিল। তাতেও দেখা যায় মাথাপিছু পূর্ব পাকিস্তান ১৯০ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ২৯২ টাকা।[১২৮]

১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যয় হয়েছিল ৯৭০ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে ২,১৫০ কোটি টাকা। অথচ আয়ের ক্ষেত্রে দুই প্রদেশের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। বহির্বাণিজ্যে প্রথম দশ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান যেখানে ৪০৭.৬ কোটি টাকার ঋণাত্মক ভারসাম্য ছিল, পূর্ব পাকিস্তানে সেখানে ৪৬৮.৯ কোটি টাকা ধনাত্মক ভারসাম্য বজায় রাখে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেজারীতে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান ২০০ কোটি টাকার বেশী বৈদেশিক মুদ্রা জমা দেয়। এর 'পুরস্কার স্বরূপ' কেন্দ্রীয় সরকার এ সময় প্রতি বছর প্রায় ৪০ কোটি টাকার বিদেশী দ্রব্য আমদানীর ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক ঋণের বোঝা মেটানো হতে থাকলো পূর্ব পাকিস্তানের ধনাত্মক আয় থেকে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি মেটানোর বাজার হিসাবে ব্যবহৃত হয় পূর্ব পাকিস্তান। এ ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদও পাচার হতে থাকে। অর্থনীতিবিদদের মতে ১৯৫৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিবছর পূর্ব অঞ্চল থেকে পশ্চিম অঞ্চলে জাতীয় আয়ের প্রায় ২% পাচার হতো।[১২৯]

এভাবে বছরের পর বছর পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার হয়ে এক মারাত্মক অবস্থার সম্মুখিন হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে এ প্রশ্ন কথা ওঠে। এরই প্রেক্ষিতে শেখ মুজিব

---

১২৮. এস.এস.বারানভ, পূর্ব বাংলা : অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য (১৯৪৭-১৯৭১), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬

১২৯. এস.এস. বারানভ, পূর্বোক্ত

কর্তৃক ৬ দফা উত্থাপিত হয়।[১৩০] একই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ তানী এক সেমিনারে এই পটভূমিতেই সেই ষাটের দশকের প্রথমার্দ্ধে স্বাধীন 'বাঙলাদেশের সম্ভাবনা' শীর্ষক একটি আলোচনা উত্থাপন করলে ব্যাপক

---

১৩০. বাংলাদেশর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে '৬ দফা' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ৬ দফা কোথা থেকে এসেছিল, কে তার রচয়িতা,—এ নিয়ে বিতর্ক আজো শেষ হয়নি। শেখ মুজিব কর্তৃক ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণা করার পর সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তৎকালীন ভাসানী ন্যাপ, চীনপন্থী কমিউনিস্ট গ্রুপ সমূহ এবং ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)। এঁদের মতে, ৬ দফা আসলে প্রণয়ন করেছিল আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা (সি.আই.এ)। লক্ষ্য ছিল, আইয়ুব খানকে বিপাকে ফেলে আরো বেশী ঘনিষ্ঠতা আদায় করা। তবে ৬ দফার জন্ম সম্পর্কে এমন ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি এবং প্রমাণিতও হয় নি।

অনেকে মনে করেন, ৬ দফা আসলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন বাঙালী সি.এস.পি অফিসার, জনাব রুহুল কুদ্দুস, শামসুর রহমান খান, আহমদ ফজলুর রহমান প্রমুখ দ্বারা সৃষ্ট। এই মতেরই একটি অংশ মনে করেন, তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপকসহ অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের যৌথ সৃষ্টি।

ভিন্ন একটি সূত্রের ধারণা, ৬ দফা ভারতের একদল বামপন্থীদের রচনা। তাঁরা তা তৎকালে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা খোকা রায়ের কাছে তুলে দেন। খোকা রায় দেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও পীর হাবিবুর রহমানের কাছে। তাঁদের কাছ থেকে এটা যায় জনাব খায়রুল কবীরের (কৃষি ব্যাংকের প্রাক্তন মহা-ব্যবস্থাপক) হাতে। জনাব কবীর এটা শেখ মুজিবের কাছে পেঁৗছে দেন।

একদল মনে করেন, ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের মূলনীতি নির্ধারক কমিটিতে পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যরা যে সুপারিশ করেছিল ৬ দফা ছিল তারই ভিত্তি।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর আইয়ুব খান কর্তৃক ঢাকায় আহূত সর্বদলীয় সভায় পেশ করার জন্য প্রায় ৫০ জন রাজনীতিবিদ অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীর যৌথ উদ্যোগে রচিত ৭ দফার অবিকল হচ্ছে ৬ দফা। এটা জনাব খায়রুল কবীরই রাজনীতিবিদদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন বলে একটি মত দাবী করেন।

একটি অংশ অবশ্য এ প্রচারণাও চালাত যে, আইয়ুব খানই তাঁর বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠ আলতাফ গওহরকে দিয়ে তা রচনা করান এবং খায়রুল কবীরের হাতে তুলে দেন। উদ্দেশ্য ছিল, এ থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটা।

৬ দফা সম্পর্কে এই পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ও মতামতের কারণে তা আজো রহস্যাবৃত হয়ে আছে।

চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।[১৩১] এ চঞ্চলতা বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজকে নতুন দিক নির্দেশনার দিকে নিয়ে চলে।

ছয় দফার রূপরেখা

প্রস্তাব এক

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রিয় প্রকৃতি

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমনি হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে ফেডারেশন ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি লাহোর প্রস্তাব। আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

প্রস্তাব দুই

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা

কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব তিন

মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে। (ক) সমগ্র দেশের জন্য দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময় যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে। অথবা, বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্য কেবলমাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসূ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের পত্তন করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক ও অর্থ বিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব চার

রাজস্ব, কর ও শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

ফেডারেশনের অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে

১৩১. কাজী আকরাম হোসেন, বায়ান্ন থেকে বাষট্টি : একটি পর্যায়ের উত্তরণ, গৌরবের সমাচার, পৃষ্ঠা-৯৯

প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলির সব রকম করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব পাঁচ

বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে

(খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারধীন থাকবে

(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিই মিটাবে

(ঘ) অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা নিষেধ থাকবে না

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রস্তাব ছয়

আঞ্চলিক বাহিনীর গঠন ক্ষমতা

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।[১৩২]

নববর্ষে প্রথম প্রভাত ফেরী

১৯৬৬ সালের ১৪ এপ্রিল সারাদেশে ঘটা করে নববর্ষ পালিত হয়। ১৯৬৪ সালের পর এই প্রথম আবার নববর্ষকে কেন্দ্র করে এত বড় জনসমাবেশে এবং উৎসাহ উদ্দীপনায় নববর্ষ পালিত হল। ১৯৬৪ সালের (১৩৭১ বাঙলায়) পহেলা বৈশাখ প্রাদেশিক সরকার ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করেছিল। সেদিন

---

১৩২. শেখ মুজিবর রহমান, আমাদের বাঁচার দাবি, ৬ দফা কর্মসূচী, (প্রকাশক, আবদুল মমিন, প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ, ৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-২, পুনর্মুদ্রণ, (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯, মূল্য: ০.২৫ পয়সা)-এ থেকে সংক্ষেপিত

ঢাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। বাঙলা একাডেমিতে ঐকতান গোষ্ঠির অনুষ্ঠানে এত দর্শকৎশ্রোতা ছিল যে, ভীড়ের চাপে অনেকে সংজ্ঞাই হারিয়ে ফেলে। দর্শকদের উৎসাহ এবং সংখ্যার পরিমাণ দেখে কোন কোন পত্রিকা বিস্ময় প্রকাশ করে এ নিয়ে সংবাদ পর্যন্ত পরিবেশন করে।[১৩৩]

এই পটভূমিতে ৬৬ সালে নববর্ষ নতুন উদ্দীপনা ও জঙ্গিপনা নিয়ে পালিত হয়। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া'র) পক্ষ থেকে প্রকাশ্য জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রভাত ফেরী। রাজপথে এতে ছাত্র জনতার ঢল নামে। অভাবিত লোক-সমাবেশ ও প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টির কারণে সরকারও বিচলিত হয়ে ওঠে। এভাবে বাঙালীর নববর্ষ পালনের ইতিহাস এই প্রথম।[১৩৪]

শিক্ষক লাঞ্ছনা

আদালত অবমাননার অভিযোগ এনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ আবু মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। ১৯৬৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী ডঃ মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এই মামলায় জয়লাভ করেন। এই দিনই জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন.এস. এফ-এর) গুণ্ডারা তাকে নির্মম ভাবে প্রহার করলে তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নীত হন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন উভয় গ্রুপ এর বিরুদ্ধে তীব্র জনমত গড়ে তুললে গুণ্ডাদের গভর্ণর হাউজে আশ্রয় দেওয়া হয় এবং সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অস্বীকৃতি জানান। এই সময় অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষক অত্যন্ত লজ্জাকর পিছুটান মনোভাবের পরিচয় দেন। তবে শিক্ষকদের প্রতিবাদ সভাতে জ্বালাময়ী বক্তব্য দেওয়ার অপরাধে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ আব্দুল মতিন চৌধুরীকে ইকবাল হলের (বর্তমান জহুরুল হক হল) প্রভোষ্ট পদ থেকে অপসারণ করা হয়। প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক এসব ঘটনার প্রতিবাদে ঘৃণা ভরে দেশ ত্যাগ করেন।

একুশ : ১৯৬৭

১৯৬৭ সালে শহীদমিনারে একুশের অনুষ্ঠান যৌথভাবে পালিত হয়। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন উভয় গ্রুপ জোটবদ্ধভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ছাত্র ইউনিয়ন

১৩৩. সাইদ-উর-রহমান পূর্ববাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৮৪

১৩৪. পঙ্কজ ভট্টাচার্য, গৌরবের সমাচার

(মতিয়া) নেতা সামসুদ্দোহা তাঁর বক্তৃতায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ করে এবং ভিয়েতনামকে সমর্থন করে বক্তৃতা দিতে থাকলে ছাত্রলীগ থেকে আপত্তি জানানো হয় এবং ছাত্রলীগ প্রতিবাদে সভা ভেঙ্গে দেয়। এক পর্যায়ে ছাত্র লীগ নেতা আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (বর্তমানে মন্ত্রী) ছাত্র ইউনিয়নের সামসুদ্দোহার সার্টের কলার চেপে ধরে।[১৩৫]

তবে এরপরও এবারের একুশের মূল তাৎপর্য ছিল, তিন ছাত্র সংগঠনের (ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), ছাত্রইউনিয়ন (মেনন)---এর যৌথ উদ্যোগে ৯ দফা রচনা। ছাত্র ইউনিয়ন ভাঙ্গার পর মেনন ও মতিয়াপন্থীরা পরস্পর কখনো একই মঞ্চে বা জোটে আসতে চাইতো না। ছাত্রলীগ থেকে তখন এই দুই সংগঠনের মধ্যে মধ্যস্থতা রক্ষা করা হতো। তারই আলোকে এবারের একুশে পালনের পূর্বেই তিন সংগঠন বসে ৯ দফা রচনা করেছিল এবং ঐক্যবদ্ধভাবে একুশে পালনের ব্যাপারে একমত হয়েছিল। ৬৯-এর আন্দোলনের ১১ দফা রচনার পটভূমি হিসাবে এই ৯ দফা রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত।[১৩৬]

রবীন্দ্র সঙ্গীত বিতর্ক

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান--ভারত যুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথকে বেতার ও টেলিভিশনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। যুদ্ধের পর সকল শ্রেণীর মানুষের দাবীর প্রেক্ষিতে সীমিত আকারে প্রচার মাধ্যমে রবীন্দ্র সঙ্গীত চালু হয়।

১৯৬৭ সালের ২০ জুন রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তানের সংসদ অধিবেশনে সরকারী দলের নেতা খান আবদুস সবুর খান তাঁর বক্তৃতায় অনাহূত এক নতুন বিতর্কের সূত্রপাত করেন। তিনি বলেন, ইদানীং পূর্ববাংলায় সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের অশুভ তৎপরতা তিনি উদবেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। পহেলা বৈশাখ ও রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপনের নামে বিদেশী সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করে ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের মূলে আঘাত হানছে।[১৩৭]

১৩৫ সাক্ষাৎকার, নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া,) ১৯৬৯-১৯৭০ এবং সাইফুদ্দিন মানিক, মতিয়া চৌধুরী

১৩৬ সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী

১৩৭ National Assembly of Pakistan, Debates, official Report, জুন, ২০, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা, ১৮০১-২

(মতিয়া) নেতা সামসুদ্দোহা তাঁর বক্তৃতায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ করে এবং ভিয়েতনামকে সমর্থন করে বক্তৃতা দিতে থাকলে ছাত্রলীগ থেকে আপত্তি জানানো হয় এবং ছাত্রলীগ প্রতিবাদে সভা ভেঙ্গে দেয়। এক পর্যায়ে ছাত্র লীগ নেতা আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (বর্তমানে মন্ত্রী) ছাত্র ইউনিয়নের সামসুদ্দোহার সার্টের কলার চেপে ধরে।[১৩৫]

তবে এরপরও এবারের একুশের মূল তাৎপর্য ছিল, তিন ছাত্র সংগঠনের (ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), ছাত্রইউনিয়ন (মেনন)—এর যৌথ উদ্যোগে ৯ দফা রচনা। ছাত্র ইউনিয়ন ভাঙ্গার পর মেনন ও মতিয়াপন্থীরা পরস্পর কখনো একই মঞ্চে বা জোটে আসতে চাইতো না। ছাত্রলীগ থেকে তখন এই দুই সংগঠনের মধ্যে মধ্যস্থতা রক্ষা করা হতো। তারই আলোকে এবারের একুশে পালনের পূর্বেই তিন সংগঠন বসে ৯ দফা রচনা করেছিল এবং ঐক্যবদ্ধভাবে একুশে পালনের ব্যাপারে একমত হয়েছিল। ৬৯-এর আন্দোলনের ১১ দফা রচনার পটভূমি হিসাবে এই ৯ দফা রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত।[১৩৬]

রবীন্দ্র সঙ্গীত বিতর্ক

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান--ভারত যুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথকে বেতার ও টেলিভিশনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। যুদ্ধের পর সকল শ্রেণীর মানুষের দাবীর প্রেক্ষিতে সীমিত আকারে প্রচার মাধ্যমে রবীন্দ্র সঙ্গীত চালু হয়।

১৯৬৭ সালের ২০ জুন রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তানের সংসদ অধিবেশনে সরকারী দলের নেতা খান আবদুস সবুর খান তাঁর বক্তৃতায় অনাহূত এক নতুন বিতর্কের সূত্রপাত করেন। তিনি বলেন, ইদানীং পূর্ববাংলায় সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের অশুভ তৎপরতা তিনি উদবেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। পহেলা বৈশাখ ও রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপনের নামে বিদেশী সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করে ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের মূলে আঘাত হানছে।[১৩৭]

---

১৩৫ সাক্ষাৎকার, নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া,) ১৯৬৯-১৯৭০ এবং সাইফুদ্দিন মানিক, মতিয়া চৌধুরী

১৩৬ সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী

১৩৭ National Assembly of Pakistan, Debates, official Report, জুন, ২০, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা, ১৮০১-২

২২শে জুন সংসদ সদস্য ডঃ আলীম আল রাজীর এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জানান, রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচার যথাসম্ভব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর যে রচনা পাকিস্তানী আদর্শের পরিপন্থী বিবেচিত হবে, সেগুলোর প্রচার ভবিষ্যতে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে।[১৩৮]

এই সময় সবচেয়ে মজার ঘটনার অবতারণা করেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব আবদুল মোনায়েম খান। তিনি ঢাকায় গভর্ণর হাউজে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানবাদী কবি, সাহিত্যিকদের ডেকে রাগতঃস্বরে বলেন, 'কি করেন আপনারা? রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে পারেন না।" কাণ্ডজ্ঞানের সীমাহীনতা দেখে 'ভাড়াটে' বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও সেদিন এই সংলাপে হাস্যরসের সৃষ্টি না করে পারে নি।[১৩৯]

তবে তথ্যমন্ত্রীর তথ্য ঢাকায় সর্বপ্রথম বুদ্ধিজীবী মহলেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এরপর ছাত্রদের মধ্যে। পক্ষে-বিপক্ষে বিবৃতি প্রদান ও সমাবেশ সমানগতিতে চলতে থাকে। এরই প্রেক্ষিতে সংসদে আবার বিষয়টি গরম হাওয়ার সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তানের একজন সংসদ সদস্য এ.কে. সোলায়মান রবীন্দ্র-বিরোধী সংসদ সদস্যদের ঢাকা শহরে পা ফেলার প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করলে সমগ্র পরিষদে এক হটগোলের সৃষ্টি হয়। সংসদ নেতা সবুর খান এই পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বলতে গিয়ে বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রকে চক্রান্তকারী বলে অভিহিত করেন। এক পর্যায়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে "ডঃ রবীন্দ্রনাথ" অভিহিত করে বলেন, তাঁর পক্ষে যারা আন্দোলন করছেন তাঁরা "howling idiot.[১৪০]

সংসদ নেতা সবুর খান ও তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীনের বক্তব্যের পক্ষে বিবৃতি প্রদান করেন এক শ্রেণীর সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী। তাঁরা হলেন আবুল মনসুর আহমদ, ইবরাহিম খাঁ, তালিম হোসেন, ফররুখ আহমদ, ডঃ হাসান জামান, মুজিবুর রহমান খাঁন প্রমুখ।[১৪১] ৩০ জুন মাওলানারাও বিতর্কে অংশ নিয়ে বিবৃতি দেন।

১৩৮ প্রাগুক্ত, জুন ২২ ১৯৬৭, পৃষ্ঠা, ১৯৪০

১৩৯ সানসুদ্দোহা, পূর্বোক্ত

১৪০. National Assembly of Pakistan, Debates, official, জুন, ২৯, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা, ২৩৮১-৮৩

১৪১. দৈনিক আজাদ, ৩০ জুন, ১৯৬৭

তাঁরা বিবৃতিতে বলেন, 'পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই এই সকল সঙ্গীতের আবর্জনা হইতে রেডিও-টেলিভিশনকে পবিত্র রাখা প্রয়োজন ছিল'।[১৪২]

বিষয়টা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে এমনভাবে প্রতিভাত হল যে, যেন রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া বেতার টেলিভিশনের আর সব সঙ্গীত ও নৃত্যই ইসলামের দৃষ্টিতে পবিত্র। ১৯ জন বুদ্ধিজীবী (ডঃ কুদরাত-ই-খুদা, সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদীন, অধ্যাপক আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম, শামসুর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, ডঃ আনিসুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, শাহীদুল্লাহ কায়সার প্রমুখ) এর নিন্দা করে বিপক্ষে বিবৃতি দেন। [১৪৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত করে। একটি বিরাট বিক্ষোভ মিছিল রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

কবি জসিমুদ্দিনের বাসায় ছাত্র, যুব সংস্কৃতি সেবীদের এক সভায় একে প্রতিরোধ করার সংকল্প ঘোষণা করা হয়।

ঢাকা প্রেসক্লাবে সুফিয়া কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও পহেলা বৈশাখকে বাঙালী সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ঘোষণা করা হয়।[১৪৪]

আন্দোলন এভাবে সারাদেশেই দানা বেধে ওঠে। ঢাকা সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ, খুলনায় সংস্কৃতি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। আন্দোলনের জঙ্গীভাব সরকারকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। জুলাই ৪ (১৯৬৭) তথ্যমন্ত্রী জাতীয় পরিষদে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন এবং বিকৃত করে তাঁর বক্তব্য ছাপানোর জন্য সংবাদপত্রসমূহকে দায়ী করেন।[১৪৫]

---

১৪২. দৈনিক আজাদ, ১ জুলাই, ১৯৬৭

১৪৩ দৈনিক আজাদ, ২৮ জুন, ১৯৬৭

১৪৪. পাকিস্তান অবজারভার, ২৫ জুন থেকে ১৩ জুলাই, ১৯৬৭-এর বিভিন্ন সংখ্যা দ্রষ্টব্য

১৪৫. National Assembly of Pakistan, Debates, official report, জুলাই, ৪, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা, ২৬৬৩

ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া চুক্তি)

১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাসে ছাত্র আন্দোলনের দুর্যোগময় মুহূর্তে ঐক্য প্রয়াসের ক্ষীণ চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সবেমাত্র ছাত্র ইউনিয়ন ভেঙ্গেছে এবং তীব্র মতাদর্শগত লড়াই সর্বস্তরে শুরু হয়েছে। আওয়ামী লীগ ছয় দফা দাবী পেশ করলে ছাত্র লীগও এ কর্মসূচীকে মুখ্য করে তোলে।

ডাকসুতে তখন ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) সমর্থিত সহ-সভানেত্রী মাহফুজা খানম ও সাধারণ সম্পাদক মোরশেদ আলী ক্ষমতায়। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সূত্রপাতের উদ্দেশ্যে ছাত্রলীগ-ছাত্রইউনিয়ন (মতিয়া) একটি চুক্তি সম্পাদন করে।

চুক্তি অনুযায়ী ডাকসু পরিচালনায় ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়ার সঙ্গে ছাত্র লীগও অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ছাড়া আন্দোলনগত প্রশ্নে ছাত্রলীগ ছয় দফার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও কৃষক শ্রমিকের কতিপয় দাবী সংযুক্তিতে সম্মত হয়।*

এর পূর্বে ছাত্রলীগ ছয় দফা প্রশ্নে কোনো আপোষে রাজী হতো না। যে কোনো ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী পালনের সময় ছাত্রলীগ থেকে প্রথম শর্ত হিসাবে ছয় দফাকে তুলে ধরা হতো। ফলে এতে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) গ্রুপ সবচেয়ে বিব্রত বোধ করতো। কারণ ছয় দফা প্রশ্নে তাদের দ্বিধা ও আপত্তি ছিল। পক্ষান্তরে ছাত্রলীগ যে কোনো ইস্যুতেই ছয়দফা সমর্থন করাকে ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে দাবী করতো। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) গ্রুপ এ ব্যাপারে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। কারণ তারা ছয় দফাকে একেবারে নাচক করে দেয়নি। শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ কর্মসূচী মনে করতো।[১৪৬]

১৯৬৭ সালে এভাবে ডাকসুতে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) যে চুক্তি সম্পাদন করে তাকে ঐতিহাসিক বলা চলে। কারণ পরবর্তী সময়ে আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলনে ছাত্রদের এগার দফা রচনার ক্ষেত্রে এই চুক্তি একটা প্রাক-কর্মসূচী হিসাবে কাজ করে।

তৃতীয় বিভাগ আন্দোলন

১৯৬৬ সাল পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে তৃতীয় বিভাগ পাওয়া ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারতো। কিন্তু ৬৭ সালে

---

* সাক্ষাৎকার, নূরুল ইসলাম ও সাইফুদ্দিন মানিক

১৪৬. মাহবুবউল্লাহ, পূর্বোক্ত এবং সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, আবদুর রাজ্জাক, রাশেদ খান মেনন

এসে কর্তৃপক্ষ তৃতীয় বিভাগ পাওয়া ছাত্রদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার বন্ধ করে দেন। ন্যূনতম ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। ফলে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ নিয়ে বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে থাকে। ৬৭ সালে ছাত্রদের এ তৃতীয় বিভাগ আন্দোলন এ সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছাত্র আন্দোলনে রূপায়িত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ছাত্ররা কর্তৃপক্ষকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করে।

ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের ধারা

এদেশে ধর্মভিত্তিক ছাত্র আন্দোলনের গোড়াপত্তন পাকিস্তান আমলের শুরু থেকেই। তবে বর্তমান সময়ের ধর্মভিত্তিক ছাত্র আন্দোলনের মতো তা এতো সংগঠিত এবং প্রবল (অন্ততঃ মতাদর্শগত দিক থেকে এতো বেশী সচেতন) পূর্বের সময়ে ছিল না।

পাকিস্তান আমলে ষাটের দশকের শুরুতে মোট তিনটি ছাত্র সংগঠন ধর্মভিত্তিক ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করতো:

১. পাকিস্তান ছাত্র শক্তি
২. জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন.এস.এফ)
৩. ইসলামী ছাত্র সংঘ।

ইসলামী ছাত্র সংঘ

তবে এই তিনের মধ্যে ইসলামী ছাত্র সংঘ ছিল মতাদর্শগত দিক থেকে ভিন্ন রকম ব্যতিক্রম। তারা মূলতঃ ছিল মাওলানা মওদুদী প্রচারিত ইসলামের নতুনতর ব্যাখ্যার অনুসারী। মাওলানা মওদুদী ১৯৪১ সালে লাহোরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর আদর্শ-ভিত্তিক সংগঠন মৌলবাদী জামায়াতে ইসলামী। ১৯৪০ সালে লেখা তাঁর "ইসলামী বিপ্লবের পথ" সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব তৎকালীন রাজনৈতিক মহলে তেমন কোনো সাড়া না জাগালেও পরবর্তীকালে জামায়াতে ইসলামী এবং তার পরবর্তীকালের সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের এটাই ছিল প্রথম ইশতেহার।

১৯৪১--৪৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান আন্দোলনে জামায়াত ইসলামীর ভূমিকা ছিল একেবারেই নিষ্ক্রিয়। ফলে আদর্শগত দিক থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে সে অর্থে কোনো আদর্শগত ইসলামী ছাত্র সংগঠন তখন পর্যন্ত জন্ম নেয় নি। নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ধর্মভিত্তিক ছাত্রসংগঠন হলেও প্রকৃতপক্ষে আদর্শ ভিত্তিক ছিল না।

১৯৪৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর লাহোরে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করে তার আদর্শ ভিত্তিক ছাত্র সংগঠন "ইসলামী জামায়াতে তালাবা'। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের কোনো ছাত্রের সঙ্গে এই সংগঠনের সম্পর্ক ছিল না। ১৯৫১ সালের সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১ জন প্রতিনিধি যোগদান করলেও সে ছিল মাত্র মোহাজের (বিহারী) ছাত্র। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ এদেশের ছাত্র সমাজের সঙ্গে তখন পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর সংযোগ ঘটে উঠতে পারে নি। এবং এই সংকট ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ছিল। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের ইসলামী জামায়াতে তালাবা পূর্ব পাকিস্তানে তার প্রাদেশিক শাখা ইসলামী ছাত্র (তালাবা) সংঘ (জামায়াত) প্রতিষ্ঠা করে। সৈয়দ মোহাম্মদ আলী ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রাদেশিক শাখার প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন।[১৪৭]

পাকিস্তান ছাত্র শক্তি

'৪৭-উত্তর ধর্মভিত্তিক প্রধান দল খেলাফতে রাব্বানী পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিলেন। এই দল উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তানায়ক মাওলানা আজাদ সোবহানীর অনুসারী ছিল। খেলাফতে রাব্বানী পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে তার একটি সাংস্কৃতিক শাখা তমুদ্দুন মজলিশ গঠন করেছিল। ভাষা আন্দোলনের শুরুতে তমুদ্দুন মজলিশ অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

খেলাফতে রব্বানী পার্টি তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে একটি ছাত্র সংগঠন গঠন করেছিল। পাকিস্তান ছাত্রশক্তি ছিল সেই আদর্শেরই অনুসারী। ফরমানউল্লাহ খান ছিলো এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

এন.এস.এফ

১৯৫৫-৫৬ সালে পাকিস্তান ছাত্রশক্তি এক গুরুতর সাংগঠনিক সংকটের সম্মুখিন হয়। এ বছর ছাত্রশক্তি ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের ধারায় প্রথম বিভক্তি টেনে আনে। গঠিত হয় জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (ন্যাশনাল ষ্টুডেন্ট ফেডারেশন)। জনাব এ.আর.ইউসুফ (পরে ব্যারিষ্টার) এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে মোনায়েম খান এই সংগঠন নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার শুরু করলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের কাছে এই সংগঠন দুর্ধর্ষ এন.এস. এফ (N.S.F) বলে পরিচিতি লাভ করে।

---

১৪৭. সাক্ষাৎকার, মতিউর রহমান নিজামী

ষাটের দশকে এসে ছাত্রশক্তিতে আরো এক ধাপ ভাঙ্গন দেখা দেয়। যেহেতু পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে খেলাফতে রাব্বানী পার্টির নেতৃত্বে এসেছিলেন আবুল হাশিমের মতো প্রগতিশীল মুসলিম চিন্তাবিদেরা, সেহেতু এর স্পর্শ ছাত্র-শক্তিতেও পড়ে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি ৬৫-৬৬ সালে ছাত্রশক্তি রফিকুল ইসলাম (পরে ব্যারিষ্টার, বর্তমানে বি.এন.পি নেতা)-এর নেতৃত্বে ইসলামপন্থী এবং আনিসুর রহমান-এর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রীপন্থী বলে দুই ভাগে আবার বিভক্ত হয়ে পড়ে।

তালাবায়ে আরাবিয়া

প্রচলিত ছাত্র আন্দোলনের ধারার বাইরে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া সংগঠনটি ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। এটি মূলতঃ ছিল মাদ্রাসা ছাত্রদের সংগঠন। জমিয়তে (সংস্থা বা সংগঠন) তালাবায়ে (ছাত্র) আরাবিয়া (আরবীর) ছিল পাকিস্তান-পূর্ব একটি সংগঠন। মাওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন এর প্রথম সভাপতি। পাকিস্তান আন্দোলনে এই সংগঠনের অবদান ছিল অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিশাল। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তালাবায়ে আরাবিয়ার মূল নেতৃত্বে ছিল পাকিস্তান নেজামে ইসলামের সমর্থক মাদ্রাসা ছাত্রনেতৃবৃন্দ। তালাবায়ে আরাবিয়া যদিও সরাসরি কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল না, তথাপি প্রতি বছর সম্মেলনে কমিটি গঠন নিয়ে মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলাম দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো।

১৯৬২ সালের পর তালাবায়ে আরাবিয়ার নেতৃত্বে আসে জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মীরা। ৬২ সালের ডিসেম্বর অথবা ৬৩-র জানুয়ারীর মাঝামাঝি সময়ে তালাবায়ে আরাবিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে ঢাকায় এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে। এই সময় মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রচলিত শিক্ষানীতির আওতায় বেশ কতকগুলি সঙ্কটের সম্মুখিন হয়। মাদ্রাসার ছাত্রদের তখন কলেজে ভর্তির সুযোগ ছিল সীমিত। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আইনে তখন পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ ধরা হতো না। এসব সমস্যার প্রেক্ষিতে সারাদেশের মাদ্রাসার ছাত্ররা এক ব্যাপক মাদ্রাসার ছাত্রদের আন্দোলনের সূচনা করে এবং বেশ কিছু দাবী আদায় করে নিতে সক্ষম হয়।

মূলধারা

তবে 'জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান' পরিচালিত ইসলামী ছাত্র সংঘই পাকিস্তানের চলমান ছাত্র আন্দোলনে ইসলামী ধারায় প্রধান বাহন হয়ে ওঠে। তৎকালীন

পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষবাদী, সমাজতন্ত্রী এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন সমূহে বিপুল জনপ্রিয়তার বিপরীতে এবং এই ধারাকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ইসলামী ছাত্রসংঘ ছিল অত্যন্ত মারমুখী। বিভিন্ন সরকার-বিরোধী আন্দোলন যাতে প্রগতি-পন্থীদের হাতে চলে না যায় তার জন্য ছাত্রসংঘ ছিল সর্বদাই সোচ্চার।*

পাকিস্তান আমলে ইসলামপন্থী এইসব ছাত্র সংগঠন শেষ পর্যন্ত একে একে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তবে এর মধ্যে ইসলামী ছাত্র সংঘ প্রবল প্রতাপ নিয়ে ছাত্র আন্দোলনে আবির্ভূত হয়। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের মধ্যে বাঙালী জাতীয়তাবাদ, স্বায়ত্বশাসন, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের যে চেতনার বহ্নি ধিকি ধিকি করে জ্বলে উঠতে ছিল ইসলামী ছাত্র সংঘ তার বিপরীতে একটি ধারা সৃষ্টিতে অগ্রসর হতে থাকে।

৬৯ সালের আইয়ুব বিরোধী প্রবল আন্দোলনে ছাত্রদের ১১ দফার বিপরীতে ইসলামী ছাত্র সংঘ হাজির করে ৮ দফা। ফলে প্রচলিত ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে এদের বিভিন্ন স্থানে এসময় সংঘর্ষ বেধে উঠে। কোথাও কোথাও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করতে থাকে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

আইয়ুব খান তাঁর গোপন গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে এ সত্য উপলব্ধি করছিলেন যে, অন্ততঃ পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। উপায়ন্তর না দেখে শাসকগোষ্ঠি নতুন চাল দিতে শুরু করে। তারই পটভূমি হিসাবে খুলনার এক জনসভায় (৩১, ডিসেম্বর ৬৮) বক্তৃতা দিতে গিয়ে আইয়ুব খান আওয়ামী লীগ ও ন্যাপকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে ঘোষণা করেন (দৈনিক পাকিস্তান : ১ জানুয়ারী ৬৮)।

এরপর জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে কয়েক দফা ঘোষণায় কেন্দ্রীয় সরকার এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করে জানায়, পূর্ব বাঙলায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করার একটি চেষ্টা তাঁরা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এজন্য কয়েকজন বাঙালী সামরিক অফিসার, সাধারণ সৈনিক এবং সি. এস. পি অফিসার সহ মোট ৩৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে এই পরিকল্পনার হোতা বলে উল্লেখ করা হয়। 'রাষ্ট্রদ্রোহী' শেখ মুজিবকে

*ভূঁইয়া মনোয়ার কবীর, জামাতে ইসলামী ও ছাত্র রাজনীতি, নিরীক্ষা/১৯, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬

১৭ জানুয়ারী (১৯৬৮) বেকসুর খালাস প্রদান করে পুনরায় তাৎক্ষণিকভাবে সামরিক বিধির আওতায় জেল গেটেই আবার ১৮ জানুয়ারী গ্রেফতার করা হয়। ১৯ জুন (১৯৬৮) দেশী-বিদেশী সাংবাদিক ও টেলিভিশন প্রতিনিধিদের সামনে কড়া নিরাপত্তায় কুর্মিটোলা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে বিচার কার্য শুরু হয়। সরকার এ ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করলেও গোপনীয়তা পালন করেনি। তাঁরা ভেবেছিলেন সংবাদপত্রে এসব বিষয় পড়ে সাধারণ মানুষ শেখ মুজিবের উপর রুষ্ট হয়ে পড়বে এবং তাঁর রাজনৈতিক অপমৃত্যু ঘটবে।

কিন্তু ফল হয় উল্টো। স্কুল-কলেজ, রেস্তোরায়, মাঠে, ঘাটে, ময়দানে এই কুখ্যাত সাজানো মামলা সর্বত্র এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। মামলা দায়ের করার পরপরই ১৯ জানুয়ারী ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করে। মিছিলের পর মিছিল ছাত্র-জনতা রাজপথ প্রকম্পিত করে তোলে। বন্দীদের মুক্তি দাবী প্রধান শ্লোগানে পরিণত হয়। "কুর্মিটোলা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে যখন চলছিলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের প্রহসন, বাইরে তখন আগুনের ফুলকি হয়ে জ্বলছিলো মানুষের বিক্ষোভ। মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত রাজপথ, ছাত্রদের সভা-সমিতি এবং বুকফাটা শ্লোগানে প্রতিবাদের ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে পৌঁছে যায় গ্রামে-গঞ্জে। ১৪৪ ধারা জারি, গুলি, নির্যাতন, গ্রেফতার সেই তোপের মুখে ফুৎকারে উড়ে যায়। সরকার যতই ঘোষণা করে যে বিচ্ছিন্নতা-বাদীরা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় ততই ফুঁসে ওঠে মানুষ। খুলে ফেলতে চায় ধোকাবাজ, প্রতারক লুটেরা শাসকের মুখোশ। পয়ষট্টির যুদ্ধে পূর্ববাংলার মানুষ নিজেদের শোচনীয় অসহায়ত্বের কথা বুঝতে পেরেও জাতীয় সংহতির প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেনি। আজ সংহতির প্রশ্ন ওঠে কেন? শুধু ইসলামের নামে সংহতি টিকিয়ে রাখা যায় না। মানুষ চায় সমান অধিকার। চায় কড়ায়-গণ্ডায় ন্যায্য পাওনার হিসেব।"[১৪৮]

ভাষা সংস্কার পুনঃ চেষ্টা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিষদ (একাডেমিক কাউন্সিল) নতুন করে আবার বাঙলা ভাষা সংস্কার করার জন্য ডঃ শহীদুল্লাহকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। ১৯৬৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী এই কমিটির সুপারিশ গৃহীত

১৪৮. সেলিনা হোসেন, উনসত্তরের গণ আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা, ১৯৮৫

হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ৩ আগষ্ট ডঃ কাজী দীন মুহম্মদকে আহ্বায়ক করে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়।

একথা এখনো রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে যে, ডঃ শহীদুল্লাহ কেমন করে পাকিস্তানী মহল চক্রের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্তানে আবার এনিয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

এই ভাষা সংস্কার কমিটির সদস্য ডঃ এনামুল হক, অধ্যাপক আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী এই প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবী আবুল কালাম শামসুদ্দীন, তালিম হোসেন প্রমুখরা বরাবরের মতো এবারও সমর্থন করে বিবৃতি দেন।[১৪৯]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। সর্বদলীয় ছাত্র সমাজের সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে ডাকসু ১২ আগষ্ট তার ব্যাপক প্রতিবাদের সূচনা করে।[১৫০]

'পাকিস্তানী ভাষা'

১৯৬৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকায় নজরুল একাডেমীতে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব আবারো পাকিস্তানের আন্ত:ভাষা সমন্বয়ে একটি নতুন জাতীয় পাকিস্তানী ভাষা সৃষ্টির আহ্বান জানান। প্রেসিডেণ্ট অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর লেখা গ্রন্থেও।[১৫১] তাঁর পুত্র ক্যাপটেন গওহর আইয়ুব একই উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগে চিঠি প্রকাশ করেন। তিনি এই লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বাঙলা বাধ্যতা-মূলক শিক্ষার প্রস্তাব করেন।[১৫২] এর পক্ষে-বিপক্ষে অনেক দিন ধরেই বিতর্ক চলতে থাকে।

ছাত্র সংগঠনগুলি এর প্রতিবাদ জানায়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন বিবৃতি দিয়ে এ ধরণের অপচেষ্টার নিন্দা করে।[১৫৩]

---

১৪৯. দৈনিক পাকিস্তান, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮
১৫০. দৈনিক সংবাদ, ১৩ আগষ্ট, ১৯৬৮
১৫১. এ ব্যাপারে আরো দেখুন, আইয়ুব খান, প্রভু নয় বন্ধু, পৃষ্ঠা, ১১২
১৫২. পাকিস্তান অবজারভার, ২৭, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮
১৫৩. দৈনিক আজাদ, অক্টোবর ৩-২১, ১৯৬৮

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় নতুন এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তাঁরা বাঙলাকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ৪৮ এবং ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় এই বিতর্ক উঠেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে 'অন্যতম রাষ্ট্রভাষা' হিসাবে বাঙলার স্বীকৃতির দাবী জানানো হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের পর ১৯৬৮ সালে এসে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ আবার 'একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' হিসাবে বাঙলার স্বীকৃতির দাবী করে।

পাচপার্তু'র জীবনাবসান

জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন, এস, এফ)-এর নেতা সাইদুর রহমান 'পাচপার্তু' হিসাবে পরিচিত ছিল। 'সাইদুর রহমান' নাম থেকে এ খেতাবে সে কেন ভূষিত হয়েছিল তার বিবরণ দিতে সমকালীন একজন ছাত্রনেতা বলেন, "সাইদুর রহমান যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে তখন সে স্নাতক (পাস) কোর্সের দ্বিতীয় পর্বের ছাত্র ছিল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন পাস কোর্স চালু ছিল)। আমরা যারা স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় পর্বের ছাত্র ছিলাম, আমাদের কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আমি এম, এ পার্টটুতে পড়াশুনা করি (M.A. Part II)। সাইদুর রহমান তারই অনুকরণ করে বলতো সে (Pass Part II)-এর ছাত্র অর্থাৎ 'পাস-পার্ট-টু' থেকে 'পাচপার্তু'-এ ধ্বনিগত রূপান্তর ঘটে। তার এ বলার কায়দা নিয়ে সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ হাস্য-রোলের সৃষ্টি হতো।[১৫৪]

পাচপার্তু এতো বড় দুর্বৃত্ত হয়ে পড়েছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ১৫ অক্টোবর (১৯৬৮) সলিমুল্লাহ হলে স্নাতকোত্তর শেষ পর্বের পরীক্ষার্থী বিদায়ী ছাত্রদের সম্মানে আয়োজিত ভোজের পর একটি দুর্ঘটনা ঘটে। "এন, এস, এফ-র বাহিনী সব মুসলিম হলে জড়ো হয়েছিল নি:খরচায় রোষ্ট খাবার উদ্দেশ্যে। এর কিছুদিন আগে অর্থনীতি বিভাগের কৃতি ছাত্র রেজোয়ানুল ইসলাম (বর্তমানে ডঃ রেজওয়ানুল ইসলাম) ও খালেদকে এন, এস, এফ-এর জনৈক কর্মী মারধোর করেছিল। এরা উভয়েই ছিলো ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক। এনিয়ে ক্যাম্পাসে বেশ কিছুদিন ধরে উত্তেজনা চলছিল।"[১৫৫]

---

১৫৪. সাক্ষাৎকার, নূরুল ইসলাম (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন [মতিয়া], ১৯৬৯-৭০)

১৫৫. মাহবুবউল্লাহ, পূর্বোক্ত

এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে পাচপার্তু ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হয়। আর এর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় এন, এস, এফ-এর তাণ্ডব। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পতিত হয়। ১৮ অক্টোবর ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক সেমিনারে উপাচার্য ডঃ ওসমান গণি বক্তৃতা করার সময় জমির আলীর নেতৃত্বে এন, এস, এফ-এর একদল, উপাচার্য থেকে মাইকের মাউথ স্পীচ কেড়ে নেয় এবং ত্রাস সৃষ্টিকারী উত্তেজনাকর বক্তৃতা দিতে শুরু করে। এমন অবনতিকর পরিস্থিতির মধ্যে ২২ অক্টোবর হাসপাতালে এন, এস,এফ-এর দপ্তর সম্পাদক পাচপার্তু ভবলীলা সাঙ্গ করে। পরিস্থিতি এই অবস্থায় চরম আকার ধারণ করলে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। ২৩ অক্টোবর এন, এস, এফ কেন্দ্রীয় সংসদ সাইফুল্লাহ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপাচার্য ডঃ গণির পদত্যাগ দাবী করা হয় (বিরোধী ছাত্র সংগঠনসমূহ চৌষট্টি সাল থেকেই তাঁর পদত্যাগ দাবী করে আসছিল)। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তৃতা করে এন, এস, এফ নেতা মাহবুবুল হক দোলন, জাহাঙ্গীর ফয়েজ আবু সুফীয়ান প্রমুখ।

উন্নয়ন-দশক বনাম কাল-দশক

আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেছিলেন ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর। ১৯৬৭ সালের ২৭ অক্টোবর থেকে তাঁর রাজত্বের দশ বছর শুরু এবং ১৯৬৮ সালের ২৭ অক্টোবর দশ বছর পূর্তি হয়। ৬৭ সালের ২৭ অক্টোবর থেকে এক বছর ব্যাপী অনুষ্ঠানের বিরামহীন প্রচার চলে উন্নয়নের 'অভাবনীয় সাফল্যের' উপর। পশ্চিম পাকিস্তানে এর ব্যাপক সাড়া মেলে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে সমগ্র অনুষ্ঠানটিই আরোপিত এবং প্রাণহীন অবস্থায় এগিয়ে চলে (যদিও সরকারী উদ্যোগে আড়ম্বরের কোনো ঘাটতি ছিলনা)।

সরকারী প্রচার মাধ্যমের বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল, কবি ইকবাল যে স্বপ্ন দেখে-ছিলেন, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যার ভিত গেঁথেছিলেন, সেই পাকিস্তানের সার্থক স্থপতি হলেন ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান। জাতীয় দৈনিক, বেতার, টেলিভিশন, লেফাফা, ষ্ট্যাম্প, টেলিগ্রাম, মানি অর্ডার ফরম ইত্যাদিতে বাড়াবাড়ি রকম প্রচার-প্রচারণা শুরু করা হয়। ৬৮ সালের ২৭ অক্টোবরের করাচীর বিখ্যাত 'ডন' পত্রিকায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্টের ছবি ছাপানো হয় ১০১ বার। 'ভাড়াটে' বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে ঘন ঘন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন

করা হয়।[১৫৬] পাকিস্তান কাউন্সিলের ঢাকা শাখার এমনি এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক মন্তব্য করেন, 'আইয়ুব খান হলেন আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ'।[১৫৭]

সব মিলিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে এই উৎসব এক নৈরাশ্য ও হতাশার ছাপ ফেলে। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় উন্নয়ন এই অঞ্চলে আকাশ-পাতাল ব্যবধান গড়ে তোলে।[১৫৮] কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে পশ্চিম অঞ্চলের মরুভূমিতে খাল খনন করা হয়, কিন্তু পূর্ব অঞ্চলের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ন্যূনতম পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়নি। সরকারের কোনো কেন্দ্রীয় দফতরই পূর্ব পাকিস্তানে ছিল না। সুতরাং "মিথ্যা অতিরঞ্জিত তথ্য প্রকাশই এই অনুষ্ঠানের ভিত্তি। বশংবদ ভৃত্যের দল সমস্ত কাজ বাদ দিয়ে এই পর্বের অয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বক্তৃতা, বিবৃতি তো আছেই, সরকারী কাগজ-পত্র, লেফাফা-ষ্ট্যাম্প, টেলিগ্রাম, মনিঅর্ডার ফরম ইত্যাদি সবার মাথায় উন্নয়ন দশকের ছাপ বসায়ে দেওয়া হল। অফিস-আদালত, দালান-কোঠা, ট্রেন, বাস এমনকি মানুষের বুকে পিঠে এই ছাপ লাগায়ে দেওয়া হল। রেডিও-টেলিভিশন খোলা যায় না—বিসমিল্লাতেই আয়ুবের নাম উচ্চারণ করে শুরু করা হয় নির্লজ্জ প্রচারের তুবড়ি"।[১৫৯]

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা একে এ দেশের জনগনের বিরুদ্ধে এক পৈশাচিক বিদ্রূপ বলেই গ্রহণ করে। ছাত্র সমাজ ও রাজনৈতিক মহল এই উন্নয়ন দশকের নতুন নামকরণ করে "স্বৈরাচারের কাল দশক।"[১৬০]

পশ্চিমেও আন্দোলনের আওয়াজ

বাষট্টি থেকে প্রায় প্রতিটি দিন, প্রতিটি মাস কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক আবহাওয়া গরমই ছিল। পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তান ছিল অপেক্ষাকৃত শান্ত এবং নরম। কিন্তু ৬৮ সালের শেষ পাদে সেখানেও ঝড়ের পূর্বাভাষ লক্ষ্য করা যায়।

---

১৫৬. সাইদ-উর-রহমান, পূর্বোক্ত
১৫৭. পাকিস্তান অবজারভার, ১২ আগষ্ট, ১৯৬৮
১৫৮. এই বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, এই গ্রন্থেরই '৬ দফার পটভূমি অধ্যায়'
১৫৯. আতাউর রহমান খান, স্বৈরাচারের দশ বছর, পৃষ্ঠা, ৪২৩
১৬০. সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, তোফায়েল আহমেদ, সাইফুদ্দিন মানিক, নুরুল ইসলাম

তবে পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্রদের এই আন্দোলন শুরুর বিষয়টা একেবারেই নেতিমূলক। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে লাণ্ডিকোটালের কাছে ৭০ জন ছাত্র বিপুল পরিমাণ চোরাচালানী দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে ফেরার সময় পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। ৬ নভেম্বর সেখানকার ছাত্ররা এর প্রতিবাদ করার কর্মসূচী ঘোষণা করে। ৭ নভেম্বর রাওয়ালপিণ্ডির পলেটেকনিক ইনিষ্টিউটের ছাত্ররা জুলফিকার আলী ভূট্টোকে তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানালে পুলিশ বাধা দেয় (ভুট্টো ইতোমধ্যে আইয়ুবের মন্ত্রীসভা থেকে বহিস্কৃত অথবা বিদায় নিয়েছিলেন)। এই দুটি ঘটনা সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তান জুড়ে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করে এবং বিক্ষোভ প্রকাশকালে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে (আবদুল হামিদ নামে) একজন পলেটেকনিকের ছাত্র নিহত হয়। প্রতিবাদে শহরের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার সরকার সমগ্র স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীকে ডাকতে হয়। তাতেও কাজ না হওয়ায় সান্ধ্য আইন জারী করে সরকার আন্দোলনের মোড় ঘুরাতে চায়। কিন্তু ৯ নভেম্বর বিনাকারণে আরো দুজন পথচারী নিহত হলে ছাত্রদের উত্তেজনা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকল বড় বড় শহরেই ছড়িয়ে পড়ে। ১০ নভেম্বর আইয়ুব খান পেশোয়ার সফরে গেলে রাস্তাতেই ছাত্র বিক্ষোভকারীদের সামনে পড়ে যান। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে অনুষ্ঠিত সভায় আইয়ুব বক্তৃতা দিতে উঠলে হাসিম উমর যাই নামক একজন ছাত্র তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এতে সভা পণ্ড হয়ে যায় এবং বক্তৃতা না দিয়েই আইয়ুব খানকে চলে যেতে হয়।[১৬১]

পশ্চিম পাকিস্তানে এই ছাত্র আন্দোলন এই পর্যায়ে শেষ হয়ে যায়। যদিও ছাত্ররা এরই মধ্যে আন্দোলনগত প্রশ্নে কতকগুলি শিক্ষা বিষয়ক দাবীও যুক্ত করেছিল, তথাপি পশ্চিমের ছাত্ররা সরকারের সঙ্গে আপোষ আলোচনায় যোগ দেয়। ছাত্ররা সরকারের দেওয়া শর্ত মেনে নেয় যে, আপোষ আলোচনা অব্যাহত থাকবে এবং এই সময় নতুন কোনো সংগ্রামের ডাক ছাত্ররা দেবে না।

এবং এর ফলে ছাত্রদের উত্তেজিত করার দায়ে গ্রেফতারকৃত রাজবন্দী, ন্যাপ নেতা খান আবদুল ওয়ালী খান এবং নবাগত জুলফিকার আলী ভূট্টোর মুক্তির ব্যাপারটি আপাতত: চাপা পড়ে যায়। তবে আইয়ুব খানকে গুলি করার অপরাধে গ্রেফতার-

১৬১. মাহফুজউল্লাহ, অভ্যুত্থানের উনসত্তর, ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৩

কৃত ছাত্র হাসিম উমর যাই পুলিশের কাছে তার জবানবন্দীতে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, দীর্ঘদিন জনগণকে নির্যাতনকারী অত্যাচারীকে খুন করতে না পেরে সে দুঃখিত।[১৬২]

পশ্চিম পাকিস্তানে এই ছাত্র নির্যাতন এবং নিবর্তনমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ আরো অতিরিক্ত একটি ইস্যু পেয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে সংগ্রামী ছাত্র সমাজের আহ্বানে ১৯ নভেম্বর (১৯৬৮) বিকালে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এক ছাত্রগণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। মোট তিনটি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এতে বক্তৃতা করে। সভাপতিত্ব করেছিলো ডাকসু সদস্য মফিজুর রহমান। ছাত্রসভায় জাগন্নাথ কলেজের ছাত্র নাজমুল আলম খান, ছাত্রলীগ নেতা আবদুর রব এবং ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ডাকসুর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদ আলী বক্তৃতা করেন। সভা শেষে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ১৯ নভেম্বর ইসলামী ছাত্র সংঘ কার্যালয়েও এক প্রতিবাদ সভা আবদুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে অব্যাহত ছাত্র নির্যাতনের প্রতিবাদ করে সেখানে একটি প্রস্তাবও পাশ হয়।[১৬৩]

২৬ নভেম্বর (১৯৬৮) পশ্চিম পাকিস্তানের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবার খুললে ছাত্ররা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল বের করে। কিন্তু পুলিশ এতেও গুলি চালায় এবং একজন পথচারী নিহত হয়। এর প্রতিবাদে ২৯ নভেম্বর রাওয়ালপিণ্ডিতে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান করা হলেও সারা পাকিস্তান জুড়েই কর্মসূচী পালিত হয়। কোথাও কোথাও পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্ররা পেশোয়ারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের তথ্য কেন্দ্র তছনছ করে দেয়। ছাত্র ও শ্রমিকরা এক পর্যায়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে দুটি থানায় আগুন পর্যন্ত লাগিয়ে দেয়। এ সময় তাঁরা প্রেসিডেন্টের গ্রীষ্মকালীন বাসভবন ও মুসলিম লীগ (কনভেনশন) অফিসেও আগুন লাগায় ও তছনছ করে দেয়।

সমকালীন রাজনৈতিক দলসমূহ

প্রধান বিরোধীদল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা ও অন্যান্য প্রশ্নে ভাগ হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের যে অংশ ৬ দফা সমর্থন করতেন

১৬২. পাকিস্তান অবজারভার, ১১ নভেম্বর ১৯৬৮
১৬৩. দৈনিক পাকিস্তান, ২০ নভেম্বর, ১৯৬৮

না তাঁরা আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান, খন্দকার মোশতাক প্রমুখের নেতৃত্বে পি, ডি, এম (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট)-এ থেকে যায়। তাঁরা আওয়ামী লীগ (পি, ডি, এম পন্থী) বলে পরিচিতি লাভ করে।

অপর অংশ শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলামর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ (৬ দফা পন্থী) হিসাবে পি, ডি, এম থেকে বেরিয়ে এসে সাংগঠিনভাবে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা প্রশ্নসহ অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে মতানৈক্য হওয়ায় ১৯৫৭ সালে মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা খান আবদুল ওয়ালী খানের সঙ্গে জোট বেধে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (N.A.P) গঠন করেন। দৈনিক ইত্তেফাক তখন ন্যাপকে Nehru Aided Party (N.A.P) বলে গালি দিয়েছিল।

প্রধানত আন্তর্জাতিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে যখন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন এবং পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে যায় তখনো ন্যাপ ভাঙ্গে নি। ন্যাপ ভাঙ্গে অনেক পরে। কতক জাতীয় প্রশ্নে যখন মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন ওয়ালী খানের নেতৃত্বে একদল সম্মেলন ডাকার জন্য রিকুইজিশন দেয়। ফলে ন্যাপ (ওয়ালী) পরবর্তী সময় ন্যাপ (রিকুইজিশনপন্থী) বলে পরিচিতি লাভ করে।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের পর ন্যাপ (ভাসানী) তাঁকে সমর্থনের পক্ষে আগায়। ১৯৬৩ সালে যখন পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল ছাত্র আন্দোলন ও বিস্ফোরণ-ন্মোখ পরিস্থিতি তখন মাওলানা ভাসানী আইয়ুব কর্তৃক মনোনীত হয়ে সরকারী দলের নেতা হিসাবে চীন সফর করেন।[১৬৪] সফরকালে চীনা নেতা মাও সে তুং মাওলানা ভাসানীকে আইয়ুব খানকে বিরোধিতা না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মাও সে তুং মাওলানাকে বলেন,

"You are our frinds and if at the present moment you continue your struggle against the Ayub government it will only strengthen the hand of Russia, America and India. It is against

---

১৬৪. The Times (London) 4th Dec. 1963, quoted in Rangalal sen, Political Elites in Bangladesh, UPL, Dhaka, 1986, P. 48-49.

our principles to intarfear with your work, but we would advice you to proceed slowly and carefully. Give us a chance to deepen our friendship with your goverment.[১৬৫]

(আপনি আমাদের বন্ধু এবং যদি এই মুহূর্তে আপনি আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে আপনার সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন তাতে শুধু রাশিয়া, আমেরিকা এবং ভারতের হাতই শক্তিশালী হবে। আপনার কাজে হস্তক্ষেপ করা আমাদের নীতিবিরুদ্ধ তথাপি আমরা আপনাকে সাবধানে এবং ধীরগতিতে আন্দোলনে অগ্রসর হ'তে অনুরোধ করবো। আপনার সরকারের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব আরো গাঢ় করার সুযোগ দিন)।

এছাড়া ১৯৬৩ সালেই আইয়ুব খান ও মাওলানা ভাসানীর এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকের পর থেকে মাওলানা প্রকৃতপক্ষে সরকার বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণে তীব্র অনীহা প্রকাশ করতেন এবং বিরত থাকতেন। কালক্রমে এই প্রবণতাতেই ন্যাপ (ভাসানী) আইয়ুব খানের গদী রক্ষার সহায়ক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।[১৬৬] সেইজন্য ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে আইয়ুবকে সমর্থন দানের পর থেকে ভাসানী ন্যাপ কোন ব্যাপক আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করেনি। ৬ দফার পাশাপাশি ন্যাপ ১৪ দফা কর্মসূচী উত্থাপন করলেও আন্দোলন নিয়ে খুব বেশী দূর এগোয়নি।[১৬৭] অবশ্য শুধু ন্যাপ (ভাসানী) নয়, তার সহযোগী সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন), শ্রমিক ফেডারেশন, এমন কি 'চীনপন্থী' কমিউনিস্ট পার্টি ও তার বিভিন্ন উপদলসমূহ (এঁরা মাও সে তুং-এর চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিল) পর্যন্ত এ রোগে আক্রান্ত হয়ে (Don't disturb Ayub) নীতিকে শিরোধার্য করে নেয়। তাঁদের এ রণনীতি ও রণকৌশল ৬৮-র শেষ পাদে আইয়ুব খানের গদী নড়ে ওঠার আগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

রাজনৈতিকভাবে আইয়ুব খানের দমননীতিকে মোকাবেলা করার মত দল পাকিস্তানে ছিল না। ১৯৬৫ সালে সকল বিরোধী দল মিলে পাকিস্তানের 'জাতির পিতা' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী করে সমগ্র

---

১৬৫. Tariq Ali, Pakistan : Military Role of or peoples power (New york, william Morrow and company, Inc). 1970, P-150.

১৬৬. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি পৃষ্ঠা-৩৬৬

১৬৭. মাহফুজউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা, ৫৭-৫৮

দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বটে, কিন্তু ভোট দেওয়ার মালিক যেহেতু ছিল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানরা সেহেতু জনগণের তাতে করার কিছু ছিল না। তবু আইয়ুব খান-ফাতেমা জিন্নাহর লড়াই পূর্ব পাকিস্তানে বেশ ভাল ফলই এনে দিয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানে ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান পেয়েছিলেন ২১,০১২ ভোট আর মিস্ ফাতেমা জিন্নাহ ১৮,৪৩৪ ভোট। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব খান ২৮,৯৩৯ ভোট আর মিস্ ফাতেমা জিন্নাহ ১০,২৫৭ ভোট পেয়েছিলেন।[১৬৮] ভোটের ফলাফলে পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৩০০০ ভোটের পার্থক্য। তাও আইয়ুব খানকে অনেক ভয়-ভীতিতে ও প্রলোভনের বিনিময়ে কিনে নিতে হয়েছিল। যদিও ভোটার ছিল মাত্র ৮০,০০০ (আশি হাজার) মৌলিক গণতন্ত্রীর, সারাদেশের জনগণের তাতে করার কিছুই ছিল না।

এই ফলাফলের মধ্য দিয়েই আইয়ুব খানের পা থেকে মাটি সরে যাওয়ার ইঙ্গিত অন্ততঃ পূর্ব পাকিস্তানে তখনই ধ্বনিত হয়েছিল এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

কিন্তু সম্মিলিত বিরোধী দল তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। ৬৯-এ সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ১১ দফা ঘোষণার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিভিন্ন রকম দাবী-দাওয়া নিয়ে বিভিন্ন বিরোধী দল নানারকম দফা নিয়ে রাজনৈতিক ময়দানে ছিল :

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (ডাক)-এর (আওয়ামী লীগ, ওয়ালী ন্যাপ, পি,ডি,এম,ও জামাতের সমন্বয়ে ডাক গঠিত হয়েছিল)	---৮ দফা
আওয়ামী লীগের নিজস্ব	--- ৬ দফা
ন্যাপ (ভাসানীর)	--- ১৪ দফা
ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ	--- ৮ দফা

বিভিন্ন জোট গঠন করে আন্দোলনের উদ্যোগ ছিল কিন্তু সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে না উঠতে পারায় তা সফল হয় না। এমন একটা অবস্থায় রাজনৈতিক দল-গুলোর অবস্থা ছিল সঙ্গীন। দল হিসাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান জুড়ে একমাত্র বড় দল ছিল ওয়ালী ন্যাপ। পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের নেতা ছিলেন অধ্যাপক মোজফফর আহমদ। আওয়ামী লীগ ও ভাসানী ন্যাপ ছিল মূলতঃ আঞ্চলিক দল। পূর্ব পাকিস্তান ছিল মূল ঘাটি। ভুট্টোর পিপলস পার্টিও তেমনি

১৬৮. আইয়ব খান, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা, ১৩৭

পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক দল ছিল। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীর উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। আন্দোলন শুরু হয় না। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করার পর থেকে আওয়ামী লীগ দ্রুত জনপ্রিয় দল হিসাবে পরিগণিত হতে থাকলেও সরকারী নির্যাতনে সাংগঠনিকভাবে তারা ছিলেন বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় মাওলানা ভাসানী তাঁর সন্তোষস্থ বাসভবনে বিরোধীদলের নেতাদের একটি বৈঠক ডাকেন। সেখানে আওয়ামী লীগ (উভয় গ্রুপ), ভাসানী ন্যাপ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) ইত্যাদিকে আমন্ত্রণ জানালেও ওয়ালী ন্যাপকে জানানো হল না। এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ১১ অক্টোবর (১৯৬৮)। ৭ অক্টোবর আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি ওয়ালী ন্যাপকে আমন্ত্রণ না জানানোর কারণে বৈঠক প্রত্যাখ্যান করে।

এসময় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মণি সিংহ-খোকা রায় নেতৃত্বাধীন) নিষিদ্ধ ছিল এবং তাঁদের প্রায় সকল নেতাই তখন জেলে।

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারীর পর যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা কারারুদ্ধ ও গ্রেফতারী পরওয়ানায় ছিলেন :

শেখ মুজিবুর রহমান, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া,	আওয়ামী লীগ
তাজউদ্দিন আহমদ, মোল্লা জালাল উদ্দিন, হানিফ খান,	”
আমজাদ হোসেন, চিত্তরঞ্জন সুতার, শেখ ফজলুল হক মণি,	”
কে, এম ওবায়দুর রহমান	”
মণি সিংহ, সত্যেন সেন, জ্যোতিষ বোস,	পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি
অজয় রায়, রতন সেন, আবদুল হালিম,	”
মৃণাল বারুরী, শংকর বোস, রনেশ দাশ গুপ্ত,	”
রবি নিয়োগী, মণি কৃষ্ণ সেন, অমূল্য লাহিড়ী,	”
আশু ভরদ্বাজ, মোহাম্মদ ফরহাদ	”
অমল সেন, সুধাংশু বিমল দত্ত,	কমিউনিস্ট পার্টি (মাও সে তুং পন্থী) ও ভাসানী ন্যাপ
নগেন সরকার, পূর্নেন্দু দস্তিদার,	”
শান্তি সেন, আলাদ্দর আলী,	”
আবদুল হক, কাজী জাফর	”
রণেশ মৈত্র, মহিউদ্দিন আহমদ,	ওয়ালী ন্যাপ
চৌধুরী হারুনুর রশীদ	”

বন্দী ছাত্র নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো মতিয়া চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন এবং নূরে আলম সিদ্দিকী। এছাড়াও বহু নেতা বন্দী অথবা হুলিয়া মাথায় নিয়ে আত্মগোপন অবস্থায় ছিলেন।

বরফ গলার শুরু

নভেম্বর (১৯৬৮) দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পরিস্থিতি আস্তে আস্তে আন্দোলন অভিমুখী হতে থাকে। কয়েকটি ঘটনাও এ সময় ঘটে।

১৭ নভেম্বর ও ২৪ নভেম্বর মাত্র সাত দিনের ব্যবধানে ওয়ালী ন্যাপ (পূর্ব পাকিস্তান শাখা) পল্টন ময়দানে ও বায়তুল মোকাররমে দুটি জনসভা করে। অন্যান্যর মধ্যে এতে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, মহিউদ্দিন আহমদ, বেগম জোহরা তাজউদ্দিন, পীর হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

২৬ নভেম্বর ন্যাপ প্রধান মাওলানা ভাসানী ও আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী আন্দোলন প্রশ্নে এক বৈঠকে মিলিত হন। (দৈনিক পাকিস্তান, ২৭ নভেম্বর, ১৯৬৮)।

২৯ নভেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক নির্যাতনের প্রতিবাদে ঢাকা হাই-কোর্টের আইনজীবীরা এক বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পথচারীরাও এতে অংশ নেয়। আইনজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, ফজলুল কাদের চৌধুরী, আলীম আল রাজী, দেওয়ান মাহবুব আলী, শওকত আলী খান, মির্জা গোলাম হাফিজ প্রমুখ।

১ ডিসেম্বর (১৯৬৮) ঢাকার সাংবাদিকরাও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে রাজপথে নেমে আসে। এতে নেতৃত্ব দেন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শহীদুল্লাহ কায়সার, সাধারণ সম্পাদক আতাউস সামাদ, প্রেসক্লাব সভাপতি এ. বি. এম মুসা প্রমুখ। (দৈনিক সংবাদ, ২ ডিসেম্বর ১৯৬৮)।

আইয়ুব খানের বোধদয়

ডিসেম্বরের ১ তারিখ আইয়ুব খানের দিক থেকেও কিছু করা হয়। ঝড় ওঠা সময় চলে এসেছে বুঝতে পেরে প্রেসিডেণ্ট তার মাস পহেলা নির্ধারিত বেতার বক্তৃতায় ছাত্রদের দাবীনামা সমূহের কিছু কিছু অংশের যৌক্তিকতা স্বীকার করে বলেন,

১. ছাত্র ও শিক্ষকদের সত্যিকার অসুবিধা দূর ও তাদের মনের সন্দেহ নিরসনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সংশোধন করা উচিৎ
২. ছাত্রদের ডিগ্রী বাতিলের ধারা বিলোপ করা উচিৎ
৩. তৃতীয় বিভাগে পাশ ছাত্রদের উচ্চতর ক্লাশে ভর্তির ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ থাকা উচিৎ হবে না
৪. সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষা পুণ: প্রবর্তন করা উচিৎ
৫. দ্বিতীয় বিভাগে পাশের নম্বর সারা দেশে এক হওয়া উচিৎ
৬. পলেটেকনিক ইনষ্টিটিউটের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি বদলে সেমিষ্টার পদ্ধতি পুনরায় চালু করা উচিৎ।[১৬৯]

শুধু এসব স্বীকার করেই নেওয়াই নয়, অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্য তিনি সকল উপাচার্যকে ইতোমধ্যে নির্দেশ দিয়েছেন এ সংবাদও প্রেসিডেণ্ট উল্লেখ করেন।

৬ ডিসেম্বর ভাসানী ন্যাপের পক্ষ থেকে জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। পল্টন ময়দানের জনসভা শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল গভর্ণর হাউস ঘেরাও করে। সেদিন ছিল রোজার সময়। সন্ধ্যায় মিছিলকারীরা বায়তুল মোকাররম ফিরে আসে ইফতার করার জন্য।

এই সময় একটি ঘটনা ঘটে। এবং এই ঘটনা ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের নাটকীয় পরিবর্তনের সূচনা করে। সেদিন স্কুটার ড্রাইভাররা তাদের দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে আন্দোলনে নেমেছিল। তাদের উপর পুলিশী নির্যাতন হয়। বিক্ষুব্ধ ড্রাইভাররা মিছিল করতে করতে এসে বায়তুল মোকাররমে পেয়ে যায় মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানীকে। তারা ভাসানীর কাছে দাবী করতে থাকে যে, আগামীকাল অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর হরতাল ডাকতে হবে। অথচ ভাসানী এই কিছুক্ষণ আগেই জনসভায় ১২ ডিসেম্বর হরতাল ডেকেছিলেন। স্কুটার ড্রাইভারদের অনেক বোঝানো হয় কিন্তু তারা ছিল অনড়। অবশেষে বাধ্য হয়ে মাওলানা ভাসানী ৭ ডিসেম্বর হরতাল ডাকেন।

প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয় ৭ ডিসেম্বর। অটো রিকসার ড্রাইভাররাই এই হরতাল পালনে, পিকেটিং-এ মূল ভূমিকা পালন করে। নীলক্ষেতে মারমুখী জনতাকে দমন করতে পুলিশ গুলি চালালে তা নিকটস্থ একটি ইলেকট্রিক

১৬৯. দৈনিক পাকিস্তান, ডিসেম্বর ২, ১৯৬৮

দোকানের দরজা ভেদ করে মোহাম্মদ ইসহাক (২৮) এবং আবদুল মজিদ(৩০) নামে দুজন নিরীহ কর্মচারী নিহত হয়। এ খবর শহরে প্রচারিত হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত যায়গায় যায়গায় খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে। এদিন মোট তিনজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত এবং পাঁচশতাধিক গ্রেফতার বরণ করে।[১৭০]

৭ ডিসেম্বরে এই গুলিবর্ষণকে কেন্দ্র করে এদিনই সংসদ অধিবেশনে তীব্র বিতর্ক হয়। বিতর্কের খানিক অংশ তুলে ধরা হল এই জন্য যে, কৌতূহলী পাঠক লক্ষ্য করবেন, ঠিক ৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারী গুলিবর্ষণকে কেন্দ্র করে এমনি বিতর্ক সংসদ অধিবেশনে হয়েছিল। তবে সে সময় সরকারী দলে ছিলেন নূরুল আমীন, বিরোধী দলে আবদুল রশীদ তর্কবাগীশ। এবার সরকারী দলে সবুর খান, বিরোধী দলে নূরুল আমীন। ইতিহাস কি নির্মম! সেদিন বিরোধী পক্ষের যে যুক্তি ও আবেদন তিনি খণ্ডন করেছিলেন, এবার নিজেই বিরোধী পক্ষের হয়ে নূরুল আমীন সে আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটান।[১৭১]

"গোলযোগের বিষয়টি সমালোচনার উদ্দেশ্যে পরিষদের নিয়মিত কর্মসূচী মুলতবী রাখার জন্য বিরোধী দল যে প্রস্তাব দেন তার সাথে তিনি (সরকারী দলের নেতা সবুর খান—লেখক) একমত নন বলে জানান। তিনি বলেন পরিষদের বাইরে যদি কিছু ঘটে থাকে তাতে বিরোধী দলের নেতারা নিজেদের তার থেকে দায়িত্ব মুক্ত বলতে পারেন না।"

বিরোধী দলের নেতা নূরুল আমীন, পরিষদ নেতা সবুর খানের মন্তব্যের জবাবে বলেন, "পরিষদের সদস্যদের যেমন আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত দায়িত্ব আছে, তেমনি আমরা বাইরে যা ঘটছে তার প্রতি চক্ষু বন্ধ করে থাকতে পারি না।"[১৭২]
(দৈনিক পাকিস্তান, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৮)।

৭ ডিসেম্বরে গুলিবর্ষণ ও নির্যাতনের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ, ওয়ালী ন্যাপ, ভাসানী ন্যাপ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ৮ ডিসেম্বর পুন: হরতালের কর্মসূচী দেয়। সকল দলের আয়োজিত বলে হরতাল বিশেষ সাফল্য লাভ করে।

---

১৭০. আজাদ, ডিসেম্বর ৮, ১৯৬৮

১৭১. আগ্রহী পাঠক এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, এই লেখকের 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ

১৭২. এ প্রসঙ্গে নূরুল আমীনের ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত বক্তব্যের জন্য পরিশিষ্টে পড়ুন 'যে কথা এতদিন বলিনি'।

৯ ডিসেম্বর বায়তুল মোকাররমে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠানে আরও দু'শত জন গ্রেফতার বরণ করে।

এরপর সকল বিরোধী দলের মিলিত কর্মসূচী দেওয়া হয়। এবং ১৩ ডিসেম্বর সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। পুলিশের গুলিতে এদিন চট্টগ্রামে ২৬ জন আহত এবং ১৫৭ জন বন্দী হয়, রাজশাহীতে বন্দী করা হয় ১৭ জন, ঢাকায় হাজারেরও অধিক।[১৭৩]

২৯ ডিসেম্বর মাওলানা ভাসানী পাবনার জেলা প্রসাশকের অফিস ঘেরাও করেন। নরসিংদীর হাতিরদিয়াতেও ঘেরাও আন্দোলনের কর্মসূচী পালিত হয়।

এর মধ্যে আন্দোলন এক নূতন দিগন্ত লাভ করে। কারণ জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই ছাত্র সমাজ এক অভূতপূর্ব বিস্ময়কর ঐক্য স্থাপন করে কর্মসূচী ঘোষণা করে আন্দোলনে নতুন জোয়ারের স্থষ্টি করে।

শিক্ষার হার : ১৮৮৬-১৯৬৯

ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্তানের পূর্ব অংশে শিক্ষা ব্যবস্থায় এক চরম নৈরাজ্য নেমে আসে। শোষণ ও বৈষম্যমূলক নীতি পাকিস্তানের অন্যান্য বিষয়ের মতো শিক্ষা ব্যবস্থায়ও এসেও পড়ে। ফলে দেখা যায়, ১৯৪৭ সালের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হারে শিক্ষার হার দ্রুত কমে যেতে থাকে, খুব বেশী পরিমাণে ছাত্ররা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করা শুরু করে এবং সর্বোপরি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এসময় লুপ্ত হয়ে যায়। পাশাপাশি দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তানে এই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন গতিতে আগাচ্ছে। পশ্চিমে শিক্ষার হার যেমন বাড়ছিলো তেমনি বাড়ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও, ছাত্রদের বিদ্যালয় পরিত্যাগের (Drop out) সংখ্যা ছিল পূর্বঅঞ্চলের তুলনায় অনেক কম। শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয়ও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে অনেক কম। অথচ জনসংখ্যার দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছিল পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী।

পাকিস্তানের সরকারী পরিসংখ্যান ব্যুরো, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন অনুযায়ীই দেখা যাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের মতোই পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা তৎকালীন পাকিস্তানের পাঞ্জাবী শাসনকর্তাদের কাছে কতো বেশী অবহেলার বিষয় ছিল।

---

১৭৩. আজাদ, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯,৬৩৩টি। মাত্র পাঁচ বছর পরেই ১৯৫৪-৫৫ সালে দেখা গেল তার সংখ্যা নেমে এসেছে ২৬,০০০-এ।[১৭৪] মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানেই সাড়ে তিন হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উঠিয়ে দিয়ে কয়েক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করা হয়। ষাটের দশকে এসে এই হার একটু বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় একেবারেই কম।

ষাটের দশকের পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ও শিক্ষক সংখ্যার একটি চিত্র নিম্নে দেখানো হল। কৌতূহলী পাঠক দেখতে পাবেন, এর পরের একটি ছক যা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের উভয় পাকিস্তানের তুলনা-মূলক পরিসংখ্যান হিসাবে এসেছে এবং তাতে বৈষম্যের কি নির্লজ্জ প্রকাশ ঘটেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক সংখ্যার খতিয়ান :[১৭৫]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ		১৯৬১—১৯৬৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	শিক্ষক সংখ্যা ১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩
বিশ্ববিদ্যালয়*		৪	৪	৫৬৮১	৬৮৩২
মহাবিদ্যালয়	পুরুষ	৭৫	৮০	৫৬,৭০৩	৭০,৩৪৮
উচ্চবিদ্যালয়	,,	১,৭৪৬	১,৮০৫	৪,৩৫,৬৩১	৪,৭৩,৮৩৩
প্রাথমিকবিদ্যালয়	,,	২৪,৯৫৪	২৫,৩৫১	৩২,৬৭,০৭৯	২৬,৬৩,৬৬২
মহাবিদ্যালয়	মহিলা	১০	১১	২,২৪৪	৫,০৯৫
উচ্চবিদ্যালয়	,,	১০৭	১১৯	৩৯,৫০৬	৬২,২৯১
প্রাথমিকবিদ্যালয়	,,	১,৭৯৩	১,৮০৩	১,৫৬,১৪৮	৯,৭২,০০৮

* বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যার মধ্যে এই সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৫৭ জন ছাত্রী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন ছাত্রীকে এর মধ্যে ধরা হয়েছে।

১৭৪. Educalion for All, Papars and Proceedings of the symposia, East Pakistan Education week, 1966-67. P. 54

১৭৫. Directorate of Education, East Pakistan, quoted in statistical Digest of East Pakistan No. 2, 1964, East Pakistan Bureau of statistics, p. 188

১৯৬৪-৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এই চিত্রের থেকে বড় একটা হেরফের হয় নি। এই প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালক)-এর সংখ্যা ছিল ২৫,৯০২ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালিকা)-এর সংখ্যা ছিল ১,৭৪৭। অর্থাৎ মোট ২৭,৬৪৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়।[১৭৬]

পঞ্চাশ দশক থেকে ষাট দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত উভয় পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটা তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে অত্যন্ত দুঃখজনক চিত্র ভেসে উঠবে। দেখা যাবে, প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এবং শিক্ষকরা ছিল অবহেলিত এবং অবনমিত।

উভয় প্রদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার ছকটি লক্ষণীয় :[১৭৭]

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	১৯৫০-৫১	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়						
পাকিস্তান	৩৭,২৫৮	৪৪,২২৪	৪৪,৪৮৪	৪৭,৫৭৪	৫১,৬৭৭	৫৫,৪৯২
পূর্ব পাকিস্তান	২৬,৩৫২	২৬,৬৮৮	২৬,৫৮৩	২৬,৬৬৫	২৬,৭৪৭	২৭,১৫৪
পশ্চিম পাকিস্তান	১০,৯০৬	১৭,৫৩৬	১৭,৯০১	২০,৯০৯	২৪,৯৩০	২৮,৩৩৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়						
পাকিস্তান	৬,৩৮২	৬,০৩০	৬,০৯৬	৬,১১০	৬,৫৬৫	৬,৯৬৩
পূর্ব পাকিস্তান	৩,৫০৭	৩,০৬১	৩,০৫৩	৩,১৪০	৩,২৫৪	৩,৩৭৭
পশ্চিম পাকিস্তান	২,৮৭৫	২,৯৬৯	৩,০৪৩	২,৯৭০	৩,৩১১	৩,৫৮৬
শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়						
পাকিস্তান	১১৪	৯৬	১০২	১০৪	৯৮	৯৯
পূর্ব পাকিস্তান	৮২	৪৮	৪৭	৪৮	৪৮	৪৮
পশ্চিম পাকিস্তান	৩২	৪৮	৫৫	৫	৫০	৫১

উপরের ছকটি অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি এবং এটা তৎকালীন সরকারেরই পরিসংখ্যান। পূর্ব পাকিস্তানে ছাব্বিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ১৯৫০

১৭৬. Education for all, Papers and proceedings of the symposia, East Pakistan Education week, 1966-67, p. 55

১৭৭. Statistical Digest of East Pakistan, No. 2, 1964, East Pakistan, Bureau of statistics, p. 192

সালে, বার বছর পর তা মাত্র এক হাজারেরও কম সংখ্যায় বাড়লো। আর পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৫০ সালে এগার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় বার বছরে আটাশ হাজারেরও বেশী হয়ে গেল। মাধ্যমিক বিদ্যালয় বার বছরে পূর্ব পাকিস্তানে কমে গেল আড়াইশতের মতো আর পশ্চিম পাকিস্তানে বেড়ে গেল দেড় হাজারেরও বেশী।

এই বৈষম্যের পরিকল্পনা একেবারে উপরতলা থেকেই করা হতো। যে হামুদুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের কাছে এতো ঘৃণিত তাঁর প্রতিবেদনেও এই বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। কিভাবে রাতারাতি এতো বড় বৈষম্য উভয় প্রদেশে ঘটে গেল তাঁর বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

"১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যখন ২৬,৩০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল তখন পশ্চিমে ছিল ১৮,০০০। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৬০-৬৫ --লেখক) প্রস্তাব করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে ১৫,২০০ নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠন করা হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে ১১,৩০০ প্রাথমিকের গুণগত মান উন্নীত করা হবে যাতে উভয় প্রদেশের এই বয়সের স্কুলগামী শিশুদের সংখ্যা মোটামুটি শতকরা ৬৩%-তে দাঁড়ায়"।[১৭৮]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৫,২০০ নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হলেও পূর্ব পাকিস্তানে মান উন্নীত করার কথা বলে একটিও নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না। অথচ স্কুলগামী শিশুদের সংখ্যা শতকরা ৬৩ ভাগ করা হবে অর্থাৎ এই শতকরা হারটিও বাড়ানো হবে পশ্চিম পাকিস্তানের শিশুদের স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করে। অথচ জনসংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তান ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় অর্ধেকেরও কম।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে পূর্ব পাকিস্তানে সঙ্কট আরো ছিল। শিক্ষক নিয়োগেও এই একই কারণে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠান সমূহ বঞ্চিত হয়। নীচের ছকটি তার উৎকৃষ্ট নমুনা :

---

১৭৮. Report of the commission on the student problems and welfare, Ministry of Education, Govement of Pakistan, 1966 P. 13

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষক সংখ্যার একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা :[১৭৯]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	১৯৫০-৫১	৫৮-৫৯	৫৯-৬০	৬০-৬১	৬১-৬২	৬২-৬৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়						
পাকিস্তান	৯২,০৫৩	১২১,৪২৯	১২৩,৩১০	১৩০,৫৪৫	১৩৭,৩১০	১৪৪,০৯৮
পূর্ব পাকিস্তান	৬৭,৮৮৭	৭৭,১২৩	৭৮,৪৬২	৮০,৫২৪	৮২,৪৭৭	৮৬,৪৬৩
পশ্চিম পাকিস্তান	২৪,১৬৬	৪৪,৩০৬	৪৪,৮৪৮	৫০,০২১	৫৪,৮৩৩	৬২,৬৩৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়						
পাকিস্তান	৪৫,৪৭০	৫৩,৬০৩	৫৪,৯২৬	৫৮,৮১৫	৬৩,৪৯৪	৬৮,২৪১
পূর্ব পাকিস্তান	২৩,৬৯০	২২,৭৯৬	২৩,৫৭১	২৪,৪৫৪	২৫৩১৮	২৭,৫১০
পশ্চিম পাকিস্তান	২১,৭৮০	৩০,৮০৭	৩১,৩৫৫	৩৪,৩৬১	৩৮,১৭৬	৪০,৭৩১

চিত্র অনুযায়ী পঞ্চাশের দশকের গোড়াতে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষক ষাটের দশকে গিয়ে মাত্র উনিশ হাজার বৃদ্ধি পায় আর পশ্চিম পাকিস্তানে এই সংখ্যা চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি। এ প্রসঙ্গ বিচারপতি হামুদুর রহমানও তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন এবং অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক আরেকটি চিত্র তিনি এই সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন। সে হচ্ছে দুই অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের লজ্জাজনক বৈষম্য :

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেল :[১৮০]

পূর্ব পাকিস্তান

ক. মেট্রিকুলেট (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) : টা ৮০--১--৯০--২--১০০
খ. মেট্রিকুলেট (প্রশিক্ষণহীন) : টা ৬০--১--৭০--২--৯০
গ. মেট্রিক-নিম্ন (প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত) : টা ৫৫--১--৬০--২--৮০
ঘ. মেট্রিক-নিম্ন (প্রশিক্ষণহীন) : টা ৪৫ নির্ধারিত।

পশ্চিম পাকিস্তান

ক. মেট্রিকুলেট (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) নিম্নতম গ্রেড (জুনিয়ার) : টা ১০০--৪--১৪০--৫--১৭৫
খ. মেট্রিকুলেট (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) নিম্নতম গ্রেড (সিনিয়র) : টা ১১৫--৫--১৮০--৭--২১৫
গ. ১০% সিলেকশন গ্রেড : টা ২১৫--১৫--৩০৫

১৭৯. Central Bureau of Education, Goverment of Pakistan
১৮০. Report of the commission on student problem and welfare, Govt. of Pakistan, Ministry of Education (Karachi), 1966

বিচারপতি হামুদুর রহমান উল্লেখ করেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষক-দের এই বেতন-ক্রমটি সংশোধিত হওয়ার পরের। ধরে নেওয়া যায়, এর পূর্বে অবস্থাটি ছিল আরো করুণ।

পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অবহেলা ও বঞ্চনার কারণে প্রথম শ্রেণী থেকে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্র পর্যন্ত এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হয়ে বিদ্যালয় পরিত্যাগে বাধ্য হয়। আর খুব স্বাভাবিক কারণেই বিদ্যালয় পরিত্যাগের শতকরা হার ছিল পূর্ব পাকিস্তানে অসামান্যভাবে বেশী।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রহ্রাসের হার :[১৮১]

বার্ষিক পর্ব	তালিকাভুক্তি প্রথম শ্রেণী-পঞ্চম শ্রেণী		তালিকাভুক্তির হার	পরিত্যাগের সার্বিক হার
১৯৪৮-৪৯ থেকে ৫২-৫৩	১৬,০৮,৬৭৪	১,৫৬,৯০৩	৯.৭	৯০.৩
১৯৫২-৫৩ থেকে ৫৬-৫৭	১৫,৫৭,৯৪৭	১,৯৪,২৫১	১২.৪	৮৭.৬
১৯৫৬-৫৭ থেকে ৬০-৬১	১৪,৬০,০২৩	২,৪৭,২৩৯	১৬.৯	৮৩.১
১৯৬০-৬১ থেকে ৬৪-৬৫	১৭,৪৪,০২১	৪,৩৭,৯৭৯	২৫.১	৭৪.৯

এই অপচয়ের চিত্র পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে করলে বিষয়টি পুরোপুরি অনুধাবিত হবে।

পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে তুলনামূলক বিদ্যালয় পরিত্যাগের শতকরা হার :[১৮২]

পর্ব	পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫৮-৬২	৭৪.২	৮১.৮	৫৭.৬
১৯৬০-১৯৬৪	৭২.৮	৭৮.৮	৫৬.২

১৮১. Educatlon For All. papers and proceedings of the symposia, East Pakistan Education week, 1966-67, p. 54

১৮২. Education in progress, peoceedings of the symposia, East Pakistan Education week, 1958, p. 96

এই সময়ের এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রহ্রাসের একটি তুলনামূলক চিত্র :[১৮৩]

দেশ	পর্ব	শতকরা হার
শ্রীলঙ্কা	১৯৫৯	৩৪
কোরিয়া	১৯৬০	১৬
তাইওয়ান	১৯৫৯	৮
ভারত	১৯৫৬-৫৭	৬৫
মালেশিয়া	১৯৬১	১৬
পাকিস্তান	১৯৫৮	৭৩

পাকিস্তানে এই ব্যাপক ও বিপুল সংখ্যক ছাত্রের বিদ্যালয় পরিত্যাগের আর্থ-সামাজিক কারণ সুবিদিত। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা ক্ষেত্র চরম অবহেলার শিকার হয়ে পড়ে। এ অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ বরাদ্দ কমে যায়। নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। নীচের পরিসংখ্যানটি থেকে দেখা যাবে ১৮৮৬ সালের তুলনায় ১৯৬৫ সালে এসে ছাত্র-প্রতি ব্যয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮০ বছরে বেড়েছে মাত্র ১২ টাকা। দ্রব্য-মূল্য ও মুদ্রাস্ফীতির হিসাবে বৃটিশ যুগের তুলনায় পাকিস্তান আমলে এসে এই ব্যয় প্রকৃতপক্ষে তুলনামূলকভাবে কম আসে :[১৮৪]

বছর	বঙ্গদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালক) ব্যয় (জন প্রতি)	পূর্ব পাকিস্তানে (ছাত্র ছাত্রী মিলিত) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যয়
১৮৮৬-৮৭	টাকা ২.২	
১৮৯৬-৯৭	টাকা ২.৩	
১৯০৬-০৭	টাকা ২.৯	
১৯১৬-১৭	টাকা ৩.৫	
১৯২৬-২৭	টাকা ৪.০	
১৯৩৬-৩৭	টাকা ৩.৫	
১৯৫৭-৫৮		টাকা ৯.৮
১৯৫৯-৬০		টাকা ১১.৬
১৯৬৪-৬৫		টাকা ১৪.৬

১৮৩. Proceeding of the symposia, East Pakistan Education week, 1968, p. 99

১৮৪. Papers and proceedings of the symposia, East Pakistan Education week, 1966-47, p. 59

পাকিস্তান আমলের শিক্ষা ক্ষেত্রের ব্যয়ের একটি ভিন্ন চিত্র :

Public Expenditure on education as % of G.D.P/Budget.[১৮৫]

	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৯-৭০
ব্যয় G.D.P	০·৬	০·৬	০·৯	১·৫
ব্যয় budget	১৭·৮	১০·৮	৮·৬	১০·০

Public Expenditure on Education[১৮৬]

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	১৯৬০--৬১	১৯৬৫--৬৬	১৯৬৯--৭০
প্রাথমিক	৩৮.৭৮	৩৫.৬৭	৩১.৩৬
মাধ্যমিক	১৯.৪২	২২.১৯	১৮.৯৬
উচ্চ মাধ্যমিক	৬.২৫	৪.৬৪	৬.২৬
বিশ্ববিদ্যালয়	৮.২১	১১.০০	১৪.৩৬

Grouth rat of Govt. Expenditure on Education[১৮৭]

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৫-৬৬	১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৬৯-৭৯
প্রাথমিক	১২.৯	১৯.৩
মাধ্যমিক	১৮.০	১৮.৬
উচ্চ মাধ্যমিক	৮.২	৩৩.০
বিশ্ববিদ্যালয়	২২.০	৩১.০

অন্য একটি সূত্রে বৃটিশ যুগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেসরকারী উদ্যোগে ব্যয়ের পরিমান দেখানো হয়েছে :

১৯০১--২	১৯০৬--৭	১৯১১--১২
টা ৬০৭,৪০০	টা ৮,৯৫০,০০০	টা ১১,৭৯১,০০০

এই একই সূত্রে বলা হয়েছে, ১৮৯৬-৯৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক গড় ব্যয় ছিল ১০১ টাকা, ১৯০১--০২ সালে ১১৪ টাকা, ১৯০৬--০৭ সালে ১৩৩ টাকা

১৮৫. শিক্ষা ও পরিকল্পনা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ১৯৮১ সেমিনারে পঠিত প্রফেসর তাহেরুল ইসলামের প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা, ১৬৪

১৮৬. ঐ, পৃষ্ঠা, ১৬৫

১৮৭. ঐ, পৃষ্ঠা, ১৬৬

এবং ১৯১১–১২ সালে ছিল ১৬২ টাকা। আর ছাত্র প্রতি বার্ষিক গড় ব্যয় ছিল ১৯০২ সালে ৩.৭ টাকা, ১৯০৭ সালে ৩.৯ টাকা এবং ১৯১২ সালে ছিল ৪.২ টাকা।[১৮৮]

এ প্রসঙ্গে ১৮৯৬ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত বঙ্গদেশে বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ে সংখ্যা ও তার ছাত্র সংখ্যার একটি ছক দেখানো যায় যাতে কৌতূহলী পাঠক তৎকালের ছাত্র সংখ্যা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার একটি হিসাব এর প্রেক্ষিতে করে নিতে পারেন :[১৮৯]

প্রতিষ্ঠান	১৮৯৬-৯৭	১৯০১-০২	১৯০৬-০৭	১৯১১-১২	১৯১৬-১৭	১৯২১-২২
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়	১,৩৩৫	১,৪৮১	১,০৪৮	১,১৯৪	২,৩১৭	
ছাত্র	১,৫২,২৯৮	১,৯১,৬৪৮	১,২৫,৯২৫	১,৭২,৫৭৭	৩,৮২,৪২০	
ইংরেজীমানবিককলেজ	৩৮	৪৪	৩৪	৩২	৩৩	৩৬
ছাত্র	৬,৩৮৪	৮,১৫০	৫,১৯০	৯,৭১৬	১৮,৪৭৮	১৬,৯৪২

১৮৯৬-৯৭ সালে বঙ্গদেশে স্নাতক মানবিক শাখায় ছাত্র ছিল ১,৩৫৪, ১৯১৬-১৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪,৪৬৮। স্নাতক বিজ্ঞান শাখায় ১৮৯৬-৯৭ সালে ছাত্র ছিল ১২ জন, ১৯১৬-১৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ৪৩৯ জন। বিজ্ঞানের তুলনায় এই সময় আইন পড়ার দিকে ছাত্রদের বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। ১৮৯৬-৯৭ সালে আইনের ছাত্র ছিল ৪১১ জন, ১৯১৬-১৭ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১,২২৮ জনে।[১৯০]

পূর্ব বাঙলা ও আসামে এই সময় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :[১৯১]

	মহাবিদ্যালয়		উচ্চ বিদ্যালয়		প্রাথমিক বিদ্যালয়	
বছর	১৯০৬-০৭	১৯১১-১২	১৯০৬-০৭	১৯১১-১২	১৯০৬-০৭	১৯১১-১২
ছাত্র	৭১	৩৬০	২২,৯৭৮	৫৯,৪৮০	৩,১৭,৬৯৯	৪,৫১,১৫৭

১৮৮. Aparna Basu, the grouth of Education and political Development in India, 1896-1920 p. 62

১৮৯. Aparana Basu, প্রাগুক্ত, p. 105

১৯০. Aparna Basu, প্রাগুক্ত, p. 106

১৯১. Report on the progress of Edn. in East Bengal and Assam, 1907-8 to 1911-12, vol. II, p, 81

এই সূত্রের প্রতিবেদন থেকেই জানা যায়, ১৯০৬-০৭ সালে স্নাতক শ্রেণীতে মুসলমান ছাত্ররা পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছিলো মাত্র ১ জন। ১৯১১-১২ সালে পাশের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ জনে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ১৯০৬-০৭ সালে পাশ করে মাত্র ১২ জন, আর ১৯১১-১২ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩ জনে। সমগ্র পূর্ব বাঙলা ও আসামে ১৯০৬-০৭ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় মুসলমান ছাত্র পাশ করেছিল ৯৫ জন, ১৯১১-১২ সালে এই সংখ্যা ২৯৬ জনে গিয়ে পৌঁছে। সমগ্র ভারতের মুসলমান জনসংখ্যার শতকরা ৫২.৭ ভাগ ছিল বঙ্গদেশের মুসলমান। কিন্তু মহাবিদ্যালয়ে এই জনসংখ্যার মাত্র ৮.৫ ভাগ স্থান পেত অথবা যেতে পারত। মাধ্যমিক স্তরে এই হার ছিল শতকরা ২২.১ ভাগ। স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যায়, উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গের মুসলমান ছাত্রদের অবস্থা ছিল একেবারেই করুণ।[১৯২]

একটি ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবেদনে, পাকিস্তান আমলের শিক্ষা বিষয়ক কতক চিত্র তুলে ধরা হয় ১৯৭০ সালের একটি রিপোর্টে।[১৯৩] আমাদের ইতোপূর্বেকার উদ্ধৃতি সমূহের বিবরণ থেকে তা ভিন্নতর। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, পাকিস্তানে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ এমনিতেই অপ্রতুল, কিন্তু মূল সমস্যা হচ্ছে, এই অপ্রতুল বরাদ্দকৃত অর্থও পরিকল্পিতভাবে শেষ পর্যন্ত পুরোটি ব্যয় করা সম্ভব হয় নি। প্রতিবেদনটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করে যে, ১৯৬৫-৭০ সালের মধ্যে ১২৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ব্যয় হয়েছে মাত্র ৭৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ পরিকল্পনার ৩৯% ভাগই ব্যয় করা হয় নি। প্রতিবেদনে আরো দেখানো হয়, ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মাধ্যমিক স্কুল ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার, অর্থাৎ মোট ছাত্র সংখ্যার মাত্র শতকরা ১৯.৩ ভাগ। অর্থাৎ যে নগন্য সংখ্যক ছাত্র প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে তাদেরও এক বিপুল অংশ শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছানোর সুযোগ পায় না।

জনজীবনে শিক্ষার ব্যয় সম্পর্কে এখানে বলা হয়, গত দশ বছরে স্কুলে বেতন বেড়েছে শতকরা ১৫০ ভাগ। পরীক্ষার ফী কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে এবং

---

১৯২. 5th Quin. Review of education in India, 1912-17, vol. II. p.193

১৯৩. শিক্ষা সমস্যা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, প্রচার সম্পাদক, কামালউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭০

ছাত্রাবাসগুলিতে থাকা-খাওয়ার খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৬০ ভাগ। কাগজের মূল্য এই সময় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে রিপোর্টটিতে উল্লেখ করা হয়। বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতির ফলে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের ব্যবধান যে কি পরিমান বেড়েছে তার একটি খতিয়ানও প্রতিবেদনটিতে উদ্ধৃত করা হয়:

শিক্ষাবর্ষ	মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যা		কলেজের সংখ্যা		বিশ্ববিদ্যালয়	
	পূর্ব পাক	পশ্চিম পাক	পূর্ব পাক	পশ্চিম পাক	পূর্ব পাক	পশ্চিম পাক
১৯৪৭-৪৮	৩,৪৮১	২,৫৯৮			১	২
১৯৬০-৬১	৩,১৪০	২,৯৭০	৯২	১৬৫	২	৪
১৯৭০-৭১	৩,৯৬৪	৪,৪৭২	২২৫	২৭৫	৫	৭

উনসত্তরের পটভূমি১৯৪

ভাষাকে কেন্দ্র করে বায়ান্ন সাল থেকে যে ছাত্র আন্দোলনের শুরু হয়েছিল তা কখনো থেমে থেমে আবার কখনো প্রচণ্ড বেগে অব্যাহতভাবেই এগিয়ে চলছিলই। বায়ান্নোর পর সামরিক শাসন বিরোধী প্রথম জাগরণ ঘটায় ছাত্ররা বাষট্টিতে। এরপর প্রতিটা মাস, প্রতিটা বছর এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে থাকে যে, কোনো না কোনো ব্যাপার নিয়ে ছাত্রদের মাঠে নামতেই হচ্ছিল।

উনসত্তরে এসে প্রচণ্ড রুদ্ররোষে ছাত্রদের সঙ্গে সাধারণ গণমানুষ যে রাস্তায় নেমে পড়লো তার বড় কারণগুলি হচ্ছে:

১৯৪. মাহফুজউল্লাহ, 'অভ্যুদ্দানের উনসত্তর' এবং মেসবাহ কামাল, 'আসাদ ও উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান' গ্রন্থে পটভূমি হিসাবে এমন করে বিষয় সূচী সাজিয়েছেন যাতে মনে হয় এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। এ প্রসঙ্গে জনাব মেসবাহ কামাল লিখেছেন, "উনসত্তরের দেশ কাঁপানো গণ অভ্যুত্থানের প্রাথমিক ঘটনাক্রম কিন্তু পাকিস্তানের পূর্বাংশে সংঘটিত হয়নি, বরং হয়েছিল পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে"। (পৃষ্ঠা—৪০)। আর জনাব মাহফুজউল্লাহ তো তাঁর বই শুরু করেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের ৭০ জন ছাত্রের চোরাচালানের ঘটনা ও গ্রেফতার এবং তা থেকে বিক্ষোভের শুরু বলে। প্রকৃত পক্ষে এটা ইতিহাস নয়। বিচ্ছিন্নভাবে নয়, বরং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ অব্যাহত আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে একটার পর একটা ইস্যু নিয়ে ধারাবাহিকভাবে মেতেই ছিল। থামে নি কখনো। অন্যসব ছিল অনুষঙ্গ মাত্র।

১. পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ কর্তৃক পূর্বাঞ্চলকে দীর্ঘদিন এভাবে অর্থ-নৈতিকভাবে শোষণ ও শিক্ষাক্ষেত্রে এইবঞ্চনা ; এবং অব্যাহত এই অবিচার থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ জন-জীবনে শ্রেণীদ্বন্দ্বের উদ্ভব আর এ চেতনার বিকাশ.

২. বাঙালী রাজনীতিক, সামরিক অফিসারসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের এবং ১৯ জুন (১৯৬৮) থেকে ক্যাণ্টন-মেণ্টের ভেতরে তার বিচার শুরুর ঘটনা৷

৩. বেতার ও টেলিভিশনে পুণরায় রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা৷

৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাঙলা ভাষার তথাকথিত সংস্কারের পুন:প্রচেষ্টা

৫. আইয়ুব খানের রাজত্বকালের দশ বছরের তথাকথিত সাফল্যের প্রচারে ডামাডোল এবং অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ।

এগার দফা রচনা

সকল ছাত্র সংগঠনের মিলিত কর্মসূচী ভিত্তিক একটি মঞ্চ তৈরী করা ছিল কঠিন ব্যাপার। কারণ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ যে কোনো ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীতে ৬ দফা ঢোকাতে চেষ্টা করতো । আর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ছিল নীতিগত দিক থেকে ছয় দফার শুধু বিরোধীই নয়, প্রতিবাদীও । ডাকসুর পক্ষ থেকেও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেওয়া সম্ভব ছিল না । কারণ ডাকসুতে এ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও এন. এস. এফ-এর মধ্যে বিভক্ত ছিল । ডাকসুর সহ-সভাপতি ছিলেন তোফায়েল আহমদ (ছাত্রলীগ) এবং সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরী (এন. এস. এফ) ।

এ ছাড়াও সঙ্কট ছিল । আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করার পর থেকে অব্যাহত নির্যাতন ও ধর-পাকড়ে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক অবস্থা ছিল সঙ্কটাপূর্ণ । ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সভাপতি সাইফুদ্দিন মানিক ও মেনন গ্রুপের সভাপতি মাহবুবউল্লাহ হুলিয়া মাথায় নিয়ে তখন ছিলেন আত্মগোপনে ।

তবু ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূত্রপাতের লক্ষ্যে আলোচনা শুরু হয় । কারণ বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রবল নৈরাজ্য ও বৈষম্য ছাত্র সমাজকে কঠিন শপথে উচচকিত করে তোলে । আর দেরী নয় । ডিসেম্বরের (১৯৬৮) মাঝামাঝি থেকে তাই আলোচনার সূত্রপাত । ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী পেতে

দীর্ঘ সময় লাগে। ইকবাল হলের ক্যান্টিনের নীচ তলার সিড়ির কামড়ায় প্রায় প্রতিদিন এ আলোচনা চলতে থাকে।

অবশ্য এ আলোচনার সূত্রপাত হয়ছিল ১৯৬৭ সাল থেকে। যে কোনো ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী আসলেই ছাত্রলীগ বলতো, ৬ দফা মানতে হবে। অন্যদিকে মেনন ও মতিয়াপন্থীরাও ভাঙ্গনের পর একই মঞ্চে এক সঙ্গে আসতে চাইতো না। এমন সঙ্কটের সময়ও ৬৭ সালের একুশকে কেন্দ্র করে ৯ দফা রচনা হয় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে একুশ পালিত হয়। ৯ দফাকে ১১ দফার একটা প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে ধরা চলে।[১৯৬]

ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপের) মধ্যকার দর কষাকষি ভাঙতে সাহায্য করে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)। মতিয়া গ্রুপ নীতিগতভাবে ছয় দফার বিরোধী ছিল না, তারা শুধু একে সীমাবদ্ধ কর্মসূচী মনে করতো। তারা এ প্রশ্নে শুধু বলতো, ছয় দফা ঠিক আছে, তবে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এর কোনো কথা নেই---এখানেই ছয় দফার দুর্বলতা।

অবশেষে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) আপোষ রফা হিসাবে ছয় দফাকে রেখেই অন্যান্য জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিষয় ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মসূচী এবং শিক্ষা বিষয়ক কতিপয় দাবীনামা পেশ করে। ছাত্রলীগ নেতা আবদুর রউফ রাজনৈতিক দাবী সমূহ এবং মতিয়া গ্রুপের নেতা সামসুদ্দোহা শিক্ষা বিষয়ক দাবী গুলির খসড়া তৈরী করে। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র বক্তব্য সমর্থন করে ছাত্রলীগ। দীর্ঘ বিতর্ক এবং সংযোজনী ও সংশোধনীর পর ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)ও এতে স্বাক্ষর করে। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্রলীগের সমর্থিত ৬ দফাকে ১১ দফার একটি দফায় ক.খ.গ. ইত্যাদি চিহ্নে রূপান্তরিত করে মোট এগারটি দফা প্রণয়ন করা হয়।[১৯৬]

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এভাবেই ঐতিহাসিক ১১ দফা রচনা সম্পন্ন হয়।

এতে স্বাক্ষর করে :

১. আবদুর রউফ, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ
২. খালেদ মোহাম্মদ আলী, সাধারণ সম্পাদক, ,,

---

১৯৫. সাক্ষাৎকার, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, তোফায়েল আহমেদ
১৯৬. সাক্ষাৎকার, সাইফুদ্দিন মানিক, তোফায়েল আহমেদ, নূরুল ইসলাম

৩. সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)

৪. সামসুদ্দোহা, সাধারণ সম্পাদক, ,,

৫. নূরুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)

৬. নূর মোহাম্মদ খান, প্রচার সম্পাদক, ,,

৭. তোফায়েল আহমেদ, সহ-সভাপতি, ডাকসু

৮. নাজিম কামরান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু

মেনন গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল্লাহ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাচপাত্তরের হত্যাকাণ্ডের পর পাবনার শাহপুরে আত্মগোপন অবস্থায় ছিলেন। একদিন খবরের কাগজে তিনি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও ১১ দফা কর্মসূচী প্রণয়নের সংবাদ দেখতে পান। "পত্রিকার এই সংবাদ দেখা মাত্রই অনুভব করলাম আমার অবিলম্বে ঢাকার পথে রওনা হওয়া উচিৎ। অন্যথায় সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে নেয়া সম্ভব হবে না। বিশেষ করে আমাদের সংগঠনের কর্মীদের পক্ষে ছাত্রলীগ ও মতিয়া গ্রুপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগুনো কঠিন হবে। এই প্রয়োজনীয়তা আমি আরও বেশী অনুভব করলাম যখন দেখলাম সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচীতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব নূরুল হাসান ও প্রচার সম্পাদক জনাব নূর মোহাম্মদ খান। পরিস্কার বোঝা গেল সংগঠনের সভাপতি জামাল হায়দার সহ 'বিশিষ্ট নেতৃবর্গ' সক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না'।[১৯৭]

ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)-র সভাপতি সাইফুদ্দিন মানিকও আত্মগোপন অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু তিনি ঢাকা শহরেই থাকাতে ঐক্য কর্মসূচীতে স্বাক্ষর করতে পেরেছিলেন। এই দুইজনই আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ২৪ জানুয়ারী একত্রে আত্মপ্রকাশ করেন।

১১ দফা কর্মসূচী জন সমক্ষে পেশ করার পূর্বে ডাকসুসহ মোট চারটি সংগঠনের পক্ষ থেকে সাতজন ছাত্র নেতা অন্দোলনের জন্য সারাদেশের ছাত্র সমাজকে প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিরে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। এতে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকল গণতান্ত্রিক

১৯৭. মাহবুবউল্লাহ, পূর্বোক্ত

বিরোধী দলগুলির প্রতিও আহ্বান জানানো হয়। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে জনাব তোফায়েল আহমদ ও নাজিম কামরান চৌধুরী (ডাকসু), সাইফুদ্দিন মানিক ও নূরুল ইসলাম (এপসু, মতিয়া), আবদুর রউফ ও খালেদ মোহাম্মদ আলী (ছাত্রলীগ), মোস্তফা জামাল হায়দার (এপসু, মেনন)।[১৯৮]

৪ জানুয়ারী (১৯৬৯) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ এগার দফা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে ডাকসু কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন। সাধারণত: ছাত্রদের সাংবাদিক সম্মেলন ডাকার রেওয়াজ ছিলনা, সে সময় বড় বড় রাজনৈতিক নেতারাই শুধু তা করতে পারতেন। ফলে ছাত্রদের এই সংবাদ সম্মেলনের খবরে অনেকেই সেদিন নাক সিঁটকালেন।[১৯৯]

কিন্তু এই কর্মসূচীই অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই সমগ্র জাতিকে পথ দেখায়।[২০০]

---

১৯৮. দৈনিক আজাদ, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৮

১৯৯. মাহফুজউল্লাহ, পূর্বোক্ত

২০০. মাহফুজউল্লাহ তাঁর 'অভ্যুত্থানের উনসত্তর' গ্রন্থে একটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেন। অভিযোগটি হলো, "ডাকের কর্মসূচী ঘোষিত হওয়ার পর, মতিয়া গ্রুপ অন্যদের সঙ্গে আলোচনা না করে ১১ দফা কর্মসূচীতে কিছু সংশোধন করে। কেননা কর্মসূচী মুদ্রণের দায়িত্ব ছিল মতিয়া গ্রুপের"। (পৃষ্ঠা, ৬১)। আমার কাছে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। উনসত্তরের আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন এমন কয়েকজন জনাব তোফায়েল আহমেদ, সাইফুদ্দিন মানিক, নূরুল ইসলাম প্রমুখকে আমি বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তাঁরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষাৎকারে আমাকে জানিয়েছেন 'এই অভিযোগ মিথ্যা এবং রাজনৈতিক অসততা'। এ প্রসঙ্গে তাঁরা আমাকে মাহফুজউল্লাহ সাহেবের বইয়ের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখান যে, 'তাঁর বইয়ের ৫৫ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, তিন সংগঠনের পক্ষ থেকে মোট ছয় জন ছাত্র নেতা ১১ দফা কর্মসূচীতে স্বাক্ষর করেছিলেন, এবং এইজন্য তিনি এর 'ফটোকপি দ্রষ্টব্য' বলে বন্ধনীতে যুক্ত করেছিলেন কিন্তু গ্রন্থের শেষে তিনি যে ফটোকপি ছেপেছেন তাতে মাত্র তিন জনের স্বাক্ষর রয়েছে। সুতরাং স্পষ্টই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, ফটো কপিটি এগার দফা কর্মসূচীর স্বাক্ষরিত কাগজ নয়। প্রকৃতপক্ষে, ডাকের সমালোচনা করে এগার দফা কর্মসূচীতে কোনো বক্তব্য গৃহীত হয় নি। তবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ডাকের দুর্বলতাকে সমালোচনা করে অনেক বিবৃতি মাঝে মাঝেই দিয়েছেন। মাহফুজউল্লাহ সাহেব পত্রিকায় পাঠানো অমন কোনো বিবৃতির ফটোকপিই ছেপে দিয়েছেন। ছাপানো ফটো কপিটি যে এগার দফা কর্মসূচীর নয় তা মাহফুজউল্লাহর গ্রন্থের ভাষাতেই প্রমাণ হয়।"

এগার দফার রূপরেখা

১. (ক) স্বচ্ছল কলেজগুলিকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং ইতিমধ্যে যেসব কলেজ প্রাদেশিকীকরণ করা হইয়াছে সেগুলিকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে

তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের উচ্চ ক্লাসে ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে হইবে

কারিগরি, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও কৃষি ছাত্রদের দাবী মানিতে হইবে। ছাত্র বেতন কমাইতে হইবে

নারী শিক্ষার প্রসার করিতে হইবে এবং শিক্ষা সংকোচন নীতি পরিহার করিয়া শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে

(খ) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রদান করিতে হইবে

(গ) শাসক গোষ্ঠির শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামান্য দলিল 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' ও 'হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট' বাতিল করিতে হইবে এবং ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে

২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩. নিম্নলিখিত দাবীসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দিতে হইবে:[২০১]

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেল শাসন ভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা, এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ

---

২০১. আওয়ামী লীগ প্রবর্তিত এবং ছাত্রলীগ সমর্থিত ছয় দফাকে এগার দফার এই ৩নং দফায় সন্নিবেশিত করা হয়েছিল।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে, দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোনো কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভেনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সাথে সাথে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংক সমূহের উপর পরীক্ষামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিতে হইবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এখতিয়ার-ধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হার অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে। এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদর দপতর স্থাপন করিতে হইবে।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্বশাসন প্রদান করতঃ সাব ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫. ব্যাংক, বীমা, ইনস্যুরেন্স ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬. কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহসিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মন প্রতি ৪০.০০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭. শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালা-কানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।[২০২]

ছাত্রদের কর্মসূচী ঘোষণার তিনদিন পর ৮ জানুয়ারী (১৯৬৯) রাজনৈতিক দলগুলো বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করার লক্ষ্যে ৮দফা দাবীনামার একটি মিলিত কর্মসূচী ঘোষণা করেন। (দৈনিক পাকিস্তান, ৯ জানুয়ারী, ১৯৬৯)। এতে দল হিসাবে স্বাক্ষর করেন :

১. সৈয়দ নজরুল ইসলাম : ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
২. আমীর হোসেন শাহ : ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
৩. মিয়া তোফায়েল : ভারপ্রাপ্ত আমীর, জামায়াতে ইসলাম পাকিস্তান
৪. মোহাম্মদ আলী : সভাপতি, নেজামে ইসলাম পার্টি

---

২০২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা, ৪০৫-৪০৮

৫. মুফতি মাহমুদ : সাধারণ সম্পাদক, জামায়াতে উলেমা-ই-ইসলাম
৬. মমতাজ দৌলতানা : সভপতি, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)
৭. নসরুল্লাহ খান : সভাপতি, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (পি,ডি,এম)
৮. নূরুল আমীন : সভাপতি, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এন,ডি,এফ)[২০৩]

সংক্ষেপে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (Democratic action committee) জোটের নাম রাখা হয় 'ডাক'। ভাসানী ন্যাপ ও পিপলস পার্টিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কিন্তু তাঁরা এই জোটে অংশ নিতে অস্বীকার করে। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ সভাপতি যথাক্রমে শেখ মুজিবুর রহমান এবং খান আবদুল ওয়ালী খান জেলে থাকায় তাঁদের পক্ষে ভারপ্রাপ্তরা স্বাক্ষর করেন।

কর্মসূচী নিয়ে দ্বন্দ্ব

ছাত্রদের ১১দফা কর্মসূচী রচনার পরও আন্ত:দলীয় মতাদর্শগত বিরোধ কমেনি। একই সঙ্গে রণকৌশল নিয়েও বিতর্ক চলে। ১১ দফা মেনে নেওয়ার জন্য ছাত্ররা 'ডাক' নেতৃবৃন্দের কাছে গিয়েছিলো। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের এই ইশতেহার 'ডাকে' অবস্থানরত দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহ মানতে অস্বীকার করে। তবে 'ডাকে' অবস্থানরত আওয়ামী লীগ ও ওয়ালী ন্যাপ নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

ছাত্ররা দল বেধে মাওলানা ভাসানীর কাছেও যায়। কিন্তু মাওলানা ভাসানীও ১১ দফার প্রতি সমর্থন জানাতে অস্বীকার করেন। তৎকালীন ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদের ভাষ্য অনুযায়ী, "মাওলানা ভাসানী ছাত্রদের খালি হাতে ফিরিয়ে দেন, মাওলানা ছাত্রদের বলেন, সামনের মাসে ভাসানী ন্যাপের সম্মেলনে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ১১ দফা সমর্থন করে বিবৃতি দিতে পারবেন না।"

প্রত্যক্ষ আন্দোলন কিভাবে এবং কত তারিখ থেকে শুরু করা হবে তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয় ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া এবং মেনন উপদলের সঙ্গে। মতিয়া গ্রুপ চাচ্ছিল বৃহত্তর রাজনৈতিক জোট 'ডাকে'র কর্মসূচীর সঙ্গে মিলিয়ে ছাত্রদের আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করবে। তাতে একই সঙ্গে আন্দোলন আরো বৃহত্তর পরিসরে জোরদার হবে। কিন্তু ভাসানী ন্যাপ যেহেতু 'ডাক' জোটে নেই,

২০৩. ইত্তেফাক, ৯ জানুয়ারী, ১৯৬৯

সেহেতু মেনন পন্থীরা উক্ত জোটের কর্মসূচী থেকে দূরে থাকতে চায় এবং আলাদা কর্মসূচীর জন্য চাপ দিতে থাকে।[২০৪]

শেষ পর্যন্ত ডাক নেতৃবৃন্দ ১৭ জানুয়ারী পল্টনে বিকালে সমাবেশ ও মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেন। অবশেষে ছাত্ররাও একই দিন সকালে বটতলায় জমায়েতের কর্মসূচী ঘোষণা করে। সিদ্ধান্ত হয় যে যদি সরকার এই সমাবেশ-মিছিলের ওপর ১৪৪ ধারা জারী করে তাহলে ৩ জন ৩ জন করে শোভাযাত্রা বের করা হবে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অভ্যন্তরে ১৭ জানুয়ারীর কর্মসূচীর তারিখ নিয়ে যে তীব্র বিতর্ক হয়েছিল তা জানা যায় একটি সংগঠনের প্রতিবেদন থেকে :

"ডাক সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে নাই। কিন্তু ১৭ জানুয়ারী সারা পাকিস্তান ব্যাপী দাবী দিবস পালনের আহবান দেয়। আমরা এই দিবস হইতেই প্রত্যক্ষ আন্দোলনের সূচনা করিবার জন্য প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছিলাম। কারণ আয়ুবশাহীর অবসানের জন্য সারা পাকিস্তান ব্যাপী একই দিনে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার তাৎপর্য ও গুরুত্ব ছিল খুবই বেশী। কিন্তু কেহ কেহ বিভেদমূলক চিন্তা ও সংকীর্ণতা বোধ হইতে ১৭ জানুয়ারী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু না করিয়া তারিখটি আগে-পিছে করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অবশেষে ছাত্রকর্মীদের সমর্থনে আমাদের প্রস্তাব পাশ হয় ও ফলে ১৭ জানুয়ারী হইতে ১১ দফার দাবীতে সারা পূর্ব বাংলা ব্যাপী ছাত্র সমাজের প্রত্যক্ষ জঙ্গী সংগ্রাম শুরু হয়।"[২০৫]

প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরু

১৭ জানুয়ারী সভার পূর্বেই ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। সুতরাং সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় আয়োজিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্ধারিত সভায় নতুন কর্তব্য উপস্থিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের এটি ছিল প্রথম ছাত্রসভা। এতে সভাপতিত্ব করে ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ।[২০৬]

---

২০৪. সাক্ষাৎকার, নূরুল ইসলাম, তোফায়েল আহমেদ, সাইফুদ্দিন মানিক এবং মাহবুব উল্লাহ, পূর্বোক্ত

২০৫. ঐতিহাসিক এগার দফা কর্মসূচী ও এগার দফা প্রতিষ্ঠার পথ, কেন্দ্রীয় সংসদ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ৩১/১ হোসেনী দালান রোড থেকে সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত, জানুয়ারী ১৯৭০

২০৬. অনেক গ্রন্থে এবং প্রবন্ধে একথা বারবার লেখা হয়েছে যে, তোফায়েল আহমেদ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক ছিলেন। আসলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কোনো আহবায়কই ছিলো না। তোফায়েল আহমেদ সেসময় ডাকসুর সহ-সভাপতি ছিলেন। এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ভূমিকা ছিল অন্যতম ব্যতিক্রম।

এদিন ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেই মিছিল বের করতে চেষ্টা করে। কলা-ভবনের মূল রাস্তা পুলিশ এবং রায়ট-কার দ্বারা ছিল অবরুদ্ধ। ছাত্ররা বের হতে চেষ্টা করতেই গাড়ী থেকে ছাত্রদের লালপানি ছিটিয়ে দেওয়া হয়, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং লাঠিচার্জও করা হয়। (দৈনিক পাকিস্তান, ১৮ জানুয়ারী, ১৯৬৯)।

বিকালে বায়তুল মোকাররমে ডাকের জনসভায় একই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পুলিশ এক পর্যায়ে মসজিদেও যায় এবং ঢুকে নামাজী ও বিক্ষোভকারীদের পেটাতে শুরু করে।

পরদিন ১৮ জানুয়ারী প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ডাকে। ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে কয়েকদফা সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ এক পর্যায়ে খণ্ডযুদ্ধে রূপ নেয়। ফলে ই. পি. আর (বর্তমানে এই আধা সামরিক বাহিনীর নাম বি. ডি. আর) বাহিনী তলব করা হয়। সন্ধ্যায় ই. পি. আর বাহিনী ছাত্রাবাসগুলোতে হামলা চালায় এবং তল্লাসী করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও খবরের কাগজের ফটোগ্রাফাররাও ই.পি.আরের হাতে লাঞ্ছিত হন। বিভিন্ন হল থেকে ২০ জন এবং শহর থেকে মোট ৩৪ জনকে এদিন গ্রেফতার করা হয়। (দৈনিক পাকিস্তান, ১৯ জানুয়ারী, ১৯৬৯)।

পরদিন ১৯ জানুয়ারী রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছিল। কিন্তু এই হামলার প্রতিবাদে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এদিন বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ বাধা দেয় এবং ৮ জনকে গ্রেফতার করে।

এন.এস.এফ-এ ভাঙ্গন

এসময়ের ছাত্র আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠন এন. এস. এফ-এ ভাঙ্গন। এন. এস. এফ-এর দ্রোহী অংশটিকে সমর্থন করতেন সবুর খান। এন. এস. এফ নেতা মাহবুবুল হক দোলন ও ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরী সবুর খানের সমর্থক ছিল।

১৮ জানুয়ারী এই উপদল সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেয়। ২০ জানুয়ারী এই অংশ জমির আলী (আইয়ুব-মোনেম সমর্থিত) উপদলের বিরুদ্ধে একটি প্রকাশ্য প্রচার পত্র বের করলে ভাঙ্গন চূড়ান্ত পর্বে যায়। বিদ্রোহী উপদল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। কিন্তু অতীতে তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও তৎপরতার দুঃখময় স্মৃতি সংগ্রামী ছাত্র সমাজকে

নেতিমুখী করে তোলে। তবে রণকৌশলগত কারণে সরকারী দলের ভাঙ্গন ও নতুন কোনো সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা মোকাবেলার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হতে পারে ভেবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের সম্পর্কে ইতিবাচক ভূমিকা নিতে প্রস্তুত ছিল।

অঘটন

২০ জানুয়ারী (৬৯)-এর ঘটনা সমস্ত আন্দোলনের চরিত্রকেই ভিন্নখাতে রূপান্তর করে। পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী বটতলা থেকে ঐদিন মিছিল বের হওয়ার কথা ছিল। এদিন ছাত্রদের হাতে হাতে লাঠি দেখা যায়। শহীদ মিনার পাড় হয়ে যাওয়ার সময় মিছিল পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে সমগ্র মিছিলটি আর অখণ্ডভাবে ধরে রাখা সম্ভব হয় না। অগ্রভাগ বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলের শেষাংশের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা তাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

মিছিলের শেষাংশে যারা ছিল তাদের সঙ্গে এক পর্যায়ে পুলিশের সংঘর্ষ বেধে যায়। এখানে পুলিশ ইন্সপেক্টরের পিস্তলের গুলিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান[২০৭] শাহাদাৎ বরণ করে। (দৈনিক পাকিস্তান, ২১ জানুয়ারী, ১৯৬৯)।

জীবনের দাবী আজ এতই বিরাট

আসাদ নিহত হওয়ার খবর সারা শহরে ছড়িয়ে পরার পর সঙ্গে সঙ্গে এক অভূত-পূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। ঠিক যেমন ৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী। সকল শ্রেণীর মানুষ এবং ছাত্র-ছাত্রীরা মেডিক্যাল-কলেজের দিকে ছুটে আসতে থাকে। ২.৩০ মিঃ অশ্রুভারাক্রান্ত অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা তাৎক্ষণিকভাবে এক শোক সভায় মিলিত হয়। এতে বক্তৃতা করে ডাকসু নেতা তোফায়েল আহমেদ ও

২০৭. শহীদ আসাদের দেশের বাড়ী নরসিংদী জেলার হাতিরদিয়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন তিনি। স্নাতকোত্তর ডিগ্রীও লাভ করেছিলেন। কিন্তু সেই ফল তাঁর মন মতো না হওয়ায় পুনরায় মানোন্নয় পরীক্ষা দেন। একই সঙ্গে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকা কেন্দ্রীয় আইন মহাবিদ্যালয়ে। সাংগঠনিকভাবে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) গ্রুপের ঢাকা হল (বর্তমানে শহীদুল্লাহ হল) শাখার সভাপতি ছিলেন। রাজনৈতিকভাবে তিনি ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) গ্রুপের মধ্যকার বিরাজমান বিভিন্ন উপদলের একটি, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এপস্থ (মতিয়া) নেতা সামসুদ্দোহা। শহীদদের আত্মার সম্মানে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ২.৩৭ মিঃ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে কাল পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩.০২ মিঃ এক বিরাট শোক মিছিল বের হয়। এর অগ্রভাগে ছিল ছাত্রী বোনেরা। বিশেষ করে ইডেন কলেজের ছাত্রীরা। ইডেন কলেজে এ নিয়ে খানিক ঘটনাও ঘটে। মেয়েদের মধ্যে উত্তেজনা লক্ষ্য করে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রধান ফটক বন্ধ করে রাখে। কিন্তু মেয়েরা তা উপেক্ষা করে বেড়িয়ে আসে। শোক মিছিলের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় দুই মাইল।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সারা দেশে আসাদ স্মরণে তিনদিনব্যাপী শোক কর্মসূচী ঘোষনা করে। ২১ জানুয়ারী ঢাকা শহরে হরতাল, ২২ জানুয়ারী শোক দিবস, ২৩ জানুয়ারী সন্ধ্যায় মশাল মিছিল।

আসাদের লাশ নিয়েও হাঙ্গামা বাধে। সরকার আসাদের লাশ আটকাতে চেয়েছিল। কিন্তু ছাত্র-জনতা এ লাশ নিয়ে যাবে হাতিরদিয়ায়। অবশেষে ছাত্র-জনতারই হল জয়।

চটগ্রাম ও রাজশাহীতেও এদিন প্রচণ্ড ছাত্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ২১ জানুয়ারী ঢাকা শহরে পালিত হয় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাল পতাকা উড়ানো হয়। পল্টন ময়দানে জনসভারও আয়োজন করা হয়েছিল। সেই জনসভায় ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ আসাদের গায়েবানা জানাযায় অংশ নেয়। আসাদের রক্তমাখা সার্ট নিয়ে বিরাট-দীর্ঘ মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে।

২২ জানুয়ারী ঐতিহাসিক শোক মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলা থেকে বের হয়ে সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করে।

২৩ জানুয়ারী সন্ধ্যায় মশাল মিছিলে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। মিছিল শেষে পরদিন ২৪ জানুয়ারী ঢাকা শহরে হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

বিভেদমূলক প্রচার পত্র

২৩ জানুয়ারী মশাল মিছিল বের করার পূর্ব মুহূর্তে একটি প্রচারপত্র সাধারণের মধ্যে গোপনে বিলি করা হয়। প্রচারপত্রটি আইয়ুব বিরোধী রাজনৈতিক জোট ডাকের বিরুদ্ধে ছিল। স্বভাবিকভাবেই ডাকের সমর্থক ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) থেকে তার প্রতিবাদ ওঠে। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে যায়

যে, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে এর বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব নেওয়ারও চেষ্টা করা হয়। কারণ ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দারও এই হঠকারী কাজের বিরুদ্ধে ছিল।

এগার দফা অন্দোলনের অন্যতম নেতা ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) সাধারণ সম্পাদক মাহবুবল্লাহ এ বিষয়টির স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, "ড্যাক বিরোধী ইশতেহার বিলি নিয়ে ছাত্রলীগ ও মস্কোপন্থী ছাত্রনেতারা উষ্মা প্রকাশ করলেন। এমনকি জামাল হায়দারও আমাদের ছাত্র ইউনিয়নের এক কর্মীসভায় বললেন, যদি আমাদের কর্মীরা কেউ একাজ করে থাকে তাহলে তারা খুব নিন্দনীয় কাজ করেছে।"[২০৮]

(প্রকৃতপক্ষে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপে তখন বহু উপদল কাজ করতো। অথচ এই গ্রুপের সবাই ছিল মাও সে তুং-এর চিন্তাধারার অনুসারী। কিন্তু একই চিন্তার হলেও ছাত্রসংগঠনটি যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মাওসে তুংপন্থী)-র সঙ্গে যুক্ত ছিল তাই পার্টির আন্তঃকোন্দল ছাত্রকর্মীদের মধ্যেও পড়েছিল। মূল পার্টির একাংশের নেতৃত্বে ছিলেন সখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল হক। এদের বিরোধী পক্ষ ছিলেন আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন আহাম্মদ ও দেবেন সিকদার। এঁরা মেঘনা সংঘ নামে কাজ চালাতেন এবং পার্টির নাম রেখেছিলেন পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি। ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপে এই দুই ধারা ছাড়াও সিরাজ শিকদার, মাহবুবউল্লাহ এবং আবুল কাসেম ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন অন্য একটি গ্রুপও ছিল। এসব প্রকাশ্য উপদল। ভেতরে ভেতরে আরো উপদল ও উপমত ছাত্র ইউনিয়নে (মেনন) গ্রুপে কাজ করতো। একদল মূল পার্টির নেতা হক-তোয়াহার সমর্থক ছিল, এরপর আবদুল মতিনেরও একদল সমর্থক ছিল, কাজী জাফরের অনুসারীও ছিল এক বিরাট সংখ্যায়।

তত্ত্বগত দিক থেকে হক-তোয়াহা মনে করতেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো রেখেই পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আবদুল মতিনের অংশ পূর্ব বাঙলার আলাদা সত্ত্বার পক্ষে ছিলেন।

মাও সে তুং পন্থীদের মধ্যে এতো দল-উপদলের একটা তত্ত্বগত ভিত্তিও ছিল। চীন বিপ্লবের নেতা মাও সে তুং, এমনিতে সব সময় বলতেন, শতফুল ফুটতে দাও। এর অর্থ হল, নানা মত ও মতাদর্শ বিকশিত হতে দেওয়া দরকার।

২০৮. মাহবুবউল্লাহ, পূর্বোক্ত

এর ফলে মাও সে তুং অনুসারীরা যারা যেখানেই ছিলেন, তারাই আলাদা মতের হয়ে একটা গ্রুপ বা উপদলের সৃষ্টি করতেন এবং সবাই নিজেদের একমাত্র সাচ্চা বিপ্লবী মনে করতেন।

বিষয়টি অন্যভাবে বিশ্লেষণ করেছেন একজন মাও সে তুং অনুসারী। তিনি লিখেছেন,

"এদিকে গণচীনেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা হল। চেয়ারম্যান মাও হেড কোয়া-র্টারে তোপ দাগার আহবান জানালেন। আমরাও মনে করলাম, রাজনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্যে হেড কোয়ার্টারে তোপ দাগার প্রয়োজনীয়তা আছে অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে নেতৃত্বকে অস্বীকার করতে হবে।"২০৯

প্রকৃতপক্ষে এই চিন্তার বশবর্তী হয়ে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার লেনিণীয় নীতিমালাকে বিসর্জন দেওয়া হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ও পরবর্তী সময়ে বাঙলাদেশেও এই ধারা নেতিমূলক রাজনীতির সৃষ্টি করে এবং তা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে)।

৬৯-এর জানুয়ারীতে মাহবুবউল্লাহ নেতৃত্বাধীন এই অংশের উদ্যোগেই বিভেদমূলক প্রচারপত্রটি ছাড়া হয়েছিল।

২৪ জানুয়ারী : গণঅভ্যুত্থান

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতার লড়াকু মেজাজের পরিচয় ফুটে উঠেছিল বায়ান্নোর ফেব্রুয়ারীতে এবং বাষট্টির সেপ্টেম্বরে। কিন্তু উনসত্তরের জানুয়ারীতে একের পর এক যেভাবে ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল তখন কেউ না বুঝতে পারলেও লড়াকু বাঙালী যে কিছুদিনের মধ্যেই অস্ত্র ধরে বাঙলাদেশ স্বাধীন করে ফেলবে তার চিহ্ন প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

এদিন পূর্ব ঘোষিত হরতালে ঢাকা শহর মানুষে মানুষে প্লাবন ডেকে আনে। হরতাল পূর্ণভাবে সফল হয়। নগরীতে সেনাবাহিনীও তলব করা হয়। সচিবালয়ের সামনে পাখীর মত গুলি করে হত্যা করা হয় প্রথমে ছাত্রকর্মী রুস্তম আলীকে, পরে স্কুল বালক (নবকুমার ইনিষ্টিটিউটের) কিশোর মতিয়ুর রহমানকে। বৈদ্যুতিক তার বেয়ে মানুষ সচিবালয়ের এয়ার কণ্ডিশনের বাক্স ভাঙতে যাচ্ছে। গুলি খেয়ে সেই তার থেকে ছিটকে পড়ছে একজন। আর তা দেখে কিন্তু

২০৯. মাহবুবউল্লাহ, পূর্বোক্ত

কেউ থামছে না। আরেকজন উঠছে। এতটা উন্মত্ত ও হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য হয়ে পড়ে লড়াকু জনতা।[২১০]

সমগ্র নগরী এক অভূতপূর্ব শিহরণে জেগে উঠে। ছাত্র-জনতার মধ্যে এমন একটা লড়াকু মনোভাব জাগ্রত হয়ে উঠে যে তা যে কোনো সময় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারে। নেতৃবৃন্দ জনতার এই অগ্নিমূর্তি দেখে ভয়াবহ কিছু ঘটনার আশঙ্কায় (যা সামগ্রিকভাবে মূল আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে) ভাবিত করে তোলে

লক্ষ লক্ষ মানুষ পল্টনে দুই শহীদের লাশ নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর অপেক্ষায়, আর ঐ দিকে গভর্ণর হাউজে সেনাবাহিনী কামান-মেশিনগান তাক করে প্রস্তুত। যে কোনো সময় প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ ঘটে যেতে পারে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ছিল কিংকর্তব্য বিমূঢ়। কি করে একটা অনাহূর্ত রক্তাক্ত ও বিয়োগান্ত ঘটানো এড়ানো যায় তা সকলকেই চিন্তিত করে তুলছিল। অবশেষে শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দরুদ পাঠ করার জন্য মাইকে ঘোষণা দেওয়া হয়।[২১১]

এই ঘটনা সেদিন লক্ষ প্রাণ রক্ষার সহায়ক হয়ে উঠেছিল। শহীদদের জানাজা শেষে দরুদ পড়তে পড়তে মিছিল এগিয়ে গেল ইকবাল হলের দিকে। সেখানে একের পর এক বক্তৃতা করলেন তোফায়েল আহমেদ, সাইফুদ্দিন মানিক, মাহবুব উল্লাহ। প্রবীন ছাত্রলীগ নেতা সিরাজুল আলম খানও সেখানে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে লম্বা এক বক্তৃতা করেন। এদিনই ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) সভাপতি সাইফুদ্দিন মানিক ও মেননপন্থী সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল্লাহ আত্মগোপন অবস্থা থেকে প্রকাশ্যে আসে।

শহীদ মতিয়ুরের পিতাও এ সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি উপস্থিত লক্ষ লক্ষ বিক্ষোভকারীকে 'মতিয়ুর' বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তী কর্মসূচী দেওয়ার জন্য ছাত্র-জনতার থেকে চাপ আসলে পরদিন ২৫ জানুয়ারীই আবার সর্বাত্মক হরতালের কথা ঘোষণা করা হয়।

এদিন থেকে ইকবাল হল শুধু আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠলোনা, এক পর্যায়ে এসে প্রশাসন নিয়ন্ত্রণেরও কেন্দ্র হয়ে পড়ে। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও

---

২১০. সাক্ষাৎকার, নূরুল ইসলাম

২১১. সাক্ষাৎকার, তোফায়েল আহমদ, সাইফুদ্দিন মানিক, নূরুল ইসলাম

এরপর থেকে ইকবাল হলে ছাত্র নেতৃবৃন্দের কাছে আসতেন পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য।

সন্ধ্যায় বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খান, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অব্যাহত সান্ধ্য-আইন জারীর কথা ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা দেন, গোটা শহরের নিয়ন্ত্রণভার সেনাবাহিনীর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

খুলনার দৌলতপুর ও খালিশপুরে এদিন গুলিবর্ষণে ৩ জন নিহত এবং বহু সংখ্যক আহত হয়।

২৫ জানুয়ারী ই.পি.আর ও সেনাবাহিনী রাস্তায় এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে। যত্রতত্র দিক-বিদিক তারা গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। তেজগাঁও-এর নাখাল পাড়ায় বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর সময় একজন মাতা, আনোয়ারা বেগম এমনি এক গুলিতে নিহত হন।

ফেব্রুয়ারীর ১ তারিখে আইয়ুব খান কিছুটা নরম হয়ে উঠেন। মাস পহেলা বক্তৃতায় তিনি আলাপ আলোচনার প্রস্তাব করেন। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদসহ সকল রাজনৈতিক গোষ্ঠি থেকে শেখ মুজিব, ওয়ালী খান, জুলফিকার আলী, ভুট্টো সহ সকল রাজবন্দীকে জেলে রেখে এমন আলাপ আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখান করা হয়।

৬ ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খান ঢাকায় আসেন। এটাই তাঁর জীবনের শেষ ঢাকা সফর।

এ উপলক্ষে ঢাকা শহরের সকল যানবাহন, দোকানপাট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'আইয়ুব ফিরে যাও' পোষ্টার লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং কাল পতাকা উত্তোলন করা হয়। পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী স্কুল-কলেজের ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব নির্মিত কলা ভবনের সামনে জমায়েত হয়। সমাবেশে বক্তৃতা করতে গিয়ে ডাকসু নেতা তোফায়েল আহমেদ গোল টেবিল বৈঠকের পূর্ব শর্ত হিসাবে শেখ মুজিব, ওয়ালী খান, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, ভুট্টোসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী এবং মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল হক ও মোহাম্মদ ফরহাদের উপর থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহরের দাবী জানান। (দৈনিক পাকিস্তান, ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯)।

৯ ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শপথ দিবস পালন করে। এ উপলক্ষে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ১১ দফা আন্দোলন আপোষহীনভাবে চালিয়ে নেওয়ার শপথ গ্রহণ করে ছাত্র-জনতা। সমাবেশে এক প্রস্তাবে অবিলম্বে শেখ মুজিব, মণিসিংহ, তাজউদ্দিন আহমদ, মতিয়া চৌধুরী আবদুর রাজ্জাক, রাশেদ খান মেনন, সন্তোষ ব্যানার্জী, মন্মথ দে প্রমুখের মুক্তি দাবী করা হয়। একই সঙ্গে অনিল মুখার্জি, জ্ঞান চক্রবর্তী, কাজী জাফর, চৌধুরী হারুন, মোহাম্মদ ফরহাদ, নাসিম আলী প্রমুখের উপর থেকে হুলিয়া প্রত্যাহারের দাবী জানায়। সভা ইত্তেফাকের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়ারও দাবী করে। এক বিশেষ প্রস্তাবে অবিলম্বে গভর্ণর মোনায়েম খানের পদত্যাগ দাবী করা হয়। আইয়ুব নগরের নাম শেরে বাংলা নগর, আইয়ুব গেটের নাম আসাদ গেট, আইয়ুব চিলড্রেনস পার্কের নাম মতিউর শিশু পার্ক রাখারও প্রস্তাব করা হয়। (দৈনিক সংবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯)।

১২ ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খান ঢাকা ত্যাগ করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারে তার অসম্মতির কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, এর সঙ্গে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা জড়িত।

১৪ ফেব্রুয়ারী সম্মিলিত রাজনৈতিক জোট ডাক-এর উদ্যোগে সারাদেশে হরতাল পালিত হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারী ঢাকা সেনানিবাসে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেণ্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়। সরকার এক প্রেসনোটে দাবী করেন যে, আসামী পালাতে চেষ্টা করেছিল।

১৬ ফেব্রুয়ারী মাওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে বিক্ষুব্ধ বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, প্রয়োজনবোধে করাচী বিপ্লবের মতো জেলের তালা ভেঙ্গে শেখ মুজিবকে নিয়ে আসবেন। সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত জনতার পক্ষ থেকে শ্লোগান উঠে 'জেলের তালা ভাঙ্গবো, শেখ মুজিবকে আনবো'। লাখো মানুষের কণ্ঠে এই আওয়াজ চারদিক প্রকম্পিত করে তোলে। মাওলানা ভাসানীর ইমামতিতে উপস্থিত ছাত্র-জনতা সার্জেণ্ট জহুরুল হকের গায়েবানা জানাযা পড়েই শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সভা শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রাদেশিক যোগাযোগ মন্ত্রী সুলতান আহমদ এবং পূর্তমন্ত্রী মংশুপ্রু চৌধুরীর আবদুল গণি রোডস্থ সরকারী

বাসভবনে বিক্ষুব্ধ মানুষ-সকল আগুন লাগিয়ে দেয়। এরপর এ আগুন ছড়িয়ে পড়ে নগরীর নানা স্থানে, আরো বিভিন্ন সরকারী বাসভবনে। কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের পরিবাগস্থ বাসভবন, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা হাসান আসকারীর বাসভবন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারক বিচারপতি এস. এ. রহমানের বাসভবন ইত্যাদি জনতার রুদ্ররোষে ভস্মিভূত হয়।

পরিস্থিতি প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সন্ধ্যায় সাঁজোয়া গাড়ী সহ সেনাবাহিনী শহরের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে এবং সান্ধ্য আইন জারী করা হয়।

১৮ ফেব্রুয়ারী সেনাবাহিনী ও পুলিশ রাজশাহীতে বর্বরতম কাজ করে বসে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেই মিছিল বের করার চেষ্টা করলে প্রিয় শিক্ষক ডঃ শামসুজ্জোহা অদূর থেকে দেখতে পান---ছাত্ররা তোপের মুখে। বের হলেই গুলি করে সব মেরে ফেলবে। তিনি দৌড়ে যান ছাত্রদের কাছে। ফটকের সামনে ও বাইরে তিনি ছাত্রদের বুঝিয়ে যখন ফিরে আসছিলেন ঠিক তখনই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর একজন অফিসার তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ান এবং সামনে দাঁড়ানো সৈনিককে তাঁকে (জোহাকে) হত্যার নির্দেশ দেন। ডঃ জোহা তাঁর পরিচয় দেন। কিন্তু খুনীদের থেকে তিনি রক্ষা পান না। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।[২১২]

অনেকে লিখেছেন ডঃ জোহাকে গুলি করা হয়েছিল, প্রকৃত পক্ষে তাঁকে বেয়নেট খুঁচিয়ে আরো নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় রাজশাহীতে নুরুল ইসলাম নামে আরো একজন নিহত হয়।

ঢাকায় এ খবর ছড়িয়ে পড়তে রাত হয়ে যায়। সান্ধ্য আইন জারী ছিল পূর্বেই। কিন্তু সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ পাগলের মতো রাস্তায় বেড়িয়ে আসে। নেতৃবৃন্দের কাছে তারা অস্ত্রের জন্য ধর্ণা দিতে থাকে। সেনাবাহিনীর গুলিকে প্রতিরোধ করার জন্য উন্মত্ত জনতা ঢেউটিন নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। কত মানুষ যে এই রাতের অন্ধকারে নিহত হন সে রহস্য আজো উদঘাটিত হয় নি।

২০ ফেব্রুয়ারী সারা শহরে এক গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, শেখ মুজিব ছাড়া পেয়েছে। বিকালের দিকে আচমকা সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করলে হাজার হাজার মানুষ দৌড়ে ছুটে যায় ইকবাল হলের দিকে।

---

২১২. সাক্ষাৎকার, ডঃ ম, আখতারুজ্জামান, সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

সন্ধ্যায় এখান থেকে আগামীকাল একুশের কর্মসূচী প্রস্তাতলগ্নে মশাল মিছিল বের করা হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পল্টন ময়দানে এক গণসমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

সরকার থেকে অনেক বছর পরে এবার একুশে উপলক্ষে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয় (যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে আর একবার একুশে উপলক্ষে সরকারী ছুটি দেওয়া হয়েছিল)।

২২ ফেব্রুয়ারী বহু প্রতিক্ষিত রাজবন্দীদের মুক্তি সম্ভব হয়। শেখ মুজিবসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য আসামীরাও মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি লাভ করেন নিরাপত্তা আইনের ৩৪ জন বন্দীও (এঁরা বেশীরভাগ ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির)।

মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ১১ দফার প্রতি তাঁরও সমর্থন আছে, কারণ ১১ দফার মধ্যে তাঁর ছয় দফাও রয়েছে।[২১৩]

২৩ ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট রাজনীতিকদের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এতে ছিলেন শেখ মুজিব, মাওলানা ভাসানী, মণি সিংহ এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো। দীর্ঘক্ষণ এ নিয়ে ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা চলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহের ব্যাপারে আপত্তি তোলে।[২১৪]

সমঝোতা না হওয়ায় দুটি ভিন্ন সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। শেখ মুজিবের জন্য রেসকোর্সে এবং মণি সিংহ, অমল সেন ও কে এম ওবায়েদুর রহমান সহ সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত অন্যান্য রাজবন্দীদের জন্য পল্টন ময়দানে।

রেসকোর্সের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের) সভায় বক্তৃতা করেন তোফায়েল আহমদ, খালেদ মোহাম্মদ আলী (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ), সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, মতিয়া), মাহবুবউল্লাহ (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, মেনন), মাহবুবুল হক দোলন (জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন, এন. এস. এফ)। রেসকোর্সের সংবর্ধনায় জনতার ঢল নামে।

---

২১৩. বাংলাদেশ অবজারভার, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

২১৪. সাক্ষাৎকার, সাইফুদ্দিন মানিক, নুরুল ইসলাম, মাহবুবউল্লাহ, মাহফুজউল্লাহ

বক্তৃতা পর্বের শেষে উপস্থিত ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে ডাকসু'র সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ, শেখ মুজিবর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।[২১৫]

পূর্ব পাকিস্তানের যে সকল সদস্য কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের পদত্যাগের সময়সীমা বেধে দিয়েছিলেন। ১ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় পদত্যাগের সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) আপত্তিসহ এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। ৭ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে তীব্র বিতর্কের পর মৌলিক গণতন্ত্রীদের পদত্যাগের সময়সীমাও বাড়ানো হয়। ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ উপলক্ষে এদিনই রাত ১১ টায় কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয় নি।

নিহত তালিকা : ১৯৬০-১৯৬৯

আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে নিহত ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের আত্মাহুতির একটি খতিয়ান দেওয়া হলো।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তালিকাটি স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণাঙ্গ নয় এই জন্য যে প্রশাসন ও তথ্যমাধ্যম জটিলতার মধ্যে যতোখানি খবর অন্তত: পত্রিকা অফিস পর্যন্ত আসতে পেরেছে ততোটুকুর উপর ভিত্তি করেই তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে।[২১৬]

১৯৬০ :

ঢাকায় : ১ জন

কুমিল্লায় : ৫ জন মোট ৮ জন

চট্টগ্রামে : ২ জন

১৯৬১ :

রংপুর : ২ জন মোট ২ জন

১৯৬২ :

ঢাকা : ৫ জন

করাচী : ১ জন মোট৬ জন

২১৫. শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হবে এমন কথা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অপরাপর সদস্যদের পূর্বে জানানো হয় নি বলে ছাত্রলীগ বহির্ভূত অন্যান্য সদস্যরা জানিয়েছেন।

২১৬. তালিকাটি করতে সাহায্য নেওয়া হয়েছে সাপ্তাহিক পূর্বদেশ, ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ এবং দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ জানুয়ারী, ১৯৭০-এর সংখ্যা

১৯৬৩ :

কুমিল্লা : ৩ জন
নোয়াখালি : ২ জন
রাজশাহী : ২ জন
সিলেট : ২ জন মোট ২৪ জন
কুষ্টিয়া : ১ জন
করাচী : ৪ জন
লাহোর : ৪ জন
যশোর : ৬ জন

১৯৬৪ :

খুলনা : ৫ জন
কুমিল্লা : ২ জন মোট ৯ জন
করাচী : ২ জন

১৯৬৫ :

করাচী : ২০ জন মোট ২০ জন

১৯৬৬ :

পূর্ব পাকিস্তান
(সব মিলিয়ে) : মোট ১২ জন

১৯৬৭ :

রংপুর : ১ জন
পাবনা : ১ জন মোট ২ জন

১৯৬৮ :

ঢাকা : ৫ জন
চট্টগ্রাম : ১ জন
বগুড়া : ২ জন মোট ১৫ জন
রাওয়ালপিণ্ডি : ৩ জন
মুলতান : ৪ জন

১৯৬৯ :

ঢাকা	: ৩৮ জন	
খুলনা	: ৭ জন	
নোয়াখালী	: ৫ জন	
ময়মনসিংহ	: ৪ জন	
চট্টগ্রাম	: ৩ জন	মোট ৬১ জন
রাজশাহী	: ১ জন	
কুমিল্লা	: ১ জন	
কুষ্টিয়া	: ১ জন	
বরিশাল	: ১ জন	

৬৯-এর এই শহীদদের তালিকা পেশার ভিত্তিতে দাঁড় করালে নিম্নরূপ চিত্র ভেসে ওঠে :

শ্রমিক	: ২৯ জন
ছাত্র	: ২১ জন
কৃষক	: ৩ জন
শিক্ষক	: ২ জন
চাকুরীজীবী	: ৩ জন
সৈনিক	: ১ জন
গৃহবধু	: ১ জন
অজ্ঞাত	: ১ জন

শ্রমিকদের মধ্যে আবার বিভিন্ন পেশার কর্মজীবী :

হোটেল বয়	: ১ জন
আইসক্রীম বিক্রেতা	: ১ জন
দর্জি	: ১ জন
নৌকা মাঝি	: ১ জন
দোকান কর্মচারী	: ১ জন
সাইকেল মিস্ত্রী	: ১ জন
প্রেস কর্মী	: ১ জন
কাঠ মিস্ত্রী	: ১ জন
ওয়াপদার কর্মী	: ১ জন
সাধারণ শ্রমিক	: ২০ জন

গোল টেবিল বৈঠক

এদিকে ২৬ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডিতে রাজনৈতিক নেতাদের প্রথম দফা গোল টেবিল বৈঠক শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে শেখ মুজিবুর রহমান, ওয়ালী ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর, বিচারপতি এস. এম. মোর্শেদ সহ অনেকেই যোগদান করেন। মাওলানা ভাসানী এই বৈঠক বর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে আতাউর রহমান খানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

১০ মার্চ পুনরায় দ্বিতীয় এবং শেষ দফা বৈঠক শুরু হয়। এতে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা ও ১১ দফা উত্থাপন করেন। তিনি সেখানে সকলের উদ্দেশ্যে বলেন,

"কোন্ সব মৌলিক সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া দেশে আজ গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়া গেল তাহা নির্ণয় করিয়া অবিলম্বে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে যদি আমরা ব্যর্থ হই, তবে তাহার চাইতে বিপর্যয়কর আর কিছু হইতে পারে না।...

জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার বিলুপ্তির প্রশ্নটি আজ কয়েক দফা সুস্পষ্ট দাবীর আকারে প্রকাশ পাইয়াছে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের ১১ দফা ও আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচীতে।...

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অবিচারের প্রশ্নটিরও প্রতিফলন ঘটিয়াছে ছাত্র সমাজের রচিত ১১ দফা কর্মসূচীতে। এ প্রশ্নে তাহারা দেশের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা পদ্ধতির পুণর্গঠনের জন্যও সুস্পষ্ট দাবী উত্থাপন করিয়াছে।

...ছাত্রদের যে ১১ দফা কর্মসূচীর প্রতি আমি সমর্থন জানাইয়াছি তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক ও শিক্ষা পদ্ধতি পুণর্বিন্যাসের যথোপযুক্ত প্রস্তাব রহিয়াছে। এ দাবী তাহারা তুলিয়াছে অর্থনৈতিক সুবিচারের নিশ্চয়তা বিধানেরই মানসে।"[২১৭]

গোল টেবিল বৈঠক শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের কিছু সংখ্যক নেতার ছয় দফা ও এগার দফা বিরোধিতার কারণেই এটা হয়।

---

২১৭. গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ (১০ মার্চ-১৩ মার্চ, ১৯৬৯, রাওয়ালপিণ্ডি), প্রকাশক, আবদুল মমিন, প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা, ২৫ জুন, ১৯৬৯, মূল্য, ১০ পয়সা

১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানী নেতা হামিদুল হক চৌধুরী, আবদুল সালাম খান, মাহমুদ আলী ও ফরিদ আহমদ প্রমুখকে কুচক্রী বলে ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'যদি পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দাওয়ার প্রশ্নে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন পাওয়া যেত তা'হলে প্রেসিডেণ্টের পক্ষে সেসব মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না'।[২১৮] বঙ্গবন্ধু অবশ্য শীর্ষ বৈঠকে ছয়দফা-এগার দফা প্রশ্নে নূরুল আমীন, বিচারপতি মুর্শেদ এবং অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

১৯ মার্চ এক বিবৃতিতে পাকিস্তান ছাত্র শক্তি আগামী ২৫ মার্চ এগার দফা বাস্তবায়নের ও গভর্ণর মোনায়েম খানের অপসারণের দাবীতে সারাদেশে হরতাল আহবান করে। এজন্য তারা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সহযোগিতা ও সমর্থন কামনা করে।

কিন্তু রাতের অন্ধকারে কাউকে না জানিয়ে সপরিবারে গভর্ণর মোনায়েম খান হরতালের পূর্বেই ঢাকা থেকে পলায়ন করেন।

পুনরায় সামরিক শাসন

২১ মার্চ নূতন গভর্ণর হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন মোনায়েমেরই অর্থমন্ত্রী ডঃ এম. এন. হুদা। কিন্তু মাত্র ৩ দিনের জন্য।

২৪ মার্চই শহরময় এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল যে, নূতন করে সামরিক আইন জারী হচ্ছে সারাদেশে। এ সংবাদ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ২৪ তারিখে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন মাওলানা ভাসানী এবং এদিনই তিনি ঢাকা ছেড়ে তার সন্তোষস্থ বাসভবনে চলে যান।

২৫ মার্চ (১৯৬৯) ইকবাল হলের প্রাধ্যক্ষের বাসায় ছাত্র নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন পুলিশের নূতন ইনসপেকটর-জেনরেল কে. জি. মহিউদ্দিন। উনসত্তরের আন্দোলনের চূড়ান্ত অবস্থা থেকে প্রশাসনের উর্দ্ধতন অফিসাররা এমন করে নিয়মিতই আসতেন ছাত্র নেতাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে। আর কি কি পদক্ষেপ প্রশাসনে নেওয়া যায়, দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালেচনা ইত্যাদির উদ্দেশ্যেই নতুন আই. জি. এসেছিলেন।

---

২১৮. ইত্তেফাক, ১৫ মার্চ, ১৯৬৯

ঠিক এমন সময়ই সাধারণ ছাত্ররা হল থেকে প্রাধ্যক্ষের বাসায় দৌড়ে আসে এবং উত্তেজনাকরভাবে বেতারে একটি ঘোষণা প্রচারের কথা জানায়। বেতারে তখন নূতন করে সারাদেশে সামরিক আইন জারীর কথা প্রচারিত হচ্ছিল। ছাত্ররা অস্থির হয়ে পড়েছিল, মিছিল বের করার জন্য। ছাত্রনেতারা করণীয় কি জানার জন্য সেখান থেকেই বঙ্গবন্ধুকে ফোন করলেন। বঙ্গবন্ধু খুব ধীরে এবং স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, "Wait and See"।[২১৯]

২১৯. সাক্ষাৎকার, নূরুল ইসলাম

পরিশিষ্ট

(যুক্তফ্রন্টের একটি পরিপত্র)

যুক্তফ্রন্ট পার্টির দপ্তর

৫৬, সিম্পসন রোড, ঢাকা

তারিখ : ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪

প্রিয় মহোদয়,

আপনি কি অনুগ্রহ করে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াদি সম্পর্কে তথ্যাবলী এবং বিবরণ পেশ করবেন :

১. আপনার নির্বাচনী এলাকার অপরাপর প্রার্থীদের নাম এবং সেই সাথে তাঁদের প্রভাব, প্রধান---প্রধান সমর্থক ও সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য ;

২. আপনার নিজের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে মন্তব্য ;

উদাহরণ স্বরূপ, আপনার নির্বাচনী এলাকায় কয়টি ইউনিয়ন আছে, আপনি নিজে কয়টি ভ্রমণ করেছেন, কয়টিতে আপনার কর্মীরা নিয়োজিত আছে, আপনি কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, আপনার জন্য সাহায্য চেয়ে কারো কাছে লিখবার প্রয়োজন আছে কিনা, আপনার ব্যক্তিগত সাফল্যের সম্ভাবনা, ইত্যাদি ;

৩. আপনার বিরুদ্ধে যে প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে তার ধরণ, উদাহরণ স্বরূপ ; এমন কোন প্রার্থী আছে কি, যিনি যুক্তফ্রন্ট পার্টি নামের অপব্যবহার করছেন, অথবা বলেছেন তাঁরা হক সাহেবের দলে যোগদান করবেন। যদি এমন হয়, তাঁরা আপনার দুর্ণাম রটনা করছেন, অথবা ভোটারদের নরকের ভয় দেখাচ্ছেন অথবা এমন কোন মৌলভী অথবা পীর আছে যাঁরা আপনার বিরুদ্ধে অথচ মুসলিম লীগের পক্ষে কাজ করছেন।

৪. অন্যান্য প্রার্থীদের পক্ষে এমন কোন প্রচারপত্র বিলি হয়েছে কিনা যাতে কোন নেতার স্বাক্ষর রয়েছে ;

৫. আপনার প্রতীক কি ? প্রতীক হিসাবে আপনার যদি 'নৌকা' না থাকে, তাহলে নির্বাচন কমিশনে প্রতীকের জন্য আবেদন করার জন্য আপনার ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময় আছে। যদি অন্য কোন প্রার্থীর প্রতীক নৌকা হয়ে থাকে তাহলে প্রতীক বদলের স্বপক্ষে তার সম্মতি অবশ্যই নিতে হবে, সুতরাং আপনি সেই সম্মতি নেওয়ার চেষ্টা করবেন।

৬. অদ্যাবধি আপনার অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ---আপনাকে কি কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যদি তাই হয় তাহলে উল্লেখ করুন কিভাবে তা অতিক্রম করা সম্ভব যদি না ইতিমধ্যেই আপনি তা অতিক্রম করে থাকেন।

একান্তই আপনার

(এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী)

জালেম-শাহীর ছয় বৎসর

প্রচার বিভাগ
যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রীয় দফতর

মুসলিম লীগের জাঁদরেল নেতা সরদার আবদুল রব নিশতার বলিয়াছেন :
"মুসলিম লীগ এখন সরকারের আজ্ঞাবহ"
কায়েদে আজম চাহিয়াছিলেন সরকারকে মুসলিমলীগেরা আজ্ঞাবহ করিতে। সর্বময় কর্তৃত্ব সম্পন্ন সে মুসলিম লীগ মরিয়া গিয়াছে। এখন গোলাম লীগের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই গোলাম এখন জালেমের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া জনগণকে কিভাবে শাসনের নামে শোষণ ও দমন করিতেছে তাহা জানা প্রয়োজন, তাই আমরা মজলুম জনগণের হাতে মুসলিম লীগের জালিম শাহীর ছয় বৎসর তুলিয়া দিলাম।

—যুক্তফ্রণ্ট প্রচার দফতর

কায়েদে আজমের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সংগ্রাম করিয়া ভারতের দশ কোটি মুসলমান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিরাট ঐতিহ্যসম্পন্ন একটি মহান জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির হেফাজতের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য ছিল। কাজেই অতি স্বাভাবিকভাবেই নূতন রাষ্ট্রের মাধ্যমে সেই মহান জাতি পূর্ণ আজাদী লাভ করিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু আফসোসের বিষয়, জাতির পিতা কায়েদে আজমের এন্তেকালের পর দেশের নেতৃত্বভার এমন ব্যক্তিদের হাতে চলিয়া গেল, যাহারা নেতা হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য।...

লীগ নেতৃত্বের স্বরূপ

পাকিস্তানের বর্তমান নেতাগণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহাদের পশ্চাতে কোন ত্যাগ নাই। জনগণের জন্য দরদ নাই এবং ইহাদের ধর্ম ও ঈমানের সঙ্গে তাহাদের অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলীর কোন সম্পর্ক নাই। অথচ ইহারা দরিদ্র ও অশিক্ষিত দেশবাসীগণকে প্রতারিত করিবার জন্য মুখে ঘন ঘন ইসলামের নাম উচ্চারণ করিতেছেন, খলিফাদের সহিত নিজেদের তুলনার স্পর্দ্ধা দেখাইতেছেন এবং ইহাদের কুকীর্ত্তির সমালোচনা করিলে সমালোচকদের ইহারা রাষ্ট্রদ্রোহী, কমুনিষ্ট এবং শৃঙখলা ভঙ্গকারী বলিয়া অভিহিত করিয়া নানা রকম বেআইনী আইনের কবলে ফেলিয়া তাহাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করিয়া দিতেছেন। ...

জাল মুসলীম লীগ

মুসলিম লীগ পাকিস্তান আনয়ন করিয়াছে কিন্তু সেই মুসলিমলীগ আর বর্ত্তমান মুসলিম লীগ সম্পূর্ণ পৃথক দুইটি প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান অর্জন করিয়াছিল নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কিন্তু পাকিস্তান অর্জনের পর সে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু লীগের নাম ভাঙ্গাইয়া যাহাতে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা চলে এবং পাকিস্তানকে শাসন ও শোষণ করিবার কায়েমী স্বার্থ বজায় থাকে তজ্জন্য একদল স্বার্থপর, ক্ষমতালিপ্সু ও দুর্নীতিবাজ লোকের চেষ্টায় পাকিস্তান মুসলিম লীগের গোড়া পত্তন হয়। ...

...আমরা প্রথমেই বর্ত্তমান লীগ শাহীর ধর্ম-বিরোধী কার্যকলাপের যে পরিচয় দান করিব, তাহাতে দেখা যাইবে যে ইহাদের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকিলে পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমৎ কোন কালে কায়েম হইবে না, এমনকি মুসলমান ধর্মের অস্তিত্ব ইহাদের দ্বারা বিপন্ন হইবে। ইহা বুঝিতে পারিয়াই মৌলনা আতাহার আলীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামেয়ে ইসলাম মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামিয়াছেন। জনদরদী শেরেবাংলা ও দেশপ্রেমিক ভাষানী মওলানা হতে হাত ও কাঁধে কাঁধ মিলাইয়াছেন। মুসলিম লীগ নেতাদের ইসলাম প্রীতির বিষয় লইয়া আলাপে আসিবার পূর্বে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে খলিফাদের সঙ্গে বর্ত্তমান মুসলিম লীগ খলিফাদের জীবন যাত্রা প্রণালীর একটু তুলনামূলক আলোচনা করা যাক।

খলিফাদের ত্যাগ ও লীগের নেতাদের অর্থলোভ

ইসলামী রাষ্ট্র অথবা খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় যে বেতন রাষ্ট্র নায়কেরা লইতেন, তাহার সহিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়কের বেতনের এক তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেখানো হইল:

প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর (রাঃ) মাসিক ২২৫ দেরহাম বেতন লইতেন। তাঁহারা খলিফার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে ব্যক্তিগত সম্পত্তির এক পূর্ণ তালিকা সরকারে পেশ করিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে, খলিফার কার্যভার ত্যাগের পর তাঁহাদের সম্পত্তি নিজেদের পদাধিকারের সুযোগে বৃদ্ধি করিয়াছেন কিনা, তাহা দেখাইবার সুযোগ জনসাধারণকে দান করা। তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান (রাঃ) সরকারী কোষাগার হইতে আদৌ কোন বেতন গ্রহণ করেন নাই। চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রাঃ) বৎসরে ৫ শত দেরহাম বেতন গ্রহণ করিতেন।

কায়েদে আজমের পর

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রপতি হিসাবে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সরকারী তহবিল হইতে কোন বেতন গ্রহণ করেন নাই।

কায়েদে আজমের এন্তেকালের পর বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট স্যার নাজিমুদ্দীন যখন পাকিস্তানের বড়লাট নিযুক্ত হন, তখন হইতেই পাকিস্তানের হৃদয়মূলে প্রথম আঘাত হানা শুরু হয়। তিনি আজাদীর জন্য কোন ত্যাগ স্বীকার করেন নাই, অথচ আজাদীর পর তিনি কায়েদে আজমের শূণ্য আসন দখল করিলেন। পাকিস্তানের এই নয়া খলিফার মাসিক বেতন ১২,৫০০ টাকা নির্দ্ধারিত হইল। বার্ষিক ভাতা হিসাবে তিনি ৫০,০০০ টাকা এবং সরকারী ব্যয়ে সজ্জিত ২,০০০ টাকা মাসিক ভাড়ার বিরাট প্রাসাদ বিনা খরচে ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সফরে ব্যয় রাষ্ট্রকে বহন করিতে হইত এবং তাঁহার নিজস্ব বিমান চালনার ব্যয় প্রতি মাইল ১০০ টাকা। তাঁহার পোষাকের ব্যয় হিসাবে বার্ষিক ৩,০০০ টাকা সরকার হইতে দেওয়া হইত। অর্থাৎ তাঁহার সকল ব্যয় রাষ্ট্র বহন করিয়াছিল এবং বৎসরে তাঁহার আড়াই লক্ষ টাকা সঞ্চিত হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী মাসিক ৪ হাজার টাকা বেতন এবং বার্ষিক ৩ হাজার টাকা পোষাকের খরচ হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁহার বাড়ী গাড়ী, বিমান, ট্রেন ও তৈজসপত্র, ভৃত্য, সব খরচই সরকার হইতে বহন করা হয়। কেন্দ্রের অন্যান্য মন্ত্রীগণও সকলে এই সুযোগ পাইয়া থাকেন।

প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীগণ---পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর বেতন—১,৮০০ টাকা
ভাতা---১,২০০ টাকা

বাড়ী, গাড়ী এবং চাকর বাকরের ব্যয় সরকারী কোষাগার হইতে বহন করা হয়। তিনি ৬ বৎসর ওজারতী করিয়া ঢাকা ও ময়মনসিংহে কয়েকখানা প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছেন। এক এক খানি প্রাসাদের নির্মাণ ব্যয় ৩ লক্ষ টাকা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে লীগশাহীর পূর্বে তিনি ময়মনসিংহর একজন সামান্য উকিল ছিলেন।...

বিদেশের দূতাবাসে মদের প্লাবন

বিদেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে এক শ্রেণীর লোকদিগকে পাঠানো হইয়া থাকে, ইহাদের অনেকে বিদেশে পাকিস্তানের ইজ্জতের এবং ইসলামের সুনামে কলঙ্ক লেপন করিতেছেন। দূতাবাস সমূহে মদ্যের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাহাতে একটি প্রদেশের কোন এক বিভাগীয় ব্যয় সম্পন্ন হইতে পারে।

খেলাফত যুগের রাষ্ট্রনায়কদের বেতন এবং অন্যান্য ব্যয়ের সহিত নয়া ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নায়কদের ব্যয় ও বেতনের এই তুলনামূলক হিসাব দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে ইহারা ইসলামকে বরবাদ করার জন্যই যেন ঘন ঘন ইসলামী জিগির তুলিতেছে।...

ইসলামী রাষ্ট্রে মদ ও জুয়া

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে বঙ্গে যে পরিমাণ মদ বিক্রয় হইত, পাকিস্তান হওয়ার পর তাহা যে কতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব করা যায় না। পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে কেবলমাত্র ঢাকা ক্লাবে মাসে ৭০ হইতে ৮০ গ্যালন মদ বিক্রয় হইত। পাকিস্তান হওয়ার পর আইন করিয়া মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। অথচ এক ঢাকা ক্লাবেই মাসে ৭০০ গ্যালন মদ বিক্রয় হয়। ইহা ছাড়াও জনাব নূরুল আমীন সাহেবের মেহেরবানীতে ঢাকা শহরের বুকে আরও ৬টি মদের দোকান খোলা হইয়াছে এবং তাহাতেও বিপুল পরিমাণে মদ বিক্রয় হয়।...

শাসনতন্ত্র কোথায়।

পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে প্রায় সাত বৎসর পূর্বে, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই রাষ্ট্রের কোন শাসনতন্ত্র রচিত হয় নাই। ইংরেজের গড়া শাসনতন্ত্র লইয়া এই রাষ্ট্র পরিচালিত হইতেছে, অথচ ভারত, স্বাধীনতা পাওয়ার মাত্র এক বৎসর পরেই তাহার নূতন শাসনতন্ত্র রচনা শেষ করিয়াছে।...

ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন

পাকিস্তানের নিজস্ব শাসনতন্ত্র না থাকায় এই রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়াছে। সারা পাকিস্তানে দেড় হাজারের অধিক অধ্যাপক, উকিল, ছাত্র-ছাত্রী ও দেশ-প্রেমিক যুবকগণ জেলের মধ্যে বিনা বিচারে আটক ছিল, অথচ ইসলামের বিধান অনুসারে বিনা বিচারে কাহাকেও আটক রাখা যায় না।...

খুনীর ভূমিকায় মুসলিমলীগ

জার্মানীতে হিটলারের আমলে সামান্য কারণে বন্দীদিগকে যেভাবে হত্যা করা হইত, মুসলিম লীগ শাসনে পাকিস্তানে তাহা হুবহু অনুসৃত হইতেছে। ইহার ফলে বহু মেধাবী ছাত্র লীগ-শাহীর অত্যাচারে জান দিয়াছে। রাজশাহী জেলে যে গুলীবর্ষণ করা হইয়াছিল, তাহাতে কয়েক জন হতাহত হয়। নিহতদের মধ্যে ছিল খুলনা জেলার এক দরিদ্র বিধবার একমাত্র পুত্র আনোয়ার সে দ্বিতীয় বার্ষিক বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিল।

ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের সময় নুরুল আমীন সরকার গুলী করিয়া কয়েক জন নওজোয়ানের জীবনলীলার অবসান করে। নিহত ব্যক্তিদের দাফন পর্যন্ত ইসলামী কানুন মত করা হয় নাই। তদানীন্তন মুসলিম লীগের মুখপত্র দৈনিক মিল্লাত (২৩শে ফেব্রুয়ারী) ১৯৫২ সন এ সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঢাকার লালবাগের পুলিশ ব্যারাকে নুরুল আমীন সরকার গুলী চালাইয়া প্রায় তিনশত পুলিশকে হতাহত করেন বলিয়া প্রকাশ। ইহাদের কি দোষ ছিল, তাহা সরকার বলেন নাই। এবং গুলী চালনার ব্যাপারও বহুদিন গোপন রাখা হইয়াছিল। মুসলিম লীগের অন্যতম অপকীর্ত্তি করাচীতে ছাত্রদের উপর গুলী চালানো। ছাত্রদের অপরাধ ছিল যে তাহারা বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। এই সামান্য কারণে ১২ জন ছাত্রকে যে মুসলিম লীগ সরকার গুলী করিয়া মারিতে পারে, দেশ শাসনের কোন অধিকার তাহাদের থাকা উচিত নয়।
চট্টগ্রামে বাঁধ কাটা লইয়া গুলীবর্ষণ ও নবীনগরে মস্‌জিদের মধ্যে গুলীবর্ষণ লীগ-শাহীর অন্যতম অপকীর্ত্তি হইয়া রহিল। সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলনের সময় সামরিক আইন জারী করিয়াও বহু সংখ্য ক লোককে লীগ সরকার খুন করিয়াছে। বহু সংখ্যক সম্মানিত উলামায়ে-কেরামকে উলঙ্গ করিয়া বীভৎসভাবে প্রহার করিবার ইতিহাস লোকের মুখে মুখে প্রচারিত।...

খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধ হইতে জনগণ বঞ্চিত

ছয় বৎসরের মুসলিম-লীগ শাসন পাকিস্তানকে খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, পূর্ব পাকিস্তানকে ভিখারীর দেশে পরিণত করা হইয়াছে, লীগ সরকারের বন্ধ্যা নীতির ফলে ১৯৫১ সাল হইতে ৫৩ সাল পর্যন্ত খুলনা ও বরিশালে দুর্ভিক্ষ বর্ত্তমান ছিল। এক খুলনা জেলায়ই প্রায় ২০ হাজার লোক দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করে। সারা জেলা যখন কবরস্থানে পরিণত হইয়াছিল, তখনও মুসলিম লীগের নির্লজ্জ মন্ত্রীরা বলিয়া বেড়াইতেছিল যে দুর্ভিক্ষ আদতেই হয় নাই। মুসলিম লীগের অন্যতম চাঁই ও খুলনার এম,এল,এ এম,এ, সবুর তখন সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়া বলিয়াছিলেন যে, দুর্ভিক্ষে ২০ হাজার লোক মরিয়াছে এবং বহু লোক পাকিস্তান হইতে হিন্দুস্তানে হিজরত করিয়াছে। অবশ্য সেই সবুর সাহেবই এখন মুসলিম লীগের দালাল হইয়া নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন।

লবণ সঙ্কট

১৯৫১ সালের লবণ সঙ্কট মুসলিম লীগের অন্যতম অপকীর্ত্তি। পূর্ব-পাকিস্তানে লবণ তৈয়ারী হইয়া থাকে, কিন্তু মুসলিম লীগের মন্ত্রীদের কেহ কেহ নিজেদের আত্মীয় পোষণের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের লবণ তৈয়ারীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করান এবং আত্মীয়-স্বজনকে লবণ ব্যবসায়ের একচ্ছত্র সুযোগ দেন।

তাহাদেরই চক্রান্তের ফলে দুই আনা মূল্যের লবণ ১৬'০০ টাকা সের দরে পূর্ব পাকিস্তানীরা ক্রয় করিয়াছে। লীগ সরকারের দমননীতির ভয়ে জনগণ প্রতিবাদ করারও তেমন সাহস পায় নাই।...

বস্ত্রের দিক দিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে প্রায় উলঙ্গ করিয়া রাখা হইয়াছে। মুসলিম লীগ সরকার এদেশে নূতন বস্ত্রমিল প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা করে নাই। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে গত কয়েক বৎসরে ৭।৮টি নূতন মিল স্থাপন করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের শোষণের ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করা হইতেছে।...

রোগীর পথ্য ওষুধের অব্যবস্থা

ঔষধের ব্যাপারেও পূর্ব পাকিস্তানে অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। দুইজন মন্ত্রী বেনামে ঔষধের আমদানী-রপ্তানীর লাইসেন্সের সিংহ ভাগ পাইতেছেন এবং তাঁহাদের কল্যাণই পূর্ব পাকিস্তানে ঔষধ পাওয়া যায় না, অথচ পাকিস্তান হইতে ভারতে ঔষধ চালান যায়। দরিদ্র দেশবাসী যখন ঔষধ ও পথ্যাভাবে মৃত্যুবরণ করিতেছে, তখন সামান্য অসুখের অজুহাতে লীগের মন্ত্রীরা এবং নেতারা চিকিৎসা করাইবার জন্য লণ্ডন, আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড, ভিয়েনা প্রভৃতি ইউরোপীয় মুলুকে পাড়ি দিতেছেন। জনগণের প্রতি বেঈমানির ইহা অপেক্ষা চূড়ান্ত পরিচয় আর কি থাকিতে পারে?...

শিক্ষার বিরুদ্ধে জেহাদ

শিক্ষার বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ যেন জিহাদ ঘোষণা করিয়াছে। মুসলিম লীগ ক্ষমতা দখলের পর পূর্ব পাকিস্তানকে সুপরিকল্পিত উপায়ে অশিক্ষিত রাখার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তাহার ফলে লীগ হুকুমতের প্রথম বৎসরেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৩০ হাজার প্রাইমারী স্কুল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যে স্কুলগুলি চলিতেছে, তাহা বন্ধ করার অভিপ্রায় শিক্ষকগণকে অপর্যাপ্ত বেতন অত্যন্ত অনিয়মিত-ভাবে দেওয়া হয়। স্কুলে আসবাব পত্রাদির নাম-গন্ধ নাই। উচ্চ শিক্ষার জন্য লীগ সরকার মাঝে মাঝে মোটা বরাদ্দ করিয়া থাকেন, অথচ প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাঁহারা অত্যন্ত চতুরতার সহিত পঙ্গু করিয়া দিতেছেন। ইহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষার জন্য আর অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হইবে না।
নাজিমুদ্দিন-নুরুল আমীন চক্র প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীর মসনদে এমন এক অযোগ্য ব্যক্তিকে বসাইয়া রাখিয়াছেন যাহার পেটে বোমা মারিলেও শিক্ষার ব্যাপারে কোন বিজ্ঞতামূলক কথা বাহির হইবে না। ইহার উপর মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নামক

এমন এক অপূর্ব চীজ সৃষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহার কোন ক্ষমতা নাই, অথচ শিক্ষা-ব্যবস্থা পণ্ড করার যোগ্যতা যথেষ্ট আছে, এবং এই বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট রূপে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইয়াছে, যিনি কয় বৎসরে কেবলমাত্র নিজের ব্যবসায় বেনামে চালাইয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ঢোল হইয়াছেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের অযোগ্য মন্ত্রিসভা গত ছয় বৎসরে শিক্ষা ব্যাপারে কতটা অযোগ্যতার পরিচয়, দিয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল :

পশ্চিম পাকিস্তানে আছে

বিশ্ববিদ্যালয়	৪টি
মেডিক্যাল কলেজ	৫টি
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৩টি
টেক্সটাইল কলেজ	৮টি
ফরেস্টারী কলেজ	২টি
হাসপাতাল	৯টি

পূর্ব পাকিস্তানে আছে

বিশ্ববিদ্যালয়	২টি
মেডিকেল কলেজ	১টি
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১টি

অদ্যাবধি পূর্ব পাকিস্তানে একটিও সরকারী পাঠাগার বা ষ্টেট লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

স্ত্রী শিক্ষার জন্য একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ কলেজ ও আধুনিক ছাত্রী নিবাস পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে নাই। মহিলাদের কলেজ ও ছাত্রী নিবাসের জন্য যে বিরাট ইমারত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা লীগ মন্ত্রিসভা নির্লজ্জের মত সেক্রেটারিয়েট ভবন হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন।

সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গুলিতেও আত্মীয় পোষণ নীতি অনুসারে উজিরদের আত্মীয়-স্বজনকে রাখা হইয়াছে। তাহার ফলে শিক্ষার মান যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। ইহার উপর ছাত্রীদের বাসের ভাড়া ও বেতন বৃদ্ধি করিয়া বহু ছাত্রীকে পড়া ত্যাগে বাধ্য করা হইয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি এত ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে যে পুস্তক নির্বাচন কমিটি ঘুষ ছাড়া কথা বলে না। অর্থ ব্যয় করিয়া অনেক অপাঠ্য পুস্তক পাঠ্য করা যায়। এ কথা পূর্ব পাকিস্তানের লীগ ওজারতের আমলেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ১৯৪৭ সালে শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন যে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে না। কিন্তু বিদ্যাদিগগজ মন্ত্রীরা প্রাথমিক স্তরেই উর্দ্দু ভাষাকে এদেশে বাধ্যতামূলক করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার চরম সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন। পূর্ব বঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্র হইতে বৎসরে ৫২ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সে কথা রক্ষিত হয় নাই এবং পূর্ব বঙ্গের অযোগ্য মন্ত্রীরা উহা আদায় করিতে পারেন নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঋণগ্রস্ত থাকা সত্ত্বেও প্রথম কয়েক বৎসর কেন্দ্রের নিকট সাহায্য চাহিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে, অথচ সিন্ধুতে বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও করাচীর জন্য আবার একটি ফেডারেল ইউনিভারসিটি করা হইয়াছে।

এদেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানরা যখন অর্থাভাবে এবং সরকারী অব্যবস্থায় শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে, তখন ধনী এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের সন্তানগণের ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এক ভিকারুন্নিছা স্কুলের জন্যই সরকার এপর্যন্ত ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর একটি ছাত্রীর বেতন ১৫।০ আনা। এই ব্যয়বহুল শিক্ষার কারণ সম্পর্কে মন্ত্রীরা বলেন যে এদেশের শাসক তৈয়ারীর জন্য এই ধরণের স্কুলের প্রয়োজন আছে। ইসলামী হুকুমতে শাসক ও শাসিত সম্প্রদায় সৃষ্টির বাসনা অত্যন্ত মারাত্মক। ইহাকে গায়েব ইসলামী কাণ্ড-কারখানা বলা যাইতে পারে।

পূর্ব বাংলায় সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের পার্থক্য বজায় রাখিয়া শিক্ষার প্রসারের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। পূর্ব বাংলার মোট আদায়ী রাজস্ব ২৭ কোটি টাকার মধ্যে সাড়ে ১৩ কোটি টাকা সিভিল ও পুলিশ খাতে ব্যয় হয়। আর সরকারী স্কুল ও কলেজ যে খরচ করা হয়, তাহার অর্দ্ধেকও বেসরকারী স্কুল ও কলেজের জন্য খরচ করা হয় না।

জমিদারী প্রথা বিলোপের ভাঁওতা

মুসলিম লীগ যখন পাকিস্তান আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল, তখন জনগণের নিকট ইহার অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল এই যে বিনাখেসারতে জমিদারী দখল করিয়া ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে উহা বিতরণ করা হইবে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কায়েমী স্বার্থের দালালরূপে মুসলিম লীগ ৬০ কোটি টাকা খেসারত দিয়া জমিদারী খরিদ করিল।...

পাট কেলেঙ্কারী

দুনিয়ায় যত পাট উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ পূর্ব বাংলায় জন্মে। কিন্তু চাষীরা যেমন পাট উৎপাদন করিয়া তাহাদের ক্ষুধার অন্ন পায় না, তেমনি পাট ব্যবসায়ী যদি পূর্ব পাকিস্তানী হয়, তাহারও অন্ন জোটা দায়। সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী ফজলুর রহমানের ষড়যন্ত্রে মাত্র ১৪টি কোম্পানী বিদেশে পাট চালান দেওয়ার অধিকার লাভ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে মাত্র ১টি পূর্ব পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠান। চাষীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে লীগ সরকারের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ফলে। যখন পাট বাজারে উঠে, তখন সুকৌশলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা পাট ক্রয় বন্ধ রাখে। ফলে যে এক মণ পাট উৎপাদন করিতে চাষীর ১৯.০০ টাকা খরচ লাগে, সেই পাট তাহাকে ৩.০০ টাকা মণ দরেও বিক্রয় করিতে হয়। অথচ যখনই সেই পাট চাষীর হাত ছাড়া হইয়া ইস্পাহানী, আদমজী, রালী ব্রাদার্স প্রমুখ বড় বড় পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়া পড়ে তখনই পাটের দাম কমপক্ষে ৪০/৪৫ টাকা উঠে। চাষীর এই অবস্থার সঙ্গে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের নীল চাষিদের দুর্ভাগ্যের তুলনা করা যায়।...

মুখের ভাষা কাড়িয়া লওয়ার ষড়যন্ত্র

সারা পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন অধিবাসীর মুখের ভাষা বাংলা। মুসলিম লীগের জালেমরা এই ভাষাটুকুও কাড়িয়া লওয়ার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। গোপনে গোপনে তারা আরবী ও উর্দ্দু ভাষা চালাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। আরবী ও উর্দ্দু ভাষার প্রতি পূর্ব পাকিস্তানীদের কোন বিদ্বেষ নাই এবং ছিল না। তথাপি কেন এই গোপন ষড়যন্ত্র? ইহার উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতারা এই ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত ছিল। তাই যখন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে পাওয়ার দাবী জোরদার করিল, তখনই জালিম মুসলিম লীগের টনক নড়িল। লীগ-শাহীর পুলিশের গুলিতে ছাত্রদের বুকের রক্তে রাজপথ লালে লাল হইয়া গেল। শহীদ ছাত্র ও যুবকদের রক্তপান করিয়াও জালেমদের তৃপ্তি লাভ হইল না, তাহারা দেশভক্ত তরুণদের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রদ্রোহী প্রভৃতি আখ্যা দিয়া নিজেদের কলঙ্ক ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করিল।

বর্ত্তমানে নির্বাচনের সময় এই মুসলিম লীগ মন্ত্রীরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা হইবে বলিয়া মিথ্যা স্তোক দিতেছে এবং জাগ্রত জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু জনগণ জানে যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ইচ্ছা যদি নূরুল আমীন সরকারের থাকিত তাহা হইলে অনর্থক এতগুলি ছাত্র ও তরুণের রক্তপান করিয়া নূরুল আমীন তাহার রক্ত পিপাসা মিটাইত না। আর তাছাড়া সদিচ্ছা তাহাদের থাকিলে তাহারা এতদিনে জাতির ইচ্ছা কার্য্যকরী করিতে পারিত, যেহেতু এতদিন তাহারাই পরিষদসমূহে নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যের সুবিধা ভোগ করিয়াছে।*

* মুসলীম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের প্রচার পুস্তিকা থেকে সংক্ষেপিত, ৪ মার্চ, ১৯৫৪। —লেখক

(যুক্তফ্রণ্টের নির্বাচন পরবর্তী সাংগঠনিক সার্কুলার)

যুক্তফ্রণ্ট পার্টি অফিস

৫৬, সিমসন রোড, ঢাকা

তারিখ : ১৫ই মার্চ, ১৯৫৪

প্রিয় মহোদয়,

এখন যেহেতু নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে এবং এসব বিষয়াদি এখনো আপনাদের মনে ভালোভাবে ছাপ মারা আছে। সেহেতু ভবিষ্যৎ রেফারেন্সের জন্য কিছু তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। আমরা আপনাদের কিছু সময় ও শ্রম দিতে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব উত্তর দিতে অনুরোধ করবো। জওয়াব দুই পর্যায়ে পাঠানো যাবে, একভাগে যেসব প্রশ্নের উত্তর দ্রুত দেওয়া যাবে এবং অপর ভাগে যে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে কিছু সময় লাগবে।

আমরা নিম্নোক্ত বিষয়দি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহে আগ্রহী :

১. প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম নিম্নে উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী,

(ক) তারা মুসলিমলীগে আবেদন করেছিল কিনা

(খ) তারা যুক্তফ্রণ্ট-এ আবেদন করেছিল কিনা

(গ) তারা কোন বিশেষ ব্যক্তির মনোনীত ছিল কি না

(ঘ) তারা কোনো প্রচার-পত্র বিলি করেছিল কি না যেটি যুক্তফ্রণ্ট অথবা অন্য কোন দলের নেতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ছিল

(ঙ) অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ, ইত্যাদি।

২. আপনি কি অন্যান্য দলের প্রচারপত্র পাঠাতে পারেন, বিশেষত:

(ক) ফুরফুরা পীর সাহেবের ফতোয়া অথবা সুপারিশ সম্বলিত প্রচারপত্র যা ১৯৪৬ সালে পীরসাহেব প্রচার করেছিলেন এবং এবারও জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য মুসলিম লীগ এটার পুন:মুদ্রণ করে

(খ) মাওলানা শামসুল হক এবং শর্শিনার পীর সাহেবের ফতোয়া যাতে উল্লেখ আছে যে মুসলিমলীগের বিরুদ্ধে ভোট দেয়া মানে কোরান ও সুন্নাহকে অবমাননা করা

(গ) মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিলিকৃত অন্য যে কোন প্রচার-পত্র।

৩। ঐ সব ব্যক্তিদের নাম, যারা আপনার পক্ষে, অথবা মুসলিম লীগের পক্ষে, এবং অন্যান্য প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করেছে (ইউনিয়ন এবং গ্রাম ভিত্তিতে)।

৪. এমন সব বিশিষ্ট কর্মী যারা ইউনিয়ন ও গ্রামে জড়িত নয় অথচ কেন্দ্রে কাজ করছে তাদের নামও দেয়া যাবে।

৫. যে সব ব্যক্তি নির্বাচনের পূর্বে গ্রেফতার হয়েছিলেন জন নিরাপত্তা আইন অথবা কোনও বিশেষ মামলায়, তাদের বিবরণ।

৬. এমন সব ব্যক্তিদের নাম যারা আমাদের সমর্থন করার কথা ছিল অথচ করেনি।

৭. মুসলিম লীগের কর্মীদের মধ্যে দাঙ্গাবাজ ও গুণ্ডা প্রকৃতির লোকও ছিল, তাদের ঠিকানাসহ নাম পাঠানো যায়।

৮. নির্বাচন সম্বন্ধে কিছু তথ্য, যে যে অসুবিধার সমুখীন হতে হয়েছিলো।

৯. মহিলাদের ভোট দেওয়ার ব্যাপারে মন্তব্য।

১০. নির্বাচন কেন্দ্র যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছিল কি না, নাকি স্থান সংক্রান্ত কোন গরমিল ছিল।

১১. আপনার নির্বাচনী এলাকা সঠিকভাবে নির্ধারণ হয়েছিল কি না, নাকি নির্বাচনের সুবিধার জন্য অন্যভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিৎ ছিল।

১২. মুসলিম লীগ প্রার্থী কি ধনী ছিল, তার বংশ পরিচয় কি ছিল এবং তিনি কি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন, তার কার্যের এবং এ সম্পর্কে অন্যান্য বিবরণ দিন। এছাড়া, আমি নিম্নোক্ত বিষয়ে মন্তব্য পেলে অত্যন্ত খুশী হবো :

(ক) আপনার নির্বাচনী এলাকার নিরপেক্ষ অথবা পক্ষপাতিত্ব কর্মকর্তা এবং তাঁর আচার ব্যবহারের বিবরণ

(খ) আপনার নির্বাচনী এলাকার সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে মন্তব্য এবং আপনার এলাকার উন্নতি এবং জনসাধারণের সন্তুষ্টির জন্য কি করা উচিৎ।

অনুগ্রহ করে এটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করবেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তর দেবেন।

আপনার একান্ত
শহীদ সোহরাওয়ার্দী

সরকার কর্তৃক ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা

করাচী, ৩০শে মে : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী আজ সন্ধ্যায় বেতারে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, প্রাদেশিক প্রশাসন আমাদের আওতাধীনে আনার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ববঙ্গকে রক্ষা করা এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা টিকিয়ে রাখা।

প্রধানমন্ত্রী পূর্ববঙ্গে ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের অব্যবহিত পরে উনত্রিশ মিনিটের এক ভাষণে সরকারের এই আকস্মিক পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, পূর্ববঙ্গের প্রশাসন বলতে গেলে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছিলো এবং ফজলুল হক মন্ত্রীসভা প্রদেশের জনগণের জানমাল রক্ষায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তিসমূহের কারণে উদ্ভূত দুঃখজনক ঘটনা সমূহের বর্ণনা দেন এবং যুক্তফ্রণ্ট পার্টির নির্বাচন বিজয়ের পর পর চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ এবং খুলনার শিল্প এলাকায় যে গোলমাল হয় তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি চন্দ্রঘোনা পেপার মিলের দাঙ্গার কথা উল্লেখ করেন যেখানে ১৩ ব্যক্তির প্রাণহানি হয়; ঢাকায় জেল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় লোকজনের সংঘর্ষ এবং শেষ পর্যায়ে আদমজী পাটকলের মারাত্মক দাঙ্গা যাতে মহিলা ও শিশুসহ চার শতাধিক লোকের মৃত্যু হয়।...

তিনি জনান যে ১৭ই মে তারিখে প্রাদেশিক সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো যাতে তারা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় কিছু পদক্ষেপ নেয়। একই সময়ে প্রাদেশিক সরকারকে এই আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিলো যে প্রদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় কেন্দ্র প্রদেশকে সব রকম সাহায্য সহযোগিতা করবে।

কেন্দ্রের নির্দেশ অবজ্ঞা

জনাব মোহাম্মাদ আলী উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্রের নির্দেশ পাওয়ার পরবর্তীতে জনাব ফজলুল হক সর্বসমক্ষে এই মর্মে সরকারী মত খণ্ডন করেন যে কমিউনিস্ট অথবা দেশদ্রোহীরা পূর্ববঙ্গে সক্রিয় নয়। তিনি আরো যোগ করেন যে, যুক্তফ্রণ্টের নেতারা বরং উল্টা দাবী করে যে, এসব দাঙ্গার পেছনে কেন্দ্র এবং মুসলিম লীগেরই হাত ছিল। তিনি বলেন এটা ছিল একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যাচার, জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার একটি ঘৃণ্য অপচেষ্টা এবং একটি বেদনাদায়ক ঘটনা থেকে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টা।

জনাব মোহাম্মদ আলী ঘোষণা করেন যে, জনাব হকের সাম্প্রতিক বিবৃতি সমূহ তাঁর কোলকাতা সফরকালীন বিবৃতির সাথে এক করার পরে তিনি ও তাঁর সহকর্মীদের এই বিশ্বাস জন্মেছে যে জনাব হক হচ্ছেন এমন এক রাজনীতিবিদ যিনি নীতিগতভাবেই পাকিস্তান বিরোধী। এটি অত্যন্ত পরিষ্কার যে তিনি ও তাঁর মন্ত্রীরা প্রদেশের প্রশাসন পরিচালনায় অক্ষম, শান্তি ও বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য এবং ৪২ মিলিয়ন মানুষের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করার ব্যাপারে পারঙ্গম। এসব বিবেচনা করেই হক মন্ত্রীসভা বাতিল করা ব্যতিত কেন্দ্রের আর কোন পথ ছিল না।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় কত দিন গভর্ণর শাসন কায়েম থাকবে সে ব্যাপারে কোন আভাষ দেন নি কিন্তু যোগ করেন যে ৯২-ক ধারা অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা ততদিন কায়েম থাকবে যতদিন প্রদেশে সুস্থ পরিবেশ ফিরে না আসে এবং এমন প্রতিনিধিত্বশীল মন্ত্রীসভা গঠন করা যায় যারা জনগণের আস্থার যোগ্য এবং সুষ্ঠুভাবে কার্যসম্পাদনে পারঙ্গম।

জনগণের প্রতি হুশিয়ারী

তিনি জনগণকে আভ্যন্তরীণ শত্রু এবং প্রাদেশিকতার বিপদ সম্পর্কে হুশিয়ার করে দেন এবং শত্রুর প্ররোচনায় পথভ্রষ্ট না হওয়ার জন্য যুবক শ্রেণীর প্রতি আবেদন জানান। তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি তাদের দায়িত্ব নির্ভয়ে পালন করার আহ্বান জানান এবং সামাজিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে বলেন। জনাব ফজলুল হকের সাথে তাঁর আলোচনা প্রসঙ্গে জনাব মোহাম্মদ আলী বলেন যে, তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা সম্পূর্ণভাবে হতাশ হয়েছেন এবং তাঁদের বদ্ধমূল ধারনা হয়েছে যে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে যুক্তফ্রন্ট পার্টির উপর আর নির্ভর করা যায় না, "এটা এখন পরিস্কার যে জনাব হকের সাম্প্রতিকতম করাচী সফরের পরে তাঁর মধ্যে এক অভূতপূর্ব মানসিক পরিবর্তন এসেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এখানে তাঁর পূর্ববর্তী সফরের সময় জনাব হক তাঁর প্রদেশে কমিউনিজম-এর তৎপরতা বৃদ্ধি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এমন কি একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে রায় দেন কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় সফরে তিনি এই মত দেন যে পূর্ববঙ্গে কম্যুনিজম অথবা কমিউনিস্টদের কোন অস্তিত্ব নাই।

পুনরায় নিউইয়র্ক টাইমস

জনাব মোহাম্মদ আলী রয়টার এবং নিউইয়র্ক টাইমসের সাথে জনাব ফজলুল হকের সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, তাঁর এক মাত্র লক্ষ্য

হচ্ছে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা আদায় করা, যা পরবর্তীতে তিনি অস্বীকার করেন। অথচ তিন দিন পরেই জনাব ফজলুল হক তাঁর মত পরিবর্তন করেন, এবং আমাদের সাথে আলোচনার ফাঁকে এক পর্যায়ে বলেন যে, তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে একটি স্বাধীন পূর্ববঙ্গ।

জনাব মোহাম্মদ আলী কোলকাতায় দেওয়া জনাব হকের বিবৃতি থেকে উদ্ধৃতি দেন। যার প্রেক্ষিতে জনাব হক পরবর্তীতে এর কপট ব্যাখ্যা দেন এবং বলেন "আমি জনাব ফজলুল হকের পূর্ববর্তী বিবৃতিসমূহ দেশবাসীর বিচার ও বিবেচনার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি। আমার কোন সন্দেহ নাই যে, তাঁদের রায় হবে জনাব ফজলুল হক পাকিস্তান রাষ্ট্রের একজন বিশ্বাসঘাতক"। তিনি জনাব ফজলুল হক সম্বন্ধে জনগণের দেওয়া কায়দে আজমের মতামতের উদ্ধৃতি দেন যাকে তিনি 'অভিশাপ' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

পাকিস্তান অবজারভার
৩১ মে ১৯৫৪

দেশের ডাক ! মুক্তির ডাক !

পূর্ববঙ্গ আওয়ামী লীগ কর্মীসম্মেলন

কৃষক-মজদুর, ছাত্র-যুবক, শিল্প ও ব্যবসায়ী দলে দলে যোগদান করিয়া সুষ্ঠু কর্মসূচী গ্রহণ করুন।

তাং:--২৬শে নভেম্বর, ১০ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, কর্মী সম্মেলন

২৭শে নভেম্বর, ১১ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, বিরাট জনসভা

স্থান: কাগমারী (টাঙ্গাইল)

আগামী ১ মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সভা আহ্বান করিতে হইবে। বর্তমান সরকার ২১ দফা পালন করিতে ধর্মত: ও আইনত: বাধ্য। বিশ্বাসঘাতকতা করিলে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান জুড়িয়া গণ আন্দোলনের ঝড় বহিয়া যাইবে।

১। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে শুধু সামরিক বিভাগ (নৌ বিভাগের সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে থাকিবে), মুদ্রা প্রস্তত, বৈদেশিক নীতি (বৈদেশিক বাণিজ্য পূর্ব পাকিস্তানে থাকিবে) এই ক্ষমতা তিনটি ছাড়া সমস্ত ক্ষমতা যুক্ত নির্বাচন আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সোপারেশ করিয়া প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ হইতে পূর্ব বঙ্গের আইন পরিষদের আসন্ন বৈঠকে প্রস্তাব পাশ করিতে হইবে।

২। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে।

৩। নূরুল আমিন সরকার ৬০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করিয়া জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের নামে যে প্রজা উচ্ছেদ আইন করিয়া রাখিয়াছে, সেই আইন বাতিল করিয়া সত্বর আইন সভা আহ্বান করিয়া বিনা ক্ষতিপূরণে ২১ দফা ওয়াদা অনুযায়ী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আইন পাশ করিতে হইবে। খাজনার হার কম, সাটিফিকেট প্রথা রহিত, বকেয়া খাজনার সুদ ও নদী সিকস্তি জমির নজরানা মওকুফ করিতে হইবে।

৪। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়াটো চুক্তি, পাক-বাগদাদ চুক্তি প্রভৃতি জাতীয় সংহতির পরিপন্থী সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি বাতিল করিতে হইবে। গত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত অধিকাংশ পরিষদ সদস্য ওয়াদাবদ্ধ হইয়া সামরিক চুক্তি বাতিলের জন্য যে মর্মে দস্তখত দিয়াছিলেন সেই মর্মে আইন পরিষদে প্রস্তাব পাশ করিতে হইবে।

৫। স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের ছাত্রদের বর্ত্তমান বেতনের হার এবং হোষ্টেল খরচ অবিলম্বে হ্রাস করিতে হইবে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করিতে হইবে।

৬। লিকুইডেটেড ও গ্রাম্য সমবায় সমিতি সমূহের খাতক নির্দ্ধারিত কিস্তিবন্দী মোতাবেক কিস্তির টাকা আদায় করিতে হইবে। ঋণসালিসী বোর্ড কর্তৃক মাফ দেওয়া সুদ (কণ্ট্রিবিউশন) আদায় ও সার্টিফিকেট বন্ধ করিতে হইবে। যাহাদের কিস্তিবন্দী করা হয় নাই তাহাদের জন্য কিস্তি নির্দ্ধারণ করিতেই হইবে।

৭। (ক) পাটের মূল্য ন্যূনপক্ষে প্রতিমণ ৩০ টাকা বাঁধিয়া দিতে হইবে। শুধু কয়েকজন ব্যবসায়ীকে পাট বিক্রয়ের লাইসেন্স না দিয়া বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী যাহাতে লাইসেন্স পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) পাট জন্মানোর লাইসেন্স ফি ও তামাকের ট্যাক্স রহিত করিতে হইবে।

(গ) সর্বত্র পাকি (৮০ তোলা) ওজনের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

৮। (ক) বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদানের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে গড়িমসি করা চলিবে না ---সত্বর নির্মাণ করিতে হইবে।

(খ) ২১শে ফেব্রুয়ারীকে কাল বিলম্ব না করিয়া সরকারী ছুটি ঘোষণা করিতে হইবে।

(গ) বর্দ্ধমান হাউসকে অবিলম্বে বাংলা ভাষার গবেষণাগার করিতে হইবে।

৯। (ক) ভিসা প্রথা রহিত করিতে হইবে।

(খ) সর্বহারা মোহাজেরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিত হইবে।

১০। ৯২(ক) ধারার আবরণে ৯৩ ধারা কার্যকরী করা চলিবে না। বাংলার যে সমস্ত গণপরিষদ সদস্য ৯৩ ধারা, বেঙ্গল রেগুলেশন এ্যাক্ট ও ফ্রন্টিয়ার ক্রাইমস আইন পাস করিতে ভোট দিয়াছেন তাহারা সমাজের ও গণতন্ত্রের শত্রু ---ইহা সর্বত্র প্রচার করা হইবে।

১১। (ক) পাকিস্তান হইবার পর রাস্তাঘাটের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, ইহার আশু সংস্কার চাই।

(খ) নদী, খাল, বিল, ইত্যাদি সংস্কার করিয়া প্রবল বন্যাকে প্রতিরোধ ও সেচের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) মুসলমানের ওয়াকফ সম্পত্তি ও হিন্দুদের দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি সম্পত্তির আয় জনহিতকর কাজে মোটেই ব্যয় হইতেছে না ; ইহার প্রতিকার চাই।

১২। মাথাভারি শাসন অর্থাৎ গভর্ণর জেনারেল, গভর্ণর, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, কমিশনার, হাই কমিশনার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন কম ও পদ লোপ করিয়া নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারী ও পুলিশের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে।

১৩। শিক্ষিত বেকার, ভূমিহীন কৃষক-মজুরদের জন্য কাজের ব্যবস্থা চাই।

রেল, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও শ্রমিকদের ছাঁটাই ও রিভার্সন বন্ধ করিতে হইবে।

১৪। বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষার আইন সত্বর কার্য্যকরী করিতে ও শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাদ্রাসা ও কলেজ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করিতে হইবে।

১৫। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম অগ্নিমূল্য হওয়ায় চাষী-মজুরদের ক্রয়ক্ষমতা একেবারেই নাই। অতএব লবণ, কেরোসিন তেল, নালী, নারিকেল তেল, হলুদ, মসলা ও লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কাঁচি, পাচন ইত্যাদি তৈয়ার করিবার জন্য লোহা; জমির সার, কাপড় তাঁতের সুতা, কর্মকারের কাঁসা, পিতল, করাতির করাত, সুতারের হাতুড়ি, বাটাল, রাঁদা ইত্যাদি যন্ত্রের এবং মাঝিদের জালের সুতা ও ছাত্রদের পুস্তক, কাগজ ও কালির মূল্য কমানোর সত্বর ব্যবস্থা চাই।

১৬। (ক) আখচাষীর আখ খরিদের সুব্যবস্থা ও উপযুক্ত মূল্য চাই।

(খ) তাঁতীদের জন্য বিশেষ সূক্ষ্ম সুতা ও মোটা সুতা আশু সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া তাঁতী সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

১৭। মদ, গাঁজা, ভাং, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি হারাম কাজ আইন করিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে হইবে।

১৮। মুসলমানগণ যাহাতে নামাজ, রোজা, হজ্ব জাকাত ইত্যাদি শরিয়ত সংগত কাজে অবহেলা না করেন এবং সকল শ্রেণীর নাগরিকদের চরিত্র গঠনের জন্য সরকারী প্রচার (তবলীগ) বিভাগ খুলিতে হইবে। হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৯। ঘুষ ও স্বজনপ্রীতিতে দেশবাসী অতিষ্ঠ, সত্বর ইহার স্থায়ী প্রতিকার চাই। শুধু চুনোপুটিকে শাস্তি দিলে চলিবে না, বড় বড় রুই-কাতলাকেও কঠোর শাস্তি দিতে হইবে।

২০। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কমাইতে হইবে এবং যাত্রীদের জন্য মোছাফের খানা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২১। সামরিক বিভাগে উচ্চ ও নিম্নপদে উপযুক্ত পরিমাণে বাঙ্গালী গ্রহণ করিতে হইবে।

২২। গরীব কৃষকদের ঘরদরজা ও নৌকা নির্মাণের জন্য প্রচুর পরিমাণে শাল কাঠ ও টিন সরবরাহ করিতে হইবে।

২৩। প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীসংখ্যা ৯ জনের বেশী রাখা চলিবে না, ডেপুটি মন্ত্রী, পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ইত্যাদি ২১-দফার ওয়াদানুযায়ী (মাথা ভারী শাসন যান) মোটেই নিযুক্ত করা চলিবে না।

২৪। বর্ত্তমানে বন্যার্ত্তদের সাহায্যার্থে যে সমস্ত চাউল, ধান, চিনি ইত্যাদি জিনিসপত্র স্বল্প মূল্যে সরকার সরবরাহ করিতেছেন তাহাতে সত্যিকারের গরীব জনসাধারণের উপকার হইতেছে না। বরঞ্চ সরকারের সুষ্ঠু নীতির অভাবে উহাতে চোরাকারবারী ও মোনাফাখোরীদের বৃটিশ ও মুসলিম লীগ আমলের চেয়ে বেশী সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এজন্য সত্বর ইহার প্রতিকারার্থে বিক্রয়ের নির্দ্দিষ্ট দর বাঁধিয়া সুষ্ঠুভাবে সরবারাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বি: দ্র:---কিছু দিনের মধ্যেই গণপরিষদে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র পাশ হইয়া যাইবে। অতএব, সারাদেশময় আন্দোলন করিয়া যদি ২১ দফা শাসনতন্ত্রে গ্রহণ করাইতে না পারি তাহা হইলে পাকিস্তান ও আমাদের বংশধরগণের সর্বনাশ হইবে। তাই দলে দলে এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া ২১-দফাকে বাস্তবে রূপদান করিতে সুষ্ঠ কর্মপন্থা গ্রহণ করিবার জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছি।

* ময়মনসিংহ হইতে মটর-বাসে, ঢাকা হইতে লঞ্চ-ষ্টিমারে, সিরাজগঞ্জ ঘাট হইতে লঞ্চ ও নৌকা যোগে যাতায়াত করা যাইবে।

আরজ গোজার
মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী
সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

তারিখ: মে, ১৯৫৫, আওয়ামী লীগের একটি সাংগঠনিক প্রচার-পত্র—লেখক

প্রথম সামরিক আইন জারি

(প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার বেতার ভাষণ)

৭ই অক্টোবর, ১৯৫৮

গত দু'বছর যাবত আমি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, দেশে নিষ্ঠুর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, দুর্নীতি, নির্লজ্জভাবে আমাদের সহজ সরল, সৎ, দেশপ্রেমিক ও খেটে খাওয়া জনগণকে শোষণ, সৌজন্যবোধের অভাব এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্মের অপব্যবহার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এর সামান্য ব্যতিক্রমও রয়েছে। কিন্তু সংখ্যায় অল্প বলেই দেশ পরিচালনার ব্যাপারে তাঁরা প্রভাব খাটাতে পারছেন না।

এসব অশুভ কর্মতৎপরতা দেশকে, স্বৈরতন্ত্রের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ফটকাবাজ ও শোষক শ্রেণীর ঘৃণ্য তৎপরতায় জনগণের অনিষ্ট হলেও তারা নিজেরা আরও ধনবান হচ্ছে।...

আমাদের কিছু সংখ্যক রাজনীতিবিদ বিলম্বে হলেও রক্তাক্ত বিপ্লবের কথা বলছেন। তাদের মধ্যে আরেক ধরনের ফটকাবাজ আছেন যারা বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে ধর্ণা দিয়ে তাদের সাথে সরাসরি ঐক্য জোটে অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে শ্রেয় মনে করেন। এটা রীতিমত রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল।

দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা

সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের সংসদে যে দুর্ভাগ্যজনক দৃশ্যের অবতারণা হয়ে গেছে, তা সকলেই জানেন। আমাকে বলা হয়েছে যে, এধরণের উপাখ্যান বিভাগোত্তর বাংলায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। তা অবশ্য হোক না হোক, এটা নিশ্চয়ই সভ্য জনোচিত পদ্ধতি নয়। আপনারা স্পীকারকে মেরে, ডেপুটি স্পীকারকে হত্যা করে এবং জাতীয় পতাকার অবমাননা করে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেননি।

আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মানসিকতা এতই নীচে নেমে গেছে যে, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমানের গোলযোগপূর্ণ আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে এবং আমরা যে অবর্ণীয় ও জটিল সমস্যা মোকাবেলা করছি তা মোকাবেলার জন্য এখনি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হব। আমরা চাঁদ থেকে মানুষ পেতে পারি না। যে জনগণ নিজেদের অধপতনের শেষ সীমায় পৌঁছে পাকিস্তান গড়েছেন, তারাই আবার নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য নির্বাচনে কারচুপি করবেন, এটা কল্পনাই করা যায় না। আমার মনে হয়, তারা আরও হিংসাত্মক মূর্তি ধারণ করবেন এবং আমি নিশ্চিত যে, এই

নির্বাচনে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত, আঞ্চলিক ও গোষ্ঠিগত ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। নির্বাচনে জয়ী হলে তারা পুনরায় গণতন্ত্রের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন এবং এটাই বর্তমানে দেশের ব্যাপক ভিত্তিক নৈরাশ্যের মূল কারণ।...

গত তিন বছর যাবত আমি গণতান্ত্রিক উপায়ে সংবিধান তৈরীর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা ঐক্যজোটের পর ঐক্যজোট গড়ার জন্য পরিশ্রম করছি। আমাদের আশা ছিল, আমাদের প্রশাসন স্থিতিশীল হবে এবং জনগণের স্বার্থানুসারেই দেশ পরিচালিত হবে। আমার বিরুদ্ধবাদীরা সব সময় আমার সকল প্রচেষ্টাকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করে আসছে। প্রেসিডেণ্টের উপর সকল দোষ চাপানোর একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন একজন কৌতুক করে বলেছিলেন, "প্রচুর বৃষ্টি হলে প্রেসিডেণ্টের দোষ, বৃষ্টি না হলেও প্রেসিডেণ্টের দোষ।" কিন্তু এসব বিশ্বাসঘাতক ও অদেশপ্রেমিক লোকের মনোভাবই হচ্ছে রাষ্ট্র প্রধানের সমালোচনা করে পক্ষান্তরে প্রেসিডেণ্ট ও সরকারের সম্মানহানী করছেন। এবং এ ব্যপারে তারা অনেক সফলও হয়েছে। এই অবস্থা অব্যাহত থাকতে দেওয়া হলে, তারা তাদের মূল লক্ষ্য হাসিলে সক্ষম হবে।

জনগণের মোহমুক্তি

আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে আমার ধারনা এই যে, বর্তমান সরকার ব্যবস্থার প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আর কোন আস্থা নেই। ক্রমাগত হতাশা তাদের মোহমুক্তি ঘটাচ্ছে এবং তারা যেভাবে শোষিত হচ্ছে ঠিক এইভাবে বিপজ্জনকভাবে অশান্ত হয়ে উঠছে। তাদের অশান্ত ও দুর্বিনীত হওয়া খুবই যুক্তি সঙ্গত। তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী নেতৃবৃন্দ কাজ দেখাতে পারেননি। নেতৃবৃন্দের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় জনগণের আস্থা অর্জনেও তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন।...

অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য

সংবিধানকে পবিত্র আমানত বলা হয়। কিন্তু সংবিধানের চেয়েও দেশ ও দেশের জনগণের কল্যাণ ও সুখ আরও বেশী পবিত্র। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে, আল্লাহ ও জনগণের সামনে আমার প্রধান কর্তব্য পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করা।...

আমি একজন নীরব দর্শক হিসাবে দেশের ধ্বংসের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করতে পারিনা। অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার সাথে গভীর ভাবে চিন্তা করার পর আমি এই দুঃখজনক সিদ্ধান্ত নিই যে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম হবো যদিনা আমি কোন পদক্ষেপ নেই যা কিনা আমার মতে বর্তমান অবস্থায় পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অপরিহার্য, সুতরাং আমি নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্ত নিচ্ছি:

(ক) ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসের ২৩ তারিখের সংবিধান স্থগিত থাকবে
(খ) কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার অবিলম্বে ভেঙ্গে দেওয়া হবে
(গ) জাতীয় সংসদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হবে
(ঘ) সমস্ত রাজনৈতিক দল অবলুপ্ত করা হবে
(ঙ) বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত, পাকিস্তান সামরিক আইনের আওতায় শাসিত হবে। এক্ষেত্রে আমি জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ককে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করলাম।...

আর পাকিস্তানের জনসাধারণকে সহযোদ্ধা এবং ভাই হিসেবে আমি বলছি, বর্তমান ব্যবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও আমি দেশের এবং জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দেশপ্রেমিক আইনানুগ জনগণকে বলছি, আপনারা সুখী এবং মুক্ত থাকবেন,। রাজনৈতিক রোমান্টিক, চোরাকারবারী, এবং হটগোল সৃষ্টিকারীরাই শুধু এতে ক্ষুব্ধ হবে এবং তাদের কার্যকলাপ কঠোর ভাবে দমন করা হবে। আর বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে আমি বলছি, দেশত্যাগই তাদের জন্য উত্তম পথ যদি তারা সুন্দর ভাবে একাজ করতে পারে তাহলে ভালই হয়।*

* বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, পৃষ্ঠা, ৬২৩—৬২৬

জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল

প্রেসিডেন্ট মীর্জা সরে দাঁড়ালেন।। সমগ্র ক্ষমতা জেনারেল আইয়ুব খানের উপর ন্যাস্ত

করাচী ২৭ অক্টোবর: প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মীর্জা আজ রাতে ঘোষণা করেন যে তিনি পদ থেকে সরে দাঁড়িয়ে জেনারেল আইয়ুব খানের নিকট সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মীর্জা আজ রাতে নিম্নলিখিত ঘোষণা দেন;

তিন সপ্তাহ আগে আমি পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করেছিলাম এবং জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করি। আল্লাহতাআলার অসীম কৃপায় এই পদক্ষেপ, যেটি আমি প্রাণপ্রিয় জন্মভূমির খাতিরে নিয়েছিলাম, আমাদের জনগণ এবং বিদেশে আমাদের বন্ধু ও শুভাকাঙক্ষীরা অত্যন্ত ভালভাবে তা গ্রহন করেছিলেন। সামরিক আইন জারীর পর থেকে আমি ও জেনারেল আইয়ুব খান প্রশাসনকে অবনতি রোধে এবং বিশৃঙখলা হ্রাস করার ব্যাপারে যথা সম্ভব চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যৎ প্রশাসনের জন্য একটি কার্যকরী কাঠামো সৃষ্টির প্রচেষ্টায় এবং গত তিন সপ্তাহে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছি যে,

(ক) দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ এই বিরাট কার্যসাধনে অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে যেটি এখনো বিকাশের পর্যায়ে রয়েছে

(খ) দেশে এবং বিদেশে একটি দু:খজনক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, আমি এবং জেনারেল আইয়ুব হয়তো যুগপৎভাবে সব সময় কাজ করবো না। এই এই ধারনা, আমার মতে, যদি অব্যাহত থাকে তা হলে আমাদের লক্ষ্য সাধনে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে, অতএব আমি পদ ছেড়ে দেওয়ার এবং সকল ক্ষমতা জেনারেল আইয়ুব খানের উপর ন্যাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি জেনারেল আইয়ুব এবং তাঁর সহকর্মীদের শুভ কামনা করি। পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।

পাকিস্তান অবজারভার

২৮, অক্টোবর, ১৯৫৮

[ছাত্রদের শহীদ দিবস পালন সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোপন চিঠি]

গোপনীয়

গোয়েন্দা শাখা, পূর্ব পাকিস্তান,
লালবাগ, ঢাকা।
তারিখ : ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১
নং—৩৫৮২।

বরাবর,
এ, কিউ, আনসারী,
সচিব,
স্বরাষ্ট্র বিভাগ,
পূর্ব পাকিস্তান সরকার,
ঢাকা।

বিষয় : ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১ তারিখে 'শহীদ দিবস' উদযাপন।

১। অন্যান্য বছরের মতো এবারও সকল পর্যায়ের ছাত্ররা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে যৌথভাবে "শহীদ দিবস" উদযাপন করে।

ঢাকায় ব্যাপকভাবে দিবসটি উদযাপিত হয়। বিভিন্ন সভা সমিতিতে ছাত্রদের অগ্রজ-প্রতীম জাতীয় নেতৃবৃন্দ অংশ নেয়।

২। ১২ই এপ্রিল ১৯৬১ তারিখে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি একটি সার্কুলার জারী করে। এতে এই বছর শহীদ দিবস উদযাপনকালে নিম্নলিখিত দাবীগুলি তোলার জন্য পার্টি কর্মীদের প্রতি নির্দেশনা দেয় :

ক, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন
খ, পার্লামেণ্টারী সরকার
গ, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা
ঘ, ছুটির দিন হিসাবে ২১শে ফেব্রুয়ারী
ঙ, 'শহীদ মিনার' নির্মাণের কাজ শেষ করা।

এতে আরও পরামর্শ দেওয়া হয় যে, সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও যদি জনগণকে সংগঠিত করে দিবসটি পালনের জন্য যৌথ প্রচেষ্টা নেওয়া যায়, তবে এটি হবে একটি সফল "প্রতিবাদ দিবস"।

৩। এই পার্টির ঢাকা জেলা কমিটিও ছাত্রদের দ্বারা নিম্নলিখিত দাবীসমূহ সরকারের কাছে তোলার পরামর্শ দিয়ে একটি সার্কুলার জারী করে :

ক, ২১শে ফেব্রুয়ারীকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা

খ, শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ সমাপ্তকরণ

গ, বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের উচ্চতর শিক্ষা ও সকল সরকারী কাজের মাধ্যম হিসাবে প্রবর্তন করা।

৪। আরও উল্লেখ করা যায় যে, ১।১।৬১ তারিখে নারায়ণগঞ্জ শহর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির এক গোপন সভায় ছাত্রদের একার উপর ছেড়ে না দিয়ে যুব ও সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতায় ব্যাপকভাবে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৫। পূর্ব পাকিস্তানের যুবলীগের ঢাকার কর্মীরাও দিবসটি ব্যাপকভাবে উদযাপন সম্পর্কিত আলোচনার জন্যে ২৭।১।৬১ তারিখে এক গোপন সভায় মিলিত হয়। শহীদ মিনার সাজানোর ব্যাপারে ছাত্রদের অনুরোধ করার জন্যে এবং স্থানীয় বাংলা ও ইংরেজী পত্রিকার ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার জন্যে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬। পত্রিকাগুলিকে অনুরোধ করা হয়েছিলো কিন্তু তারা ক্রোড়পত্র প্রকাশে অস্বীকৃত হয়। তবে দৈনিক 'ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ'-এ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় এবং দৈনিক 'সংবাদ' অসমাপ্ত শহীদ মিনারের ছবি ছাপে। 'পাকিস্তান অবজারভার', 'ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ' দিবসটির জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে অফিস বন্ধ রাখে কিন্তু পরবর্তী সকালে পত্রিকা প্রকাশনার ব্যবস্থা করে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও বিভিন্ন হল সংসদে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে বিধায় তার সমর্থকরা দিবসটি উদযাপনের প্রস্তুতিমূলক কাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

৭। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীরা ১।২।৬১ তারিখে কর্মসূচী নির্দ্ধারণের জন্যে এক গোপন সভায় মিলিত হয়। ডাকসু ও বিভিন্ন হল ইউনিয়নের সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের এবং ঢাকার অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এক সভায় সিদ্ধান্ত হয় এবং উক্ত সভায় প্রচারপত্র ও পোষ্টার ছাপানো, প্রভাত ফেরী বের করা, কবরে পুষ্পমালা অর্পণ, শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করার জন্যে এবং বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করার জন্যে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি প্রদান এবং সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার প্রস্তাবিত ইত্যাদি কর্মসূচীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮। সেই মোতাবেক ৮।২।৬১ তারিখে জাহান আরা আখতার (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও সহ-সভানেত্রী, ডাকসু)-এর সভানেত্রীত্বে ছাত্র প্রতিনিধিদের সভা ডাকসু অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ডানপন্থী দল তথা এন, এস, এফ, ছাত্রশক্তি ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ-এর কিছু প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলো। যদিও

সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন থেকে। শহীদ দিবস ব্যাপকভাবে উদযাপনের জন্যে ছাত্রদের প্রতি আহ্বান সংবলিত এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী সরকারী ছুটি ঘোষণা, শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ এবং জাতীয় জীবন ও প্রশাসনের সর্বস্তরে বাংলা চালু করার জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান সংবলিত ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিভিন্ন হলের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ছোট ছোট দলে প্রভাত ফেরী বের করা, কবরস্থানে যাওয়া, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ দিবসটি উদযাপনের জন্যে বিস্তারিত কর্মসূচী গৃহীত হয়। পরের দিন (৯-২-৬১) পত্রিকায় সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত প্রচার-পত্র ব্যাপকভাবে বিতরণ করে প্রচার কাজ চালানো হয়। ব্যাপকভাবে শহীদ দিবস পালনের আহ্বান সংবলিত কিছু পোষ্টার জগন্নাথ কলেজ, কার্জন হলের নোটিশ বোর্ডে এবং বিশ্ববিদ্যালয় গেটে ও ঢাকা হলের অডিটরিয়ামের কাছে সেঁটে রাখা অবস্থায় পাওয়া যায়। ন্যাশনাল ব্যাংক বিল্ডিং এর দেওয়ালে সেঁটে রাখা অবস্থায় আর একটি পোষ্টার পাওয়া যায়, যাতে শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছিল।

৯। কর্মসূচী অনুযায়ী ছাত্ররা ২৭-২-৬১ তারিখ প্রত্যুষে নিজ নিজ হল ও ও প্রতিষ্ঠানে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত প্রার্থনার জন্যে জমায়েত হয় এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শহীদমিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ইকবাল হল, আবদুর রহমান হলের ওপরে এবং জগন্নাথ কলেজের প্রাঙ্গনে কালো পতাকা তোলা হয়। অত:পর ছাত্ররা ছোট ছোট দলে নগ্ন পায়ে কালো ব্যাজ পরে আজিমপুর কবরস্থানের দিকে রওনা হয়। ব্যাজগুলি কাগজ অথবা কাপড়ে তৈরী ছিল। এগুলিতে বাংলায় "শহীদ স্মৃতি অমর হউক" এবং "একুশে ফেব্রুয়ারী জিন্দাবাদ" লেখা ছিলো।

যাওয়ার সময় ছাত্ররা 'প্রভাত ফেরী" গায় এবং নিম্নলিখিত শ্লোগান দেয়:

ক, 'একুশে ফেব্রুয়ারী জিন্দাবাদ'

খ, 'শহীদ স্মৃতি অমর হউক'

গ, 'একুশে ফেব্রুয়ারী সরকারী ছুটি ঘোষণা কর'

ঘ, 'শহীদ মনুমেণ্ট তৈরী কর'

ঙ, 'রোমান হরফে বাংলা লেখা চলবে না'

চ, 'ছাত্র জনতা এক হও'

ছ, 'ধোঁকা বাজি চলবে না'

১০। আজিমপুর গোরস্থানে পৌঁছে তারা ১৯৫২ সালে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু-বরণকারী বরকত ও ছালামের কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ একটি বাঁশে পোষ্টার ঝুলিয়ে দেয়। পোষ্টারে লাল কাগজে নীচের কথাগুলি লেখা ছিল :

"হে আমার দেশ, বন্যার মত, প্রচণ্ড অভিজ্ঞতার পলিমাটিকে সরিয়ে এনে একটি চেতনাকে উর্বর করেছি---এখানে আমাদের মৃত্যু ও জীবন সমাধি।"

মিছিলটি শহীদ মিনারে এসে শেষ হয় এবং মিছিলকারীরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে। এবং এর পাদদেশে সমবেত হয়। তাদের উদ্দেশ্যে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর (ছাত্র ইউনিয়ন, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা হল ইউনিয়ন) ভাষণ দেন। ভবিষ্যতে নিয়মিত দিবসটি পালনের জন্যে তিনি ছাত্রদের আহ্বান জানান। এ, কে, এম, জিয়াউদ্দিন (ছাত্র ইউনিয়ন) পুলিশের গুলিতে নিহত বরকতের বাবা-মার কাছ থেকে প্রাপ্ত একটিবাণী পাঠ করেন।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভানেত্রী জাহানারা আখতার উত্থাপন করেন এবং হাত তুলে প্রস্তাবসমূহ পাশ করানো হয়।...

সোয়া দশটা থেকে মিছিলকারীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১১। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ফুল দিয়ে সজ্জিত করা হয়। মিনারের উপরে একটি বড় কালো পতাকা উত্তোলিত হয় এবং কালো কাপড় দিয়ে মেঝে আবৃত করা হয়। কেন্দ্র-স্থলে লাল কাগজে শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার দাবী তোলা ছিলো। দিবসটি উদযাপন ও এর গুরুত্ব সম্পর্কিত নিয়ে প্রবন্ধ লেখা কিছু দেওয়াল পত্রিকা পাদদেশে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিলো। দেওয়াল পত্রিকাগুলি ছিলো নিম্নরূপ :

ক, ঢাকা হল ছাত্র সংসদের (চতুষ্কোন)

খ, ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্রসংদের (শিখা)

গ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের (পদক্ষেপ)

ঘ, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের (রক্তের অক্ষর)

১৪। নিম্নলিখিত ছাত্রদের দিবসটি উদযাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা গেছে:

১, বদরুল হক (ছাত্র ইউনিয়ন), ইকবাল হল

২, মওদুদ আহমেদ (পাকিস্তান ছাত্র শক্তি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর (ছাত্র ইউনিয়ন), সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা হল ইউনিয়ন

৪, ধীরেন্দ্র নাথ হাওলাদার (ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থক), সহ-সভাপতি, জগন্নাথ হল ইউনিয়ন

৫, এ, কে, এম, জিয়াউদ্দিন (ছাত্র ইউনিয়ন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৬, অমূল্য কুমার রায় (ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থক), সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু

৭, জাহানারা আখতার (ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থক), সহ-সভানেত্রী, ডাকসু

৮, এ, জেড, এনায়েতউল্লাহ খান (ছাত্র ইউনিয়ন)

৯, আবদুল লতিফ মল্লিক, মেডিক্যাল কলেজ

১০, জাহাঙ্গীর খালিদ, (ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থক) সহ-সভাপতি, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ সংসদ

১১, আমিনুল ইসলাম (ছাত্র ইউনিয়ন), প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডাকসু

১২, আশরাফুদ্দিন মকবুল (ছাত্র ইউনিয়ন), প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু

১৩, এ, এন, এস শহীদ ওরফে শহিদ সিং (ছাত্র ইউনিয়ন) সহ-সভাপতি, ঢাকা হল।

এছাড়া, এ, আর ইউসুফ (এন, এস, এফ)-কেও দিবসটি উদযাপনে অংশ নিতে দেখা গেছে।

মিছিলে আগমনকারী ছাত্র ছাড়াও কিছু সংখ্যক ছাত্র ও জননেতাকেও ছোট ছোট দলে বা ব্যক্তিগত ভাবে শহীদ মিনারে আসতে এবং অর্ঘ্য অর্পণ করতে দেখা গেছে। এদের বাধ্য ছিলেন (১) কাজী জহিরুল হক (কমিউনিস্ট পার্টি, প্রাক্তন নিরাপত্তা বন্দী শিশুদেরসহ) (২) কে, এম, ইলিয়াস (কমিউনিস্ট পার্টি) (৩) ডঃ এ, করিম (যুবলীগ, ন্যাপ)। (৪) আবদুর রহমান (এপসু) (৫) মিজানুর রহমান (যুবলীগ) (৬) আবদুল রশিদ (যুবলীগ) (৭) শামসুল আবেদীন (এপসু) (৮) শাহ আজিজুর রহমান (এপসু) ৯। আলাউদ্দিন আল আজাদ, অধ্যাপক, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা এবং (১০) আনোয়ার জাহিদ (যুবলীগ)।...

ব্যাপক উপস্থিতিপূর্ণ আলোচনা সভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের উদ্যোগে কার্জন হলে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উপচার্যও এতে উপস্থিত ছিলেন। জনাব আতাউর রহমান খান (লুপ্ত আওয়ামী লীগ এবং সাবেক মুখ্যমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তান) এবং জনাব মাহমুদ আলী (লুপ্ত ন্যাপ এবং সাবেক মন্ত্রী, পূর্ব পাকিস্তান) এবং প্রাক্তন কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন।

জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক অজিত গুহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ডঃ জি, সি, দেব এবং জনাব নূরুল মোমেন, প্রক্টর প্রমুখ ভাষণ দেন। তাঁরা প্রত্যেকে দিবসটির গুরুত্বের ওপর আলোচনা করেন এবং বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করার জন্য ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় প্রস্তাবসমূহ পাশ হয়।...

প্রস্তাবে গৃহীত ভাষা বিষয় নিয়ে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন ডাকসু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করেন কিন্তু প্রস্তাবসমূহ শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক হাত তুলে পাশ হয়ে যায়। বাংলা ভাষা ও দিবসটির উপর কিছু বাংলা গান সমন্বিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর আলোচনা সভা শেষ হয়ে যায়।

১৯। এস, এম হলের আলোচনা সভায় হলের অধ্যক্ষ ডঃ এম, হক এবং এফ, এইচ হল ও জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতিগণ তাদের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এগুলিতে কার্জন হলের অনুরূপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ও প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের লেকচার গ্যালারীতে মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রণেশ দাস গুপ্ত (কমিউনিস্ট পার্টি, প্রাক্তন নিরাপত্তা বন্দী, সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ) কর্তৃক এটি সভাপতিত্ব হওয়ার কথা। এটি যাচাই করা হয়েছে।

২০। সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কিছু ছাত্র মোমবাতি দিয়ে আলোক সজ্জিত করে।

২১। দেখা যাচ্ছে ৮-২-৬১ তারিখে যে কর্মসূচী গৃহীত হয় (ওপরে ৮নং অনুচ্ছেদ বর্ণিত) তাতে কালো পতাকা উত্তোলন করা, মিছিল বের করা, শ্লোগান দেওয়া এবং শহীদমিনারে সভা অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা ছিল না। এই বছর যেরকম শ্লোগান দেওয়া হয় তা পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ। গত বছর একটি মিছিল বেরিয়ে ছিল তবে তা কেন্দ্রীয় শহীদমিনার থেকে কবরস্থান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো। এই বছর এটি ব্যাপক ছিলো, এমনকি সচিবালয়ের সম্মুখস্থ নিষিদ্ধ এলাকাও এই মিছিল অতিক্রম করে।

২২। মিছিল ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সমাবেশের ফলে সামরিক আইন আদেশ সমূহ লঙ্ঘিত হয়েছে কী-না সে বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডি, আই, পি, ঢাকা, ঢাকার পাবলিক প্রসকিউটেরের সঙ্গে পরামর্শ করেন। পাবলিক প্রসিকিউটরের মতামতের এক কপি সংযুক্ত আছে। এটিকে পূর্ণত সহায়ক মনে হয়নি।

২৩। পূর্ব পাকিস্তান সরকার ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ তারিখের ১১১(১৭)-পল/এস(১)নং-স্মারকে দিবসটি সম্পর্কে অনুসৃত কর্মপন্থা বর্ণনা করেছিল। যদিও রাজনৈতিক ও ক্ষতিকর কিছু, বক্তাদের কাছ থেকে সক্রিয় অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল এইরূপ প্রত্যক্ষ কোন সাক্ষ্য পর্যন্ত নেই, তবুও আমার সুপারিশ হচ্ছে : মিছিলে ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণকারী ছাত্রদের নাম, কড়া ভাবে সতর্ক করার পরামর্শ দিয়ে উপাচার্যের কাছে প্রেরণ করা হোক। যদিও মিছিল এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সভায় বহিরাগতদের গুরুত্বপূর্ণ

(কম-বেশী) ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি তথাপি আমরা রিপোর্টটি আরও পরীক্ষা করছি। যদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এইরূপ কাউকে পাওয়া যায় তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বাক্ষর : (এ, এম, এ, কবির)
উপ-মহা-পুলিশ পরিদর্শক
আই-বি,
পূর্ব পাকিস্তান, ঢাকা।

ডি, ও, নং–১১২৪৭(১।১), ঢাকা, ২৩।৬।১৯৬১।

সুপ্রিয়,

(১) আপনাকে লেখার বিষয়টি হলো ছাত্রদের অবাঞ্ছিত কাজকর্ম থেকে বিরত রাখা, বিশেষতঃ মেধাবী ছাত্রদের। তা নাহলে তাঁদের পরবর্তী কর্মজীবনে এর কুপ্রভাব পড়তে পারে। এই বিষয়ে, গোপন সংবাদ সমন্বয়কারী কমিটির গভর্ণমেণ্ট হাউজে অনুষ্ঠিত এক সভায় আলোচনা হয় এবং পাল্টা পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(২) সামরিক বাহিনী, সিভিল সার্ভিস, আন্তর্জাতিক বৃত্তি এবং তদসম পর্যায়ের পদপ্রার্থীদের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন সমূহ পরীক্ষার সময় মাঝে মধ্যেই অত্যন্ত মেধাবী প্রার্থীকে বাদ দিতে হয় তার অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক সংযোগের জন্য। এই প্রেক্ষিতেই, আমি আমার ডি, ও, নং- ৫২৪১(১৭)১৬৯-৫৯/জি আই, তাং ২৫শে মার্চ ১৯৬১ ইং-তে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি ডি, আই, বি, ম্যানুয়েলের ১০১ ধারা অনুসরণ করবার জন্য, যাতে করে মা-বাবা এবং অভিভাবকরা প্রাথমিক অবস্থায় উপরোক্ত বিষয়ে অবহিত হন। মা-বাবা ও অভিভাবকদের এই সর্তক-করণের পেছনে একটিই আশা যে, তাঁরা তাঁদের রক্ষণাধীনদের সঠিক সময়ে এই সমস্ত কর্ম থেকে বিরত রাখতে পারেন। এই ধারা, তাহলে সেখানেই প্রযোজ্য যেখানে ছাত্রটি এই ধরণের কাজের সংগে সংযুক্ত হয়ে গেছে। আমাদের এখন এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার যার মাধ্যমে অন্ততঃ অন্যান্য মেধাবী ছাত্র যারা কোন ধরনের রাজনৈতিক কর্মের সাথে এখনো যুক্ত হয়নি। তাদের যেন অবাঞ্ছিত সকল সংযোগের ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে সাবধান করে দেওয়া যায় এবং তাঁরা যেন কোনক্রমে প্রতারণার বশবর্তী হয়ে ভুল না করে।

(৩) সেই পরিপ্রেক্ষিতে সুপারিশ করা হয় যে, প্রত্যেক ব্যাচের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রথম ৪।৫ জন মেধাবী ছাত্রকে সেশনের প্রারম্ভে ডেপুটি কমিশনার ডেকে এ ব্যাপারে যথাযথ বিষয়ের আলোকের আলাপ করতে পারেন।

(৪) এর জন্য পরিবেশগত সর্বোৎকৃষ্ট সময় নির্বাচিত হতে পারে চা-পর্বে। অর্থাৎ, ছাত্রসহ, জ্যেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জন এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে চায়ের দাওয়াত করা যেতে পারে। সেই অনুষ্ঠানে ছাত্রদের তাদের মেধার জন্য অভিনন্দিত করা যেতে পারে। এবং আরও উৎকর্ষতার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে। সেখানে সব রকম আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করে কেবলমাত্র ঘরোয়া বা সাধারণ আলাপের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে। আলাপ

সূত্রে ডেপুটি কমিশনার ছাত্রদের অভিনন্দিত করে উল্লেখ করতে পারেন যে, দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ছাত্রদের কাছে দেশের কি কি প্রত্যাশা আছে। এর পরে আরও বলা যেতে পারে যে, তাদের ব্যক্তিগত মতামত যা-ই থাকুক এবং তাদের চারপাশে রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যা ঘটছে সে বিষয়ে তাদের যতো কৌতূহলই থাকুক তারা যেন এমন কর্ম থেকে বিরত থাকে যার ফলে কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যেন তারা সরাসরি যুক্ত হয়ে না যায়। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন ধরণের সংগঠনের সাথে যুক্ত না হয়, যারা আবার বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী (যেমন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন) তাতে একটি ছাত্র বিশেষভাবে চিহ্নিত হতে পারে যা পরবর্তীতে সরকারী চাকুরী পাওয়ার ক্ষেত্রে ফল উল্টো বয়ে আনতে পারে।

এর পরে একটি ছোট খাটো আলোচনায় বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক দলের চারিত্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কিভাবে তারা ছাত্রদের বিভ্রান্ত করে ভুল পথে চালিত করে, অনেক ক্ষেত্রে এমন কি বিদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে পর্যন্ত উজ্জীবিত করে। তার পরে আবার সাধারণ বিষয়ে আলাপ চালানো যেতে পারে যাতে করে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে এবং ছাত্র ও যুবকরা মনে করে যে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের বিষয়ে সরকারী কর্মকর্তারা সচেতন এবং সে বিষয়ে চিন্তা করেন।

(৫) আমি আপনাকে সবিনয় অনুরোধ করছি, আলোচিত বিষয় সম্পর্কে আপনার ডেপুটি কমিশনারের সাথে আলাপ করবার জন্যে। আপনি তাঁকে এই চিঠিটিও দেখাতে পারেন এবং ইপ্সিত ফল লাভের জন্য যদি অন্য কোন উপায় সুপারিশ করা হয়, সে বিষয়ে আমাকে জানাবেন। যদি ডেপুটি কমিশনার আগামী মাসে এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে চান তাহলে আমি দরকার হলে আলোচ্য বিষয়ের একটি খসড়া তৈরী করে দিতে পারি।

(৬) যেহেতু আমরা সরকারী চাকুরীতে এমন লোকজনকে প্রবেশ করতে দিতে পারি না যাদের অতীত রাজনৈতিক ইতিহাস সুবিধার নয়। সেহেতু ছাত্র-জীবনের প্রারম্ভে সমস্ত তথ্য তাদের সম্মুখে তুলে ধরার দায়িত্বও আমাদেরই, অন্তত: বছরে একবার পূর্ব-উল্লেখ অনুযায়ী।

যদি এর পরেও তারা খারাপ রাজনীতির সঙ্গে মেলামেশা করে পরিণতির জন্য কেবলমাত্র তারা নিজেরাই দায়ী থাকবে।

(৭) ৮।৭।৬১-এর ভেতর এই চিঠির উত্তরটি পেলে খুশী হবো।

আপনার একান্ত

এ, এম, এ, কবির

২৩।৬।৬৬

১৯৬২ সনের শাসনতন্ত্র ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানে সম্ভাব্য ছাত্র রাজনীতি ও আন্দোলন মোকাবিলার পরামর্শে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবেদন

পূর্ব পাকিস্তান সরকার
স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) দপ্তর বিভাগ-১

ডি,ও, নং-১৬৩-রাজ/এস(আই), তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২

আমার প্রিয় সুলেইন,

ঢাকার সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে ভালোই উপলব্ধি হচ্ছে যে সংবিধান ঘোষণার সাথে সাথে কি অবস্থা দাঁড়াবে। সুতরাং এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে সমস্ত দিক দূরদর্শিতার সাথে বিবেচনা করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ যার ফলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অক্ষুন্ন থাকে।

২। কিছু নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা বিশেষত: কমিউনিস্টরা এবং অন্যান্য উগ্রপন্থীরা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে গুরুতর ভাবে ঘোলাটে করার জন্য বদ্ধপরিকর, যাতে করে সেই অবস্থার মাঝে তারা তাদের স্বার্থোদ্ধার করতে পারে। এমন কি, সংবিধানের বিষয়ে লেশ মাত্র ধারণা না থাকা সত্বেও, কমিউনিস্টরা এবং আওয়ামী লীগের সেই অংশ-বিশেষ দাবী আরম্ভ করেছে যে, সংবিধান একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়, তা বাদ দিতে হবে। মনে হয় যে তাদের কর্মপন্থা হবে ছাত্রদের উস্কিয়ে দিয়ে, তাদের মাধ্যমে মিছিল বার করা, রাষ্ট্রপতির ছবি পুড়িয়ে, নষ্ট করে, তাকে অপমান করা, অর্থাৎ প্রকৃত সরকারী কর্মকর্তাদের এতোদূরখানি উত্যক্ত করা যে শেষ অবধি তারা যাতে শক্তি ব্যবহারে বাধ্য হয় এবং তখন সেই শক্তি প্রয়োগের ঘটনাকে ভিত্তি করে কর্ম-কর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা। এ ছাড়াও তারা মৌলিক গণতন্ত্রের সদস্যদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরম্ভ করেছে এবং তাদের সদস্যপদ ত্যাগে বাধ্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৩। ঢাকার ঘটনা সমূহের বিষয়ে অবশ্য এটা বলা যেতে পারে যে, ঢাকায় যেসব মিছিল বের হয় শহরের সাধারণ মানুষ সে ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। তাতে সাধারণতঃ অংশ গ্রহণ করে থাকে কিছু সংখ্যক ছাত্র এবং বেশীর ভাগ গুণ্ডা প্রকৃতির লোক, যারা লুট তরাজ অগ্নি সংযোগের দ্বারা সৃষ্ট গোলযোগের মাঝে লাভবান হওয়ার আশায় প্রলোভিত হয়ে আসে। ইতোমধ্যেই ঢাকায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আরম্ভ হয়েছে যার ফলে নিশ্চিতভাবে এই সমস্ত গোলযোগের

হোতাদের ডিটেনশনে রেখে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সামরিক আইনের অধীনে বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৪। যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে এ ধরণের পরিস্থিতির সুযোগ দিয়ে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারী সব অদ্ভুত গুজব রটায়, যার মূল লক্ষ্য হলো, সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সহমর্মিতাবোধ বিনষ্টকরণ এবং হতাশা ও ভীতি সঞ্চার করা। অত্যন্ত ধীরতা ও ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে পুলিশ এবং সামরিক বাহিনী ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছে। তা এমনকি, সবচাইতে উগ্র অংশের প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য গুজব রটানো হয়েছে যে বিরাট সংখ্যক ছাত্রদের পুলিশ মেরে ফেলে মেডিক্যাল কলেজের মর্গে রেখেছিল এবং পরে গোপনে সেই সমস্ত মরদেহ সরিয়ে ফেলা হয়। আরও গুজব রটানো হয়েছে যা থেকে মানুষের মনে হয় যে, আইন প্রয়োগকারী কর্ম-কর্তাদের মধ্যে এ ধরনের পরিস্থিস্থিতিতে কি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সে বিষয়ে যথেষ্ট দ্বিমত আছে, যাতে করে ঘোলাটে অবস্থার মধ্যে আইন ভঙ্গকারীরা উৎসাহিত হয়ে আরো বেআইনী কাজকর্মে লিপ্ত হতে পারে।

৫। সাধারণ মানুষকে দলে টানার অভিপ্রায়ে বিশেষতঃ ছাত্র সমাজকে, যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে তা হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যতা। যেহেতু বৈষম্য আছে, সেহেতু এজিটাটুরদের পক্ষে মানুষকে বিভ্রান্ত করা আরও সহজ। কিন্তু বাদ দিয়ে যাওয়া হয় যে বিষয়টি, সেটা হলো বর্তমান সামরিক সরকারের পূর্ববর্তী অন্যান্য সরকারও কেবলমাত্র যে পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারেনি তা নয়, সেই সমস্ত সরকারের কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনাও ছিল না যার মাধ্যমে সুদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্যতা দূর করা যেতে পারতো। যে বৈষম্যতা এগারো বছরে গড়ে উঠেছে, তা এক রাতে নিশ্চিহ্ন হবেনা। এর জন্য সময় লাগবে। প্রধান বিষয় হলো তুলনামূলকভাবে গত তিন বছরে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অক্টোবর-এর অভ্যুত্থানের আগের এগারো বছরের চেয়েও অনেক গুণ বেশী। নীতিগতভাবে বর্তমান সরকার দুই অংশের মাঝে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈষম্য দূর করবার জন্য সচেষ্ট। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির সম্প্রচারিত ভাষণের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই ভাষণের ইংরেজী ও বাংলা তর্জমার হাজার হাজার কপি বিতরণ করা হচ্ছে, যাতে করে সাধারণ মানুষ সচেতন হয় যে সরকার গত তিন বছরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছে এবং নীতিগতভাবে ভবিষ্যতে আরও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে একই পর্যায়ের উন্নয়নের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।...

৬. ঢাকা ও অন্যান্য জায়গার ঘটনার বিষয়ে তথ্যগত সংবাদ ছাপা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে আমি আরও কিছু সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন সংযুক্ত করছি তা থেকে ঘটনাগুলোর মূল উৎঘাটিত হবে এবং তার গতিধারা বোঝা যাবে। এই সমস্ত প্রতিবেদন ও সংবাদপত্রের তথ্য সম্বলিত সংবাদ সমূহের আপনাকে একটি সামগ্রিক ধারণা পেতে সহায়তা করবে যার প্রেক্ষিতে যে কোন ধরণের গুজব ছড়ানো হলে তা মোকাবেলা করবার শক্তি আপনার থাকবে।

৭. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী এবং সেই বিষয়ে সকল পূর্ব পাকিস্তানীকে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে। যে প্রধান কারণের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে পূর্ব পাকিস্তান পিছিয়ে ছিল তা হলো স্বল্প বিনিয়োগকারীদের ভীতি। এই ভীতির উৎপত্তি হলো অল্প সংখ্যক উগ্র সংকীর্ণমনা কমিউনিস্টদের দ্বারা সংগঠিত উচ্ছৃঙখলতা ও দাঙ্গা।...

যদি আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে উন্নীত করতে চাই তাহলে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে পশ্চিম পাকিস্তান ও অন্যান্য বিদেশী দেশসমূহ, যাদের অর্থ এবং কারিগরী দক্ষতা ও জ্ঞান আছে, উভয় জায়গার লোকেরা এখানে আসবে এবং অর্থ বিনিয়োগ করবে। ঢাকার ঘটনাটির জন্য তাদের সেই উৎসাহে ভাটা পড়বে। যদি এই রকম আরও ঘটনা ঘটতে থাকে তাহলে এই এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে। যাঁরা অর্থ বিনিয়োগ করেন তাঁরা অত্যন্ত সাবধানী এবং একটি সবল প্রশাসন ও স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ না করলে তাঁরা অর্থ বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন না।

পূর্বে আওয়ামী লীগের এক অংশ ও ন্যাপের ছাত্রদের উপর ভাল প্রভাব ছিল, এবং তারা ছাত্রদের রাজনৈতিক বিক্ষোভের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে। তাদেরই কয়েকজন যারা ছাত্রনেতা হিসেবে সেই সময়ে কাজ করেছিলো, তারা ছাত্রদের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেননি।...

তারা ছাত্রদের মাঝে এই বলে প্রচার অভিযান চালাচ্ছিল যে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে, এই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তারা ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে আন্দোলন শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং এই বিক্ষোভ যাতে আসন্ন শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট হলো। জনাব সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতার তাদের কার্যক্রমে পরিবর্তন আনলো এবং তারা স্বরূপে আসতে বাধ্য হ'লো। ছাত্রদের অধিকাংশই জনাব সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারে তেমন বিচলিত ছিল না এবং প্রকৃতপক্ষে এ সকল প্রাক্তন আওয়ামী লীগার কর্তৃক আহূত হরতালের প্রতি তাদের

সমর্থনও ছিল না। কিন্তু সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে, চরমপন্থীরা তা সংখ্যায় যতো স্বল্প-সংখ্যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। এতদসত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হরতাল আংশিকভাবেই সফল হয়। অধিকাংশ ছাত্রই শুধুমাত্র গণ্ডগোল এড়ানোর জন্যই শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হয় নাই, তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট পরিকল্পনা করছিল যখন ঘটনাক্রমে জনাব মনজুর কাদের কয়েক মাস পূর্বে গৃহীত নিমন্ত্রণ মোতাবেক ইতিহাস বিভাগে বক্তৃতা দেয়ার জন্য গিয়েছিল, বিশৃঙখলা সৃষ্টিকারীরা জনাব মঞ্জুর কাদেরকে বক্তৃতা দিতে দিল না এবং এমন কি উপাচার্যের গাড়ীকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়কে রমজানের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হ'লো। উত্তেজনা সৃষ্টিকারীরা উপলব্ধি করলো যে তাদের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে এবং বেপরোয়া হয়ে রমজানের ছুটির প্রতিবাদে মিছিল বের করার মাধ্যমে আইন ভঙ্গ করার জন্য ছাত্রদের সংগঠিত করতে লাগলো। এটা অবধারিত ভাবে তাদের পুলিশের সাথে সংঘাতে আনলো। বিশেষ করে যখন তারা মিছিল সহকারে সচিবালয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। এতে অংশগ্রহণকারী ছাত্রের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম (৩৬০)। তবু পরবর্তীতে বিরাট সংখ্যক বহিরাগত তাদের সংগে যোগ দেয়। এর পরবর্তী ঘটনা সমূহ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্রদের একটি বিরাট অংশ এসব ঘটনায় অসন্তুষ্ট ছিল এবং এতে অংশগ্রহণও করে নি। তবু এটা নিশ্চিত যে এদের মধ্যে যারা বাড়ী ফিরে আসে তাদের কিছু কিছু সক্রিয়ভাবে এ সকল গুণ্ডামীতে জড়িত ছিল এবং হয়তো বা নিজ এলাকায় ছাত্র বিক্ষোভ আয়োজন করার জন্য নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিল। উত্তেজনা সৃষ্টিকারীদের কার্যকলাপ সাবধানতা সহকারে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

অমর একুশে ফেব্রুয়ারী
শহীদ দিবস পালন করুন

বন্ধুগণ,

শহীদের স্মৃতি-বিজড়িত অমর একুশে ফেব্রুয়ারী বৎসরান্তে পুনরায় আমাদের দ্বারে সমাগত। শহীদের রক্তরঞ্জিত এই পবিত্র দিবস আমাদের আবেগ, অনুভূতি ও চেতনার এক মহৎ অংশকে জুড়িয়া আছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও আমরা আমাদের শহীদ-ভাইদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমাদের হৃদয়ের প্রেম, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিব; আমরা যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত এই মহান দিবস উদযাপন করিব।

মুখের ভাষার ন্যায়সঙ্গত দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এগার বৎসর পূর্বে ১৯৫২ সালের এই দিনে যাহারা অকুতোভয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন, তাহারা সশরীরে আমাদের মধ্যে মধ্যে নাই বটে, তবে তাঁহারা যে অবিনশ্বর আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন আমরা তাহার উত্তরাধিকারী। ভাষার দাবী মানুষের জন্মগত অধিকারের দাবী। এগার বৎসর পূর্বে স্বৈরাচারী শাসকচক্রের বুলেট আর বেয়নেট সেই দাবীকে স্তব্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। নিজেদের বুকের তাজা রক্ত ঢালিয়া দিয়া সেই চক্রান্ত প্রতিরোধ করিয়াছিলেন বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার এবং অনেক নাম-না জানা শহীদ-ভাইরা। একুশে ফেব্রুয়ারী তাই এদেশের ছাত্র জনতার গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতীক দিবস। এই ঐতিহাসিক দিবসকে কেন্দ্র করিয়া সারা পূর্ব পাকিস্তান-এ বাংলা ভাষা-ভাষীর গণতান্ত্রিক স্বাধিকারের আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দিবস আজ তাই আমাদের সুমহান জাতীয় দিবসে পরিণত হইয়াছে।

অন্যান্য বৎসরের চাইতে এ বৎসর এক বিশেষ পরিস্থিতিতে একুশে ফেব্রুয়ারীর আগমন ঘটিতেছে। চুয়াল্লিশ মাস ব্যাপী সামরিক শাসনের অবসান দেশে গণ-তন্ত্রের মুক্তবায়ু প্রবাহিত হইবে এবং ছাত্র-জনতার সর্বব্যাপী সমস্যা সমাধানের বাস্তব চেষ্টার সূত্রপাত হইবে বলিয়া যে আশা সৃষ্টি হইয়াছিল, কার্যক্ষেত্রে তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। পক্ষান্তরে দেশময় চলিতেছে এক ঘোরতর অনিশ্চয়তা—যে অনিশ্চয়তা গণবিরোধী শাসকচক্রের গণতন্ত্র-বিরোধী নীতি ও কার্য-কলাপেরই অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল। গত ফেব্রুয়ারী হইতে এই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দলে দলে ছাত্র গ্রেফতার করা হইতেছে, জেলে পাঠান হইতেছে, তাহাদের উপর পুলিশের লাঠি-বন্দুক-বেয়নেট ব্যবহৃত হইতেছে, অনেককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কার করা হইতেছে, অনেককে রাষ্টিকেট করা হইতেছে, অনেকের

বৃত্তি বাতিল করা হইতেছে এবং প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ছাত্র সমাজের উপর সশস্ত্র গুণ্ডাদল লেলাইয়া দেওয়া হইতেছে, এক কথায় নির্বিচারে ছাত্র-দলন এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপর নজীরবিহীন হামলায় এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-জীবন বিপর্যস্ত হইতে চলিয়াছে। দেশের এই ঘন-তমসাময় পরিস্থিতিতে শহীদের স্মৃতি-বিজড়িত একুশে ফেব্রুয়ারীর পুনরাবির্ভাব সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এদিকে গণবিরোধী সরকার শহীদ মিনারের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার কাজে হাত দিয়াছেন, হয়তো এবারে ইহা সম্পূর্ণ হইবে। ইহা নিশ্চিন্তভাবেই ছাত্র-জনতার আপোসহীন সংগ্রামের জয়ের সূচনা। কিন্তু যে গৌরবময় মহান আন্দোলনের ঐতিহ্যের প্রতীক এই শহীদমিনার বর্তমান শাসকচক্র সেই আন্দোলনকেই গলা টিপিয়া হত্যা করার জন্য যাবতীয় দলনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই, আজিকার এই মহান দিবসে শহীদ স্মৃতি তর্পণের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অটল থাকার ব্যাপারে আমাদের অধিকতর সচেতন ও সংকল্পবদ্ধ হওয়া উচিত। প্রতিজ্ঞা ও কর্মে, শপথে ও সংকল্পে, আসুন, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ-ভাবে এই মহান দিবসের আদর্শকে সার্থক করিয়া তুলি।

শহীদ স্মৃতি অমর হোক

শহীদ দিবসের কর্মসূচী

সকাল ৫-১৫ মিনিটে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উত্তোলন।
সকাল ৫-৩০ মিনিটে প্রভাত ফেরী।
সকাল ৬-৩০ মিনিটে কবর জিয়ারত।
কবরস্থান হইতে শোভাযাত্রা সহকারে শহর প্রদক্ষিণ ও শোভাযাত্রা শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ।
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সভা।
দ্বিপ্রহরে বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির ও গির্জায় শহীদানদের আত্মার মাগফেরাত কামনা।
বেলা ২-৩০ মিনিটে কার্জন হলে আলোচনা সভা ও একশে স্মরণে গীতি-নক্সা।
সন্ধ্যা ৭টায় কার্জন হলে মিলাদ মহফিল।

স্বাক্ষরকারীগণ :

১। শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, সহ-সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ
২। ওবায়দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ

৩। এ, কে, এম, ফজলে হোসেন, সহ-সভাপতি, কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র পরিষদ

৪। মোহাম্মদ আনিস, সাধারণ সম্পাদক, কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ছাত্র পরিষদ

৫। সিদ্দিকুর রহমান, সহ-সভাপতি, মেডিক্যাল কলেজ

৬। হায়দার আলী, সাধারণ সম্পাদক, মেডিক্যাল কলেজ

৭। চৌধুরী সফি সামিহ্, সহ-সভাপতি, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল

৮। আবুল কালাম আজাদ, সাধারণ সম্পাদক, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল

৯। এনায়েতুর রহমান, সহ-সভাপতি, ফজলুল হক হল

১০। শাহ আতিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক, ফজলুল হক হল

১১। আসমত আলী শিকদার, সহ-সভাপতি, ঢাকা হল

১২। মীর্জা মোজাম্মেল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা হল

১৩। এ, এস, সওগাতুল আলম, সহ-সভাপতি, ইকবাল হল

১৪। এ, কে, ওয়াহেদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, ইকবাল হল

১৫। আনন্দ মোহন দাস, সহ-সভাপতি, জগন্নাথ হল

১৬। ধীরেন্দ্র নাথ বর্মন, সাধারণ সম্পাদক, জগন্নাথ হল

১৭। সৈয়দা শমসে আরা, সহ-সভানেত্রী, মহিলা হল

১৮। রওশন আক্তার বানু, সাধারণ সম্পাদিকা, মহিলা হল

১৯। বদরুদ্দোজা, সহ-সভাপতি, জগন্নাথ কলেজ

২০। আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, জগন্নাথ কলেজ

২১। ফোরকান মিয়া, সহ-সভাপতি, কায়েদে আজম কলেজ

২২। হাবিবুল্লাহ্ খান, সাধারণ সম্পাদক, কায়েদে আজম কলেজ

২৩। নাসির উদ্দিন আহম্মদ, সহ-সভাপতি, ঢাকা কলেজ

২৪। কাজী আফজালুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা কলেজ

২৫। মোঃ জাকারিয়া, সহ-সভাপতি, পলিটেকনিক ইনিষ্টিউট

২৬। মতিয়া চৌধুরী, সহ-সভানেত্রী, ইডেন কলেজ

২৭। জাহানারা বেগম, সাধারণ সম্পাদিকা, ইডেন কলেজ

২৮। তাহমিদা খানম, সহ-সভানেত্রী, ইডেন কলেজ (ইণ্টারমিডিয়েট সেকশন)

২৯। মাজেদা খাতুন, সাধারণ সম্পাদিকা, ইডেন কলেজ (ইণ্টারমিডিয়েট সেকশন)

---

* সামরিক শাসনোত্তার প্রথম শহীদ দিবসে ছাত্র সমাজের প্রচারপত্র, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩—লেখক

সতেরই সেপ্টেম্বর "শিক্ষা দিবস" পালন করুন

সংগ্রামী ভাই-বোনেরা,

স্বৈরাচারী সরকারের চরম নির্যাতনের মুখে শিক্ষাজীবন আজ বিপর্যস্ত। শিক্ষাগত দাবী লইয়া আন্দোলন করার জন্য আজ অসংখ্য ছাত্র বন্দী, অসংখ্য ছাত্র বহিষ্কৃত, কাঁদুনে গ্যাস আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অমর শহীদের রক্তে রাঙ্গা ১৭ই সেপ্টেম্বর আজ আগত। ওয়াজিউল্লাহ্, মোস্তফা ও ছোটভাই বাবুলের রক্তে রাঙ্গা এই ১৭ই সেপ্টেম্বর। কিন্তু সতেরর দাবী আজও পূরণ হয় নাই। তাই এই দিনে শিক্ষাগত দাবী লইয়া আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রতিহত করিতে হইবে সরকারের চরম নির্যাতন।

ছাত্রসমাজের ২২ দফা দাবীকে কেন্দ্র করিয়া আসুন তাই ১৭ই সেপ্টেম্বর "শিক্ষা দিবস" পালনের মাধ্যমে দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া তুলি।

কর্মসূচী : (১) ১৭ই সেপ্টেম্বর সকাল ৬টায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালোপতাকা উত্তোলন ও কালো ব্যাজ পরিধান, (২) প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা (৩) ঢাকায় আমতলায় বেলা ১১ টায় ছাত্রসভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ।

পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্রসমাজ

ছাপাখানা হইতে পুলিশ কর্তৃক আকস্মিকভাবে প্রচার পত্র ছিনাইয়া লওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইল।

তারিখ, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩—লেখক

পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও

সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তদের ঘৃণ্য ছুরি আজ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানের শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। ঘাতকের ছুরি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার মানুষের রক্তে লাল হইয়া উঠিয়াছে। দুর্বৃত্তদের হামলার ঢাকায় প্রতিটি পরিবারের শান্তি ও নিরাপত্তা আজ বিপন্ন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষের ঘরবাড়ী পোড়ান হইতেছে, সম্পত্তি বিনষ্ট করা হইতেছে, এমন কি জনাব্ আমির হোসেন চৌধুরীর মত শান্তিকামী মানুষদেরও দুর্বৃত্তদের হাতে জীবন দিতে হইতেছে। তাদের অপরাধ কি ছিল একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। গুণ্ডারা মুসলমান ছাত্রীনিবাসে হামলা করিয়াছে এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আমাদের মা-বোনের সম্ভ্রম আজ মুষ্টিমেয় গুণ্ডার কলুষ স্পর্শে লাঞ্ছিত হইতে চলিয়াছে।

এই সর্বনাশা জাতীয় দুর্দিনে আমরা মানবতার নামে, পূর্ব পাকিস্তানের সম্মান ও মর্যাদার নামে দেশবাসীর নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি, আসুন সর্বশক্তি লইয়া গুণ্ডাদের রুখিয়া দাঁড়াই, শহরে শান্তি ও পবিত্র পরিবেশ ফিরাইয়া আনি।

পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনের ওপর এই পরিকল্পিত হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে আমরা পূর্ব বাংলার সকল মানুষকে আহ্বান জানাইতেছি।

* প্রতি মহল্লায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করুন
* গুণ্ডাদের শায়েস্তা করুন, নির্মূল করুন
* পূর্ব পাকিস্তানের মা-বোনের ইজ্জত ও নিজেদের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করুন

দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি, পূর্ব পাকিস্তান।*

---

* তারিখ, ১৭ জানুয়ারী, ১৯৬৪

আইয়ুবকে পরাজিত করিয়া গণতন্ত্রের প্রতীক ফাতেমা জিন্নাকে জয়যুক্ত করুন

নির্বাচনী কলেজের সদস্য ও দেশবাসীর প্রতি ছাত্র সমাজের আহ্বান

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আসন্ন

ছাত্র-শ্রমিক-জনতার বুকের রক্তে যে আইয়ুব শাহীর হাত এখনো রহিয়াছে সিক্ত-কলঙ্কিত, সেই জুলুমশাহীকে সমূলে নিপাত করিবার দিন আসিয়াছে আজ। দিন আসিয়াছে বিগত ছয় বছরের অত্যাচার-নির্যাতন আর নির্মম শোষণের জবাব দান করিবার। ছয় বছর পূর্বে যে ডিক্টেটর আইয়ুব দেশবাসীকে গোলামীর শৃঙখলে আবদ্ধ করিয়া নিজের একনায়কত্বকে চিরস্থায়ী করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, যে আইয়ুব দেশবাসীকে 'গরু-ছাগল' আখ্যা দিয়া নিজেকে "সর্বশ্রেষ্ঠ" রাষ্ট্র পরিচালক ও "মহাশক্তিশালী" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, সেই "মহাশক্তিধর" আইয়ুবের পদতলে আজ ভূমি কাঁপিতেছে থর থর। শোষিত নির্যাতিত পাকিস্তানের দশ কোটি নর-নারী আজ পরাধীনতার শিকল ছিড়িয়া জাগিয়া উঠিয়াছে বিসুভিয়াসের মত। জনতার রুদ্র রোষের লেলিহান বহ্নিশিখায় পতঙ্গের মত পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবে দুষমন সব, পাপী-তাপী অত্যাচারী, শোষক-শাসকের দল। আজ আসিয়াছে সেই দিন। ঘোষিত হইবেই স্বৈরতন্ত্রের পরাজয় আর গণতন্ত্রের মহান বিজয়। আগামী ২রা জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। শুধু এ দেশবাসীরই নয়, সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আজ এই নির্বাচনের প্রতি হইয়াছে নিবদ্ধ। কেননা এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্রের প্রশ্নে---স্বাধীনতা বনাম গোলামী ও জুলুমবাজীর প্রশ্নে। এই নির্বাচনই নির্দ্ধারিত করিবে পাকিস্তানের ইতিহাসের ভবিষ্যৎ গতিধারা। সুতরাং আসন্ন নির্বাচন অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পাকিস্তান বাসীদের নিকট আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু জনগণের সুনিশ্চিত বিজয়ের মুখে ক্ষমতার মোহে অন্ধ জুলমবাজ আইয়ুবশাহী মরণ কামড় হানিতে পারে। তাই সতর্কতাই জনগণের বিজয়ের গ্যারান্টি।

নির্বাচনী কলেজের সদস্যদের প্রতি আবেদন

জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার কাড়িয়া লইয়া তাহাদের ঠুটো জগন্নাথ করা হইয়াছে। আজ আপনাদের ভোটেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবে। আপনারাই আজ জনগণের আশা পূরণের মালিক। দেশবাসী চায় গণতন্ত্র, চায় মিস্ ফাতেমা

জিন্নাহ্‌র বিজয়। তাই ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে জয়যুক্ত করাই আজ আপনাদের কর্তব্য। কিন্তু ক্ষমতাসীন চক্র আজ মিথ্যা প্রচারের বাণ ছুটাইয়াছে। আইয়ুব শাহী আপনাদের বিভ্রান্ত করিতেছে যে, মিস্‌ জিন্নাহ জয়যুক্ত হইলেই বুনিয়াদী গণতন্ত্র ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। তাহারা পবিত্র ধর্মের নামেও মিথ্যা প্রচার চালাইয়াছে। দেশপ্রেমিক ছাত্র সমাজের উপর ভরসা থাকিলে এই সব মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত না হইয়া উপযুক্ত জবাব দান করুন মিস জিন্নাহ্‌কে ভোট দিয়া। শাসক শ্রেণী আজ আপনাদের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রে নামিয়াছে। ভয়-ভীতি প্রলোভন দেখাইয়া তাহারা আপনাদের বিপথগামী করিতে চায়। কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে জানিবেন যে আপনাদের সাথে রহিয়াছে সংগ্রামী ছাত্র সমাজ ও জাগ্রত দেশবাসী। তাই প্রলোভনের ফাঁদে না পড়িয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিজের দায়িত্ব পালন করুন---"জিন্নাহ্‌কে" জয়যুক্ত করুন। এই মহান কর্তব্য পালনে সফল হইলে ইতিহাসে আপনারা অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কর্তব্য পালনে অবহেলা করিলে, কিংবা দেশবাসীর সহিত বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিলে ইতিহাস প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে ভুলিবে না, ক্ষমা করিবে না পূর্ব বাংলার বিপ্লবী ছাত্র সমাজ। তার জবাব দিতেই হইবে সেদিন জনতার দরবারে। আমরা সুনিশ্চিতভাবে, গভীর আত্মবিশ্বাসের সহিত ঘোষণা করিতেছি---আইয়ুব শাহীর উচ্ছেদ হইবেই হইবে। আপনাদের কাছে আবেদন এই ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনে আপনারা অকুতোভয়ে সামিল হউন।

দেশবাসীর প্রতি আবেদন

সর্ব শ্রেণীর জনসাধারণ ও বিশেষ করিয়া কৃষক সমাজের কাছে আমাদের আবেদন : শোষকদের উচ্ছেদের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করুন। গত ছয় বছরে জনসাধারণের ও বিশেষ করিয়া কৃষক সমাজের চরম সর্বনাশ সাধন করিয়াছে আইয়ুব সরকার। কৃষিপণ্যের মূল্য কমিয়াছে, মূল্য বাড়িয়াছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির। খাজনা ট্যাক্স বাড়িয়াছে বহু গুণ। ধনিকের ধন বাড়িয়াছে, গরীব হইয়াছে আরো নিঃস্ব। তাহার উপর চলিয়াছে অত্যাচার জুলুম জবরদস্তি। আজ তাই এই অত্যাচারী শোষকদের পরাজিত করিবার জন্য সর্ব শ্রেণীর মানুষকে সর্বশক্তি দিয়াই চালাইতে হইবে প্রচেষ্টা। কেবলমাত্র বুনিয়াদি গণতন্ত্রীদের ভোট দিয়া বসিয়া থাকিলেই চলিবে না। কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত সকল মানুষকে আরো ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত ভাবে আগাইয়া আসিতে হইবে নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্যেই। নিজ প্রচেষ্টা দ্বারাই করিতে হইবে ভাগ্যের পরিবর্তন। মরিবার পূর্বেও আইয়ুবশাহী জনগণের বিরুদ্ধে

সর্বনাশা ষড়যন্ত্র আঁটিতেছে। আইয়ুবের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া মিস্ জিন্নাহকে জয়যুক্ত করিতেই হইবে। ইহাই আমাদের বাঁচিবার পথ। তাই আসুন, আজ সকলে মিলিয়া নিম্নের কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করিয়া মিস জিন্নাহ্র বিজয়কে সুনিশ্চিত করিয়া তুলি। আসুন আজ সকলে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করি: শোষণের দিন শেষ, দিন শেষ জুলুমবাজীর।

ছাত্র সমাজের কর্তব্য

ছাত্র সমাজ আজ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে, গ্রহণ করিতেছে বলিষ্ঠ শপথ: গণতন্ত্রের প্রতীক ফাতেমা জিন্নাহকে বিজয়ী করিবই করিব। এই শপথকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিটি ছাত্রকে আজ চারণের বেশে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে গ্রাম বাংলার পথে পথে। হাটে-মাঠে-ঘাটে, শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র চালাইতে হইবে প্রচার। ছাত্র সমাজকে যাইতে হইবে জনতাকে সংঘবদ্ধ করিবার কাজে। নির্বাচনী কলেজের প্রতিটি সদস্যের নিকট পৌঁছাইতে হইবে দেশবাসীর ম্যাণ্ডেট: "ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দাও। পালন কর দায়িত্ব।" যে কোন মূল্যেই আজ [উচ্ছেদ করিতে হইবে আইয়ুবশাহী। এই আইয়ুব শাহীর উচ্ছেদের জন্যই গত তিন বছর ধরিয়া শত নির্যাতনের মুখে বুলেটের সামনে বুক পাতিয়া, বেয়নেটের নীচে দাঁড়াইয়া আমরা---ছাত্র সমাজ নির্ভীকভাবে চালাইয়া আসিয়াছে সংগ্রাম। আইয়ুব শাহীর বুলেটে নিহত নাম জানা-অজানা শহীদদের অতৃপ্ত আত্মা আজ দিয়াছে আমাদের কানে কানে ডাক। ডাক দিতেছে অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠ হইতে বন্দী ভাইরা। আজ আসিয়াছে দেশের ডাক্---মায়ের ডাক। এই ডাকে আমরা সাড়া দিবই, উচ্ছেদ করিবই স্বৈরাচারী শাসকদের। তাই প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে পালন করিতে হইবেই নিম্নের কর্মসূচী। ইহাই ছাত্র সমাজের কর্তব্য।

- সকল ইউনিয়ন এবং সম্ভব হইলে সকল ইউনিটে "ফাতেমা জিন্নাহ্ নির্বাচনী' কমিটি গঠন। রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, ছাত্র, যুবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মিলিতভাবে ইহা গঠন করা।
- সকল ইউনিটে অথবা আঞ্চলিক ভিত্তিতে জনসভা করিয়া নির্বাচনী কলেজের প্রতিটি সদসস্যের উপর মিস জিন্নাহ্র সমর্থনে ম্যাণ্ডেট প্রদান ও শপথ গ্রহণ
- শহরে-গ্রামে গাঁয়ে-গঞ্জে সর্বত্র প্রচার, জনসভা, পথসভা, ছোট এবং বড় মিছিল অনুষ্ঠান

o ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কলেজের সদস্যদের উপস্থিত করা ও ক্ষমতাসীনদের কব্জা হইতে তাঁহাদের রক্ষা করা

o ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রের নিষিদ্ধ সীমার বাহিরে হাজার হাজার গণজমায়েতের ব্যবস্থা

o শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য সর্বসময়ে প্রয়োজনীয় তৎপরতা

o মিস্ জিন্নাহ্র নির্বাচনী তহবিলে অর্থ প্রদান ও অর্থ সংগ্রহ।

পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্র সমাজ
ঢাকা।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ ও পাকিস্তান ছাত্র শক্তি কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইষ্ট পাকিস্তান প্রেস, ২৬৩, বংশাল রোড, ঢাকা-১ হইতে মুদ্রিত।

তারিখ, ডিসেম্বর, ১৯৬৪

বাংলা ভাষার বর্ণ বর্জনের প্রতিবাদে
সাধারণ ছাত্র জমায়েত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলে সম্প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের ধুয়া তুলে মূলতঃ বহুল ব্যবহৃত ঙ, ণ, ঞ, ঈ, উ, ঐ, ঔ, ষ, ৎ প্রভৃতি হরফ বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উপরন্তু বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষার প্রচলিত যুক্তাক্ষর যথা ক্ষ, ক্ত এবং সমুদয় ফলা যথা দ্য, য্য, স্ম, প্রভৃতি বর্জন, 'ৈ' ও 'ি' কার বর্জন প্রভৃতির সিদ্ধান্ত উক্ত কাউন্সিলে গৃহীত হয়।

এই বর্ণমালা বর্জনের দ্বারা ভাষা সহজ হবে এবং তা শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক হবে, এই যুক্তি দেখিয়ে একাডেমিক কাউন্সিল বর্ণ বর্জনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মূলত: তা বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং বাংলা ভাষায় শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করবে।

বর্ণমালা বর্জন বা বানান পরিবর্তনের ফলে শব্দ তার মূলগত অর্থ এবং ব্যবহারগত অনুসঙ্গ থেকে বিচ্যুত হবে। ভাষার যে সচল প্রবাহ রয়েছে এই সংস্কার দ্বারা তা ব্যাহত হবে। আমরা জানি সরকার শিক্ষা সঙ্কোচন নীতির ধারক। সেক্ষেত্রে এই বর্ণমালা-সংস্কারের দ্বারা ভবিষ্যতে শিক্ষাবিস্তারের ধুয়া তুলে মূলতঃ জনগণের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান ব্যুৎপত্তিকেও নাকচ করতে চাইছে, এটা উপলব্ধি করা কষ্টকর নয়।

গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মূলতঃ বাঙালী স্বাতন্ত্র্যবোধ তথা বাঙালী সংস্কৃতির যে জনজাগরণ আজ সর্বত্র দেখা দিয়েছে সেই জাগরণকে স্তিমিত করার জন্যই এই প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই 'পাকিস্তানী তমদ্দুন' এই দোহাই দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানী সংস্কৃতির ওপর আঘাত এসেছে। আজকের এই হীন প্রচেষ্টা এ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়।

আরও লক্ষ্য করার বিষয় বাঙলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার যে প্রবল জনমত গড়ে উঠেছে তার বিরোধিতা করার ক্ষমতা সরকারের আর নেই। আজ তাই পরোক্ষে বাংলা বর্ণমালা বর্জন করে নতুন 'লেখ্যরীতির' সূচনা দ্বারা এই প্রচেষ্টার মূলে আঘাত হানা হচ্ছে। নতুন লেখ্যরীতিতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাঙলাকে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা আরও পশ্চাৎপদী হবে।

এ সকল বিষয় বিশ্লেষণ করেই দেখা যাবে বাঙলা বর্ণমালা সংস্কারের পশ্চাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কার্যকরী। বাঙলা ভাষার ওপর এই আঘাতকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের আজ প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতে হবে।

সংস্কৃতি সংসদ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ণ বর্জনের প্রতিবাদে সংস্কৃতি সংসদ আয়োজিত সাধারণ ছাত্র সভায় যোগ দিন। ৩রা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার বিকেল চারটায় মধুর রেস্তোরাঁ প্রাঙ্গণ।

তারিখ, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হামলার প্রতিবাদ

১৫ই জানুয়ারীর সভা ও মিছিলে দলে দলে যোগদান করুন

চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। সকল উন্নত জাতির বিকাশের মূলেই রয়েছে এই অধিকারের নিশ্চয়তা। সে কারণেই প্রতিটি উন্নতিকামী স্বাধীন জাতিই চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে প্রাণেরও অধিক মূল্যবান বলে মনে করেন এবং তা সংরক্ষণের জন্য কোনো ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধাগ্রস্ত হন না। পক্ষান্তরে এও লক্ষ্যণীয় যে, কোনো জাতিকে দাবিয়ে রাখতে চাইলে তাদের শাসকবর্গ চান প্রথমেই সে জাতির চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে দিতে। এ উদ্দেশ্যে শাসকবর্গ জাতির চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে কেড়ে নিতে এমন ষড়যন্ত্র নেই যার জাল বিস্তার করতে ইতস্ততঃ বোধ করেন, এমন কোনো সরকারী মাধ্যম নেই যার সাহায্য সক্রিয় হয়ে উঠতে সামান্যতম দ্বিধাবোধ করেন। আমাদের বেলাতেও বিগত বাইশ বছরের ইতিহাসে দেখা গেছে সরকার স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বিশেষ করে এ প্রদেশের জনসাধারণের কণ্ঠ রোধ করা এক প্রধান নীতি হিসাবে অনুসরণ করে চলেছেন। কুখ্যাত প্রেস ও পাবলিকেশনস্ অর্ডিন্যান্স জারী করে সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়ার যে স্বেচ্ছাচারী নজীর স্থাপন করা হয়েছে, তা শুধু বৃটিশের শাসন নীতির সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। এই অর্ডিন্যান্স জারী করার পূর্বেও স্বাধীনতা লাভের পরে পরেই পূর্ব বাংলার সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করা হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত প্রকাশনা ক্ষেত্রে সরকারী বিধি নিষেধের খাড়া সমানভাবে ঝুলে রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সংশ্লিষ্ট দফতরের যে কোনো কর্মচারীর মাধ্যমে লিখিত অলিখিত যে কোনো উপায়ে 'প্রেস উপদেশ' ও সংবাদ বিশেষের ওপর 'এমবার্গো' জাতীয় ব্যবস্থার সাহায্যে জনমতের স্বাধীনতার উপর হামলা। অন্যদিকে জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত রেডিও এবং টেলিভিশন সরকার সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব প্রচার যন্ত্ররূপে কুক্ষিগত করে রেখেছেন। সকলের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ রেডিও, টেলিভিশনে তো নেই-ই, এমন কি এই সব প্রচার-যন্ত্র স্বাধীনভাবে শব্দও ব্যবহার

করা যায় না। বেসরকারী সংবাদপত্রের ওপরও এ ধরণের জুলুম প্রতিনিয়ত অব্যাহত রয়েছে এবং প্রতি মুহূর্তে এ-সবের সঙ্গে সংগ্রাম অথবা আপোস করে তাদের টিকে থাকতে হচ্ছে। যেখানে আপোস আর সম্ভব হয় না, সেখানে সরকারী বিজ্ঞাপন কমানো বা বন্ধ করার চাপ সৃষ্টি থেকে শুরু করে সাংবাদিক, সাহিত্যিকদের কারারুদ্ধ করা এবং অবশেষে কাগজ বন্ধ করা পর্যন্ত স্বৈরাচারী পদক্ষেপের কোনোটাই প্রয়োগ করতে সরকারকে কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখা যায়নি। এই ধরণের কাজে সহায়তার জন্যে জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো (B.N.R) প্রভৃতি সংস্থার সাংস্কৃতিক গোয়েন্দাগিরিও অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ-দেশের চিন্তা ও মত প্রকাশ পরিস্থিতির এই হলো একদিকের চিত্র।

এরই পাশাপাশি রয়েছে গ্রন্থ প্রকাশের ওপর সরকারের ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত দমননীতি। স্বাধীনতার পর এ প্রদেশে সরকার যে একে একে কত বই বাজেয়াপ্ত করেছেন তার হিসেব নেই। বিশেষ করে সম্প্রতি সেই কুখ্যাত প্রেস ও পাবলিকেশনস্-এর কালাকানুনের সাহায্যে গ্রন্থ বিশেষের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে, কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী এবং কোন বই আটক ও বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে সরকার নতুনভাবে চিন্তা ও মত প্রকাশের কণ্ঠরোধে তৎপর হয়ে উঠেছেন। এই হামলার হিড়িক আইয়ুবী আমলের স্বৈরাচারকেও ছাড়িয়ে গেছে। এ-অবস্থার ফলে কেবল যে লেখকদের স্বাধীনভাবে লেখার উৎসাহ দমিত হচ্ছে তাই নয়, প্রকাশকরাও বই প্রকাশে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছেন এবং ফলে সংস্কৃতির জগতে নেমে আসছে চরম বন্ধ্যাত্ব। বস্তুতঃ স্বৈরাচারী শাসকবর্গের নিকটও একটি জাতিকে অবদমিত রাখার জন্যে এটাই হলো সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা। যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তেই চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর এই পরিকল্পিত হামলার ব্যাখ্যা কি? এই অসঙ্গতির মূল কোথায়? তাই এ-মুহূর্তে লেখকদের স্বাধিকার সংরক্ষণ এবং চিন্তা ও মত প্রকাশের ওপর যে কোন প্রকারের হামলার প্রতিরোধে প্রতিটি নাগরিককে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হতে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। শেষবারের মতো এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করা আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে যে, আমরা স্বাধীন জাতি এবং আমাদের চিন্তা ও মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ আমরা যে কোনো মূল্যে প্রতিরোধ করব এবং এই অনাচারকে আমরা কিছুতেই কায়েম থাকতে দেব না।

সভার স্থান: বাঙলা একাডেমী প্রাঙ্গণ
১৫ই জানুয়ারী, বিকাল ৩টা
সভাপতি : ডক্টর এনামুল হক

বক্তৃতা করবেন : শিল্পী জয়নুল আবেদিন, ডক্টর আহমদ শরীফ, বেগম সুফিয়া কামাল, সিকান্দার আবু জাফর, কে, জি, মোস্তফা, রণেশ দাশগুপ্ত, শহীদুল্লাহ কায়সার, অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন প্রমুখ।

লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটির পক্ষ থেকে প্রচারিত ও সমকাল মুদ্রায়ন থেকে মুদ্রিত

তারিখ, ১৪ জানুয়ারী, ১৯৬৯

জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন.এস.এফ)-এর প্রচার-পত্র

আজ গোটা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ প্রতি মুহূর্তে নির্যাতিত ও নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত। আজকে বিদ্যায়তনে, ছাত্রাবাসে, পথে ঘাটে সর্বত্র ছাত্ররা পুলিশী ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ বাহিনীর অতর্কিত নগ্ন হামলা ও জুলুমের শিকার হইতেছে। তাহাদের নিরাপত্তা প্রতি মুহূর্তে বিঘ্নিত হইতেছে। গোটা ছাত্র সমাজকে দাবিয়ে রাখার জন্য কর্তৃপক্ষ অমানুষিক ও পৈশাচিক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। তাই পূর্ব পাকিস্তানের গোটা ছাত্র সমাজকে আজকে যোগ্যতার সাথে সম্পূর্ণ মোকাবেলা করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে ১৯৫২ সাল ও ১৯৬২ সালের ইতিহাসের পুনারাবৃত্তি করিতে হইবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২২ দফা দাবী আদায়ের জন্য আপনারা জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সংগ্রামী পতাকাতলে সমবেত হউন। আওয়াজ তুলুন অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, রুখে দাঁড়ান জেল জুলুম ও বুলেট বেয়নেটকে।

আমাদের সংগ্রামী ২২ দফা নিম্নরূপ :

১, ডঃ ওসমান গনির পদত্যাগ
২, সাইদুর রহমানের উপর থেকে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করা
৩, ডঃ মফিজ উদ্দিনের পদত্যাগ
৪, সাইদুর রহমান স্মৃতি সৌধ নির্মাণ
৫, করিমের বহিষ্কার আদেশ কার্যকরী করা
৬, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচার
৭, শিক্ষায়তনে পুলিশ ও ই, পি, আর বাহিনীর নির্যাতনের বিচার চাই
৮, গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের বিনা শর্তে অবিলম্বে মুক্তিদান
৯, বিদ্যালয় ও কলেজসমূহের শিক্ষকদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দান
১০, ছাত্রদের বেতন হ্রাস
১১, বিনা বেতনে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ দান
১২, বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিলকরণ
১৩, ডাক্তারদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দান
১৪, মেডিকেল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অটোপ্রমোশন প্রথা বাতিল
১৫, প্রদেশে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

১৬, রাজশাহী মেডিকেল কলেজের এন, এস, এফ নেতৃত্বয়ের উপর থেকে বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার

১৭, প্রেসিডেণ্টের ঘোষণা মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা অবিলম্বে বাস্তবায়িত করা

১৮, উভয় প্রদেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৈষম্যের স্থায়ী সমাধান

১৯, পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা রোধ ক্ষেত্রে স্থায়ী সমাধান

২০, পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা

২১, পলিটেক্নিক ছাত্রদের জন্য কনডেন্স কোর্স চালু করা

২২, ছাত্রদের বৃত্তি বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার সমাধান।

---

২২ দফা জিন্দাবাদ। এন, এস, এফ জিন্দাবাদ

পাকিস্তান জিন্দাবাদ

এন, এস, এফ, কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক প্রচারিত

---

* গণঅভ্যুত্থানের সময়ে জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন জমির আলী উপদলের প্রচার পত্র —লেখক

পূর্ব পাকিস্থান কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার-পত্র

পূর্ব বাংলার সংগ্রামী ছাত্র সমাজ---তোমাদের প্রতি আমাদের বিপ্লবী অভিনন্দন। পূর্ব বাংলার সংগ্রামী মানুষ আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও বড় ধনিক এবং তাদের স্বার্থের পাহারাদার স্বৈরাচারী আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে পতাকা তুলে ধরেছে---সেই পতাকাকে তোমরা তোমাদের ১১ দফা কর্মসূচী ভিত্তিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৭ই, ১৮ই, ১৯শে, ২০শে ও ২১শে জানুয়ারীতে আরও উর্ধে তুলে ধরেছো।

শহীদ হয়েছেন আসাদুজ্জামান। শহীদ আসাদুজ্জামান এবং অন্যান্য শহীদানদের রক্ত নতুন শপথে মহীয়ান হয়ে উঠেছে। শহীদ বীর তোমরা—মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তোমরা মৃত্যুকে জয় করেছ। শহীদানদের আত্মদান শ্রমিক শ্রেণীর লাল পতাকার রং-কে আরও লাল করে তুলেছে। কমরেড---তোমাদের জানাই সালাম, তোমাদের নামে আমরা শপথ নিচ্ছি---তোমাদের অসমাপ্ত কাজ আমরা করবোই, তোমাদের রক্তের প্রতিশোধ আমরা নেবই; আয়ুব স্বৈরাচারের সমস্ত রকমের অত্যাচারকে পরাস্থ করে আমরা তুলে ধরবো সংগ্রামী জনতার বিজয় পতাকা। তোমাদের ১১ দফা কর্মসূচী ও সংগ্রামী বাণীকে আজ পৌঁছে দাও গ্রামে, শহরে, স্কুলে, কলেজে, কৃষকের ঘরে ও শ্রমিকের বস্তিতে।

* আয়ুব শাহী ধ্বংস হোক
* মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক
* নির্বাচন---বর্জন কর
* সংগ্রামী ছাত্র ও বীর জনতা---জিন্দাবাদ
* জনগণের জয়---অনিবার্য।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি
২১শে জানুয়ারী, ১৯৬৯

গণতান্ত্রিক জোট ডাকের ইশতেহার

স্বাধীনতা লাভের একুশ বছর পরেও আমাদের কোন সমস্যার সমাধান হয় নাই। বৃটিশের গোলামীর শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভের পর এক স্বাধীন সুখী সমৃদ্ধিশালী গণতান্ত্রিক পাকিস্তান গঠনের স্বপ্ন আপনারা দেখিয়াছিলেন। যেখানে জুলুম-শোষণ, দুঃখ-দারিদ্র, বেকারী-অশিক্ষা, রোগ-মহামারী থাকিবে না---সুখী ও সুন্দর জীবনের অধিকার প্রতিটি মানুষ লাভ করিবে। কোটি কোটি মানুষের সেই স্বপ্ন আজও স্বপ্ন রহিয়া গিয়াছে।

জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় নাই বটে; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় সামন্তবাদী ও একচেটিয়া ধনীক শ্রেণী জনসাধারণকে নিষ্ঠুরভাবে শোষণ ও লুণ্ঠন করিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। মাত্র বিশ বাইশটি পরিবারের হাতে দেশের ধন-দৌলতের চার ভাগের তিন ভাগ জমা হইয়াছে। একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সামন্তবাদীদের ধনদৌলত ও সম্পত্তির হেফাজত ও শোষণ ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করিবার মতলবে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করা হয়। অস্ত্রের জোরে আইন সম্মত সরকার ও শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া দিয়া স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হয়। সার্বজনীন ভোটাধিকার, কথা বলার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ স্বাধীন জাতির সকল এখতিয়ার কাড়িয়া নেয়া হইয়াছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ব-শাসনের অধিকার অস্বীকার করা হইয়াছে। এইভাবে কার্যত: অশেষ ত্যাগ ও সাধনা লব্ধ স্বাধীনতা হইতে পাকিস্তানী জাতিকে বঞ্চিত করিয়া একনায়কত্ববাদী শাসনের গোলামীর জিঞ্জিরে গোটা জাতিকে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

গণজাগরণ---গণআন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ প্রায় এক যুগ ব্যাপী নির্মম শোষণ ও নিষ্ঠুর অত্যাচার উৎপীড়নে জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই অসহনীয় নির্দয় শাসন ও শোষণের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য দেশ জোড়া স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলনের সূচনা হইয়াছে। আয়ুবশাহীর গোলামী জিঞ্জির হইতে মুক্তিলাভ করা ও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক শাসন ও সমাজ প্রতিষ্ঠাই এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। মুক্তিকামী জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সাধ-স্বপ্নকে রক্তের বন্যায় ভাসাইয়া দিবার উন্মুক্ত প্রয়াসে মাতিয়া শাসকচক্র ছাত্র-জনতার উপর নির্বিচারে লাঠি, টিয়ারগ্যাস, বুলেট, বেয়নেট, ১৪৪ ধারা, কারফিউ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং অগণিত মানুষকে হত্যা, জখম ও গ্রেফতার করিয়াছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ,

খুলনা, ময়মনসিংহ, লাহোর, করাচী, পেশোয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি সহ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর নগর জনপদের পীচঢালা রাজপথ ও সবুজ মাটি শহীদের তাজা খুনে রাঙ্গা হইয়াছে। কিন্তু দমননীতি ও নৃশংস হামলার মুখেও সংগ্রামী জনতার ইস্পাত কঠিন সংকল্প একটুও টুটে নাই। শত অত্যাচার উৎপীড়ন, বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া আরো দুর্বার গতিতে গণআন্দোলন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

১৪ ফেব্রুয়ারী হরতাল

জনতার ঐক্য ও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের সম্মুখে কোন গণবিরোধী শক্তি টিকিতে পারে না, ইহাই ইতিহাসের শিক্ষা। কিন্তু এইজন্য প্রয়োজন যে গণ ঐক্য ও শৃঙ্খলাবদ্ধ গণআন্দোলন তাহা কোন দলের একক প্রচেষ্টায় গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। তাই আটটি রাজনৈতিক দল এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য আগাইয়া আসিয়াছে এবং যুক্তভাবে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য "গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করিয়াছে। সংগ্রাম পরিষদ পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন গণবিক্ষোভ ও আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনে পরিণত করিবার পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিগত ১৭ জানুয়ারী সারা পাকিস্তানে "দাবী দিবস" ঘোষণা করে। এই দিবস পূর্ব পাকিস্তানে তথা সারা পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক অন্দোলন এক নূতন মোড় নেয় এবং সারাদেশ একযোগে বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে।

সংগ্রাম পরিষদ আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সারা পাকিস্তান ব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালনের ডাক দিয়াছে। একই দিনে দেশের উভয় অঞ্চলে হরতাল পালনের উদ্যোগ পাকিস্তানের ইতিহাসে ইহাই প্রথম। আমরা আশা করি, সকল বাধা বিপত্তি ও উস্কানীর মুখেও অসীম সংগ্রাম, ধৈর্য ও শৃঙ্খলাবোধের সহিত জনগণ হরতালকে সর্বোতভাবে কামিয়াব করিবেন।

১৪ ফেব্রুয়ারী হরতালের কর্মসূচী

শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজার, অফিস-আদালত, কল-কারখানা প্রভৃতিতে ও রেল-স্টিমার, মোটরলঞ্চ, বাস-ট্রাক, মোটরগাড়ী, বেবীট্যাক্সি, রিক্সাসহ সকল প্রকার যানবাহন কর্তৃক সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালন।

সর্বত্র জমায়েত, জনসভা ও মিছিল।

মুক্তিকামী ভাইসব,

আপনারা অকাতরে বুকের তাজা খুন ঢালিয়া হাসিমুখে জেল-জুলুম বরণ করিয়া একনায়কত্ববাদী শাসনের ভিত্তিমূল কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। কোন শক্তিই আপনাদের

সুদৃঢ় সংকল্প ও নির্ভিক সংগ্রামী স্পৃহাকে দমন করিতে পারিবে না। বিগত ২১ মে হইতে ২৪ জানুয়ারী ঢাকা শহরে শহীদ আসাদুজ্জামানের হত্যার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত গণজমায়েত ও ঐতিহাসিক মিছিল তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পুলিশ ও ই পি আর কর্তৃক একাধিকবার গুলি বর্ষণ সত্বেও ১৪৪ ধারার বাধানিষেধ তুচ্ছ করিয়া ঢাকা শহরে লক্ষ জনতা শোভাযাত্রা বাহির করে। গোটা জাতিকে এই চারি দিনের ইতিহাস অফুরন্ত প্রেরণা যোগাইবে। ঢাকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সারা প্রদেশে ও পশ্চিম পাকিস্তানেও গণআন্দোলনের নূতন জোয়ার শুরু হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি আগামীতে এই গণআন্দোলন আরো জোরদার হইয়া উঠিবে।

কাজেই দেশবাসীর প্রতি আমাদের আরজ

আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারী তারিখের হরতালকে সর্ব প্রকারে সফল করিয়া তুলুন। জাতির স্বার্থ—গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্য সবার উপরে। ব্যক্তিগত, দলগত ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তাকে আমল দিবেন না। একথা মনে রাখিবেন—এই হরতালের সফলতার উপরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনেক কিছুই নির্ভর করে। এই দিনের জমায়েত ও মিছিলে লাখে লাখে যোগদান করুন। এবং সংগ্রাম পরিষদের গৃহীত নীচের আটটি দাবীর ভিত্তিতে আওয়াজ তুলুন :

১, ফেডারেল পার্লামেণ্টারী সরকার কায়েম

২, সার্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন

৩, অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার

৪, নাগরিক অধিকার পুনরুদ্ধার। সকল কালা কানুন—বিশেষতঃ বিনাবিচারে আটক আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল

৫, শেখ মুজিবর রহমান, খান আব্দুল ওয়ালী খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো-সহ সকল রাজবন্দী, আটক ছাত্র-শ্রমিক ও সাংবাদিকের মুক্তিদান। আদালত ও ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন সকল রাজনৈতিক মামলা ও সকল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার

৬, ১৪৪ ধারা বলে জারীকৃত সকল বিধিনিষেধ প্রত্যাহার

৭, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী, ধর্মঘটের অধিকার কায়েম, কৃষকের বর্ধিত ট্যাক্স খাজনা ও সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল

৮, সংবাদপত্রের উপর আরোপিত সকল বিধিনিষেধ প্রত্যাহার; ইত্তেফাক, চাটান-এর ডিক্লারেশন পুনঃপ্রদান ও প্রগ্রেসিভ পেপার্স লিমিটেডকে উহার সাবেক মালিকের নিকট প্রত্যার্পন।

উপরি উল্লিখিত দাবীগুলি আদায়ের জন্য আন্দোলনই হইতেছে একমাত্র পথ। সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলনের ডাক দিয়াছে। সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ

আন্দোলনে শরীক হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। এবং এই সকল দাবী হাসিল না হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরের ইলেকশন বয়কট করিয়া বিরামহীনভাবে আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে। হরতাল ও সভা শোভাযাত্রার মূল আওয়াজের সহিত ইলেকশনের নামে প্রবঞ্চনাকে প্রতিরোধ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। যে স্থানে আইন পরিষদ ও প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে জনগণের ভোটের অধিকার নাই সেই ইলেকশন জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রেরই নামান্তর। পরোক্ষ পদ্ধতির ধোকাবাজী ইলেকশন বাতিল ও বরবাদ করিয়া সার্বজনীন ভোটাধিকার ও সরাসরি নির্বাচনের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে কামিয়াব করুন। ইনশাআল্লাহ্ সত্যের জয় ও অসত্যের পরাজয় অবধারিত।

(বিঃ দ্রঃ---ইলেকট্রিসিটি, পানি সরবরাহ, ডাক্তারী দোকান, ডাক্তার ও সাংবাদিকদের গাড়ী হরতালের আওতা হইতে বাদ থাকিবে)।

স্বাক্ষর ঃ

সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
মোজাফফর আহমদ
সভাপতি, পূর্ব-পকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ
সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (পি, ডি, এম)
সৈয়দ মোসলেহুদ্দীন
সভাপতি, পূর্ব পাক নেজামে ইসলাম পার্টি
মোহসেন উদ্দিন আহমদ
সভাপতি, পূঃ পাক জমিয়াতে ওলামায়ে ইসলাম
সৈয়দ খাজা খয়েরুদ্দীন
সভাপতি, পূর্ব-পাকিস্তান মোছলেম লীগ
আবু হোসাইন সরকার
সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট
মুহম্মদ আবদুর রহীম
আমীর, জামায়াতে ইসলামী, পূর্ব পাকিস্তান।

প্রকাশনার ঠিকানা : ১ নং মগবাজার, ঢাকা
যোগাযোগের ঠিকানা : ১৫ নং পুরানা পল্টন, ঢাকা
অন্তরীপ মুদ্রনালয়, ২৫৫ জগন্নাথ সাহা রোড, ঢাকা হইতে মুদ্রিত।

গণ-সংগ্রাম ক্ষান্ত হইবে না

সংগ্রামী ছাত্র সমাজের রক্ত শপথ

পূর্ব বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান ঘটিতে শুরু করিয়াছে। স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠি নির্মম গুলীবর্ষণের মাধ্যমে ব্যাপক ছাত্র ও জনসাধারণকে হত্যা করিয়া এবং সর্বপরি 'কারফিউ' জারী করিয়াও এই গণঅভ্যুত্থানকে স্তব্ধ করিতে পারিতেছে না। শাসক গোষ্ঠির শত গুলীবর্ষণও এই অভ্যুত্থানকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। জালেম শাহীকে অবিলম্বে উচ্ছেদ করিয়া গণতান্ত্রিক রাজত্ব কায়েম ও পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদকে ধ্বংস করিতে না পারিলে এবং ছাত্র শ্রমিক কৃষক, চাকুরী-জীবী, মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী, ছোট-মাঝারী শিল্পপতিদের বিভিন্ন মুখী সমস্যার সমাধান তথা ছাত্র সমাজের ১১-দফা দাবী আদায়ের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থান ক্ষান্ত হইবে না। যে সংগ্রাম আজ শুরু হইয়াছে তাহা শেষ না করিয়া তাহার বিরাম নাই। ছাত্র সমাজের পক্ষ হইতে আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, এই সংগ্রামের শেষ না করিয়া আমরা থামিব না এবং অতি শীঘ্র আমরা সংগ্রামের পরবর্তী বৃহত্তর কর্মসূচী দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত করিব। তাই ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর নিকট সেই বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচীগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য আহ্বান জানাইতেছি :

১. প্রদেশের সকল জেলায়, মহকুমায়, থানায়, প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, মহল্লায় এবং শ্রমিক অঞ্চলে সর্বদলীয় ছাত্র সমাজের উদ্যোগে সংগ্রাম কমিটি গড়িয়া তুলুন। এই সকল কমিটি হইতে আন্দোলনকে সুশৃঙ্খল ও সংগঠিত ভাবে পরিচালনা করুন। স্থানীয় কমিটিগুলি উপরের সহিত যোগাযোগ করুন
২. আন্দোলনের কর্মপন্থা ঘোষণার জন্য এই সকল কমিটি হইতে প্রচারপত্র, প্রাচীর-পত্র, পথসভা, মাইক ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করুন
৩. সকল জনগণকে সংগঠিত করুন
৪. গ্রাম অঞ্চলে গণ অভ্যুত্থানকে ছড়াইয়া দিন
৫. সর্বত্র হাজার হাজার সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করুন
৬. সংগ্রামকে সফল করার জন্য ছাত্র শ্রমিক স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আগাইয়া আসুন
৭. সকল সময় শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। সকল প্রকার সরকারী উস্কানীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন
৮. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করুন
৯. সকল সময় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশাবলী বিনা প্রশ্নে মানিয়া চলুন।

দেশবাসীর নিকট আমাদের আহবান

১. গুলীবর্ষণ বেয়নেট চার্জ ও লাঠির আঘাতে আহতদের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে রক্ত দান করুন। সান্ধ্য আইনের বিরতির মাঝে সম্ভবমত রক্ত দান করুন।

সাম্প্রতিক আন্দোলনে নিহত ও আহতদের পরিবার পরিজনকে সাহায্যার্থে এগিয়ে আসুন। এবং নিম্ন ঠিকানায় সম্ভবমত অর্থ প্রেরণ করুন। তোফায়েল আহমেদ, ৩১৩, ইকবাল হল, ঢাকা

২. রিক্সাচালক, ক্ষুদে মজুর এবং দরিদ্র জনসাধারণকে বেশী করিয়া ভাড়া ও মজুরী দিন ও যথাসাধ্য সাহায্য করুন। রিক্সা মালিকদের নিকট আমাদের আবেদন তাঁরা যেন পুরোদিনের ভাড়া গ্রহণ না করেন

৩. দোকানাদার ও ব্যবসায়ী ভাইয়েরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ না করিয়া ন্যায্য মূল্য গ্রহণ করুন

৪. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে অগ্রসর করুন। যে-কোন প্রকার সরকারী উস্কানীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করুন

১. আবদুর রউফ, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ
২. সাইফুদ্দিন আহমদ, সভাপতি, ছাত্র ইউনিয়ন
৩. মোস্তাফা জামাল হায়দার, সভাপতি, ছাত্র ইউনিয়ন
৪. খালেদ মোহাম্মদ আলী, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাক ছাত্রলীগ
৫. মাহবুবুল হক দোলন, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন
৬. ইব্রাহিম খলিল, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন
৭. সামসুদ্দোহা, সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র ইউনিয়ন
৮. মাহবুবউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র ইউনিয়ন
৯. তোফায়েল আহমেদ, সহ-সভাপতি, ডাকসু
১০. নাজিম কামরান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু

তারিখ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

'আইয়ুবের পত্র'

(রাওয়ালপিণ্ডি, ২৫শে মার্চ: গতকল্য (২৪শে মার্চ) প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান প্রধান সেনাপতি জেনারেল এ,এম, ইয়াহিয়া খানের নিকট নিম্নোক্ত পত্র লিখেন:)

প্রেসিডেন্ট হাউস
২৪শে মার্চ, ১৯৬৯

প্রিয় জেনারেল ইয়াহিয়া,

অতীব দুঃখের সহিত আমাকে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইয়াছে যে, দেশের সমুদয় বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা ও নিয়মতান্ত্রিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান উদ্বেগজনক মাত্রায় অবস্থার যদি অবনতি ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনধারা তথা সভ্য জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

এমতাবস্থায়, ক্ষমতার আসন হইতে নামিয়া যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর দেখিতেছি না।

তাই আমি পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর হস্তে দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব ন্যস্ত করিয়া যাওয়ার সব্যস্ত করিয়াছি; কেননা সামরিক বাহিনীই দেশের আজিকার একমাত্র কর্মক্ষম ও আইনানুগ যন্ত্র।*

---

* দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ মার্চ, ১৯৬৯

যে কথা এতোদিন বলিনি

(পূর্ব বাংলার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের কথা)

যে কথা এতদিন বলিনি, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে সে কথা এসে পড়লো, কারণ, আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত, অতীতের ভুল-ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, নইলে ভবিষ্যতেও দেশে স্বচ্ছ রাজনীতি আশা করা যাবে না। আত্মপক্ষ সমর্থন বা নতুন করে কোন বিতর্ক সৃষ্টির জন্য এ প্রসঙ্গ উত্থাপন আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবলমাত্র বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণে যেটুকু প্রয়োজন, আমি ততটুকুই অতীত প্রসঙ্গ এখানে টানছি। দীর্ঘকাল পরে জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন প্রয়োজন নেই। আমি দৃঢ়ভাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনেও আমি আমার এই বিশ্বাসের প্রমাণ দিয়েছি এবং দেশবাসীর রায় অবনত মস্তকে স্বীকার করে নিয়েছি।

বলা হয়ে থাকে ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের কার্যকলাপের ফলেই স্বাধীনতালাভের পর দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকরী হতে পারেনি। একথা সর্বাংশে সত্য নয়। রাজনীতিকদের অনভিজ্ঞতা ও ভুল-ভ্রান্তি তো ছিল; কিন্তু একে ধীরে ধীরে নিপুণভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগিয়েছিল বৃটিশ আমলের সুসংগঠিত আমলাতন্ত্রের কিছু উচ্চাভিলাষী লোক। কায়েদে আজম ও লিয়াকত আলীর ইন্তেকালের পর কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় এদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ফলে জনসাধারণের---বিশেষ করে কেন্দ্র থেকে বহু দূরে অবস্থিত পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দাওয়া উপেক্ষিত হতে শুরু করে। এ সময় দেশের প্রস্তাবিত খসড়া শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার রক্ষা এবং দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমাকে যে তীব্র প্রতিকূল অবস্থার মুখে কি লড়াই করতে হয়েছে, জাতীয় শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে আমি তা কখনো বাইরে প্রকাশ করিনি। এ নিয়ে জনাব জেড, এ, সুলেরী সম্পাদিত 'টাইমস অব করাচী' কাগজটি যারা পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন, আমাকে সুলেরী সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী দাওয়া পেশ করার জন্য কিভাবে গালমন্দ করেছেন---এমন কি 'প্রাদেশিকতাবাদী' বলে পর্যন্ত আখ্যা দিয়েছেন। জনাব হামিদুল হক চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ সচিব ছিলেন। কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিবাদ শুরু হয়। পরে তাঁকে যখন নানা অভিযোগ তুলে মন্ত্রিসভা থেকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়, এমন কি তাঁকে যখন প্রোডা বলে অভিযুক্ত করা হয়,

তখনও আমাকে কিছু জানানো হয়নি, এমন কি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমার সঙ্গে আলোচনা করাও প্রয়োজন মনে করা হয়নি।

একুশে ফেব্রুয়ারীর নেপথ্য কাহিনী

একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখের মর্মান্তিক ঘটনাবলীর স্মৃতি আমার মন থেকে মুছে যায়নি এবং তা যেতে পারে না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে আমি কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছি বা বাংলার বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেছি একথা কেহ যদি প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে জনসমক্ষে প্রকাশ্যে নিন্দিত হতে আমি রাজি আছি।

আমি ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, ২১শে ফেব্রুয়ারীর পর সর্বপ্রথম যেদিন পরিষদের সভা হয় (অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারী) সেই সভায় আমি পরিষদের নেতা হিসাবে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য তৎকালীন গণপরিষদকে অনুরোধ জানিয়ে এক প্রস্তাব পেশ করি এবং তা পরিষদে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পল্টনের জনসভায় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে, একথা ঘোষণার আগে তাঁর প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু জানানো বা তার সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করেননি। সম্ভবতঃ এটাও ছিল আমলাতন্ত্রের একটা চাল। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে খাজা সাহেব যে সে সভায় কিছু বলবেন, আমি তা আদৌ জানতাম না। মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর পাশেই আমি উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি যখন তাঁর ভাষণে বলে ফেললেন, উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে তখন আমার বুঝতে দেরী হয়নি যে দেশে আগুন জ্বালানো হল। ব্যক্তিগতভাবে আমি খাজা সাহেবকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিনি। কারণ, দলীয় শৃঙ্খলার প্রশ্ন ছিল। খাজা সাহেবের সঙ্গে বা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় আমি পদত্যাগ করতে পারতাম। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর-কালে সেই প্রাথমিক শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের প্রশ্নে আমাকে তা থেকেও নিবৃত্ত করা হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে গুলিবর্ষণের সময় আমি পরিষদে ছিলাম। দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আমি সব কথা জানতে পারি। গুলি চালনা সম্পর্কে আমি কিছু অবহিত ছিলাম না। কারণ, এটা ছিল শহরের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমার আগে কিছু করণীয় ছিল না। ঘটনাস্থলে তদানীন্তন ডি, আই, জি, পুলিশ সুপার ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরাই বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

আমি যখন পরিস্থিতি অবগত হই, তখন তা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে যত ব্যাথা-বেদনাই অনুভব করি না কেন, তখন আইন ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে আমাকে এক নৈব্যক্তিক প্রশাসক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। পল্টনের মাঠে যে আগুন জ্বালানো হয়েছিল এবং তার সুযোগ নিয়ে যাঁরা এই ঘটনাটিকে একটি মর্মান্তিক পরিণতিতে রূপান্তরিত করেছেন বলে অভিযোগ করা যায় ব্যক্তিগতভাবে তাদের কারো নাম আমি উল্লেখ করতে চাইনা।

রাজনীতির ছাত্র মাত্রেই জানেন, ঘটনার অন্তরালেও ঘটনা থাকে---যা একজন দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ইচ্ছে করলেই ব্যক্ত করতে পারেন না। একুশে ফেব্রুয়ারীর গুলীবর্ষণ সম্পর্কে তদন্তের জন্য পরবর্তীকালে এলিস কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল। ঢাকা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি জনাব শাহাবুদ্দিনকে আমি অনুরোধ জানালে, তিনি কমিশনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য জাষ্টিস এলিসকে নির্বাচিত করেন।

লিয়াকত হত্যাকাণ্ড

দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খানের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমাকে বহুবার প্রশ্ন করা হয়েছে, এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমার ধারণা কি? সত্য কথা বলতে কি, এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। দেশে সাধারণভাবে এমন একটা ধারণা প্রচলিত রয়েছে, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। এ সম্পর্কে আমার কোন মতামত দেয়ার অবকাশ নেই। তবে একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, লিয়াকত হত্যাকাণ্ডের পরপরই দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে দুর্যোগের ঘনঘটার শুরু।

৩৫টি উপনির্বাচন প্রসঙ্গে

বলা হয়ে থাকে, ক্ষমতায় থাকাকালে ৩৫টি উপ-নির্বাচন আমি ঠেকিয়ে রেখেছি। সত্য কথা বলতে কি, এই ৩৫টি কেন্দ্রের বহু কেন্দ্র ছিল সংখ্যালঘুদের আসন। সে সময়ে কয়েকজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য পূর্ব পাকিস্তান হ'তে কলিকাতা চলে যান। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ সম্পর্কে সঠিক সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বই উপনির্বাচন স্থগিত রাখার প্রধান কারণ। কয়েকটি আসন নির্বাচনের অল্পদিন পূর্বে শূণ্য হয়। সুতরাং সেগুলিতে উপনির্বাচন না করা সমীচিন বিবেচনা করা হয়েছিল। টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে 'মুসলিম লীগ' প্রার্থীর পরাজয়ের পর দলের প্রভাবশালী কোন কোন নেতা তখন 'মুসলিম লীগ' এই মুহূর্তে নির্বাচন

অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হতে পারেনি, এই কথা বলে নির্বাচন বিলম্বিত করার জন্য চাপও সৃষ্টি করেন।

পরবর্তীকালে দেখা গেছে, তাঁরাই দলত্যাগ করে বিরোধী দলের নেতা সেজে আমাকে এই উপনির্বাচন অনুষ্ঠান না করার জন্য দোষারোপ করেছেন। আমি দলীয় সরকারেরমুখ্যমন্ত্রী ছিলাম এবং এ ব্যাপারে আমার দায়িত্ব এড়াতে চাইনা বলেই ১৯৫৪ সালে জনমতের বিচারকে আমি সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে দ্বিধা করিনি।

নাজিমুদ্দিনের পদচ্যুতি

একথা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই যে, ১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে খাজা নাজিমুদ্দিনের পদচ্যুতির ফলেই দেশে প্রকৃত প্রস্তাবে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা সূচিত হয়। এই পদচ্যুতিকে মেনে নিয়ে যে ভুল করা হয়েছে, আমরা এখনো তার প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছি। ১৯৫৩ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখে খাজা সাহেবকে বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ বরখাস্ত করেন। আমি তখন এক সরকারী সফরে ময়মনসিংহ ছিলাম। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি চলে আসি এবং ২০শে এপ্রিল করাচী গিয়ে উপস্থিত হই। বিমান বন্দরে বড়লাটের মিলিটারী সেক্রে-টারী এবং বগুড়ার জনাব মোহাম্মদ আলীর পক্ষ থেকে একজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাকে গভর্ণর জেনারেল ভবনে গমনের অনুরোধ জানান। আমি তাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে করাচীর সেণ্ট্রাল হোটেলে গমন করি। মাগরেবের নামাজের পর আমি খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে গমন করি। তিনি তখনো প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে ছিলেন। আমি তাঁকে সমর্থন করতে এমন কি প্রয়োজন হলে পদত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি বলে জানাই। কিন্তু খাজা সাহেব আমার প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তিনি বললেন---এ সময় গণ্ডগোল করতে গেলে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করবে।

সুতরাং আমাদের চুপ থাকাই ভালো। একথা বলেই তিনি ক্ষান্ত থাকলেন না। দেশে আভ্যন্তরীণ কোন গোলযোগ যাতে সৃষ্টি না হয়, তজ্জন্য সকলকে উপদেশ দিয়ে তিনি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করলেন। পরদিন একুশ তারিখ তিনি আমার হোটেল-কক্ষে গেলেন। সঙ্গে ছিলেন খাজা খয়েরদ্দিন। আমি তাঁকে পুনরায় বড়লাটের অনিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনে না নেয়ার অনুরোধ জানাই। খাজা সাহেব মিলিটারী টেক ওভারের সম্ভাবনার কথা তুলে আমাকে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে বললেন। আমার মনে হল, খাজা সাহেবকে আর পীড়াপীড়ি

করা বৃথা। তিনি এ ব্যাপারে কোন ভূমিকা গ্রহণে রাজী না হলে বড়লাটের আদেশের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা অবান্তর হয়ে দাঁড়াবে।

এরপর আমি খাজা সাহেবের ঘোষিত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য থাকতে অসম্মত হই। একে তো দলের সভাপতি নিযুক্ত হওয়ার সাত-আট মাস পর তিনি এই ওয়াকিং কমিটির নাম ঘোষণা করেন---তদুপরি তিনি তখন বরখাস্তও হয়েছেন। তিনি যখন বড়লাটের অনিয়মতান্ত্রিক আদেশের বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণে রাজী নন, তখন তাঁর নেতৃত্বে ওয়াকিং কমিটির নাম ঘোষণা ও তাতে সদস্য হিসাবে থাকা আমার কাছে অবান্তর মনে হয়েছিল।

আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন

দেশের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ছাড়া বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসনও ফলপ্রসূভাবে কার্যকরী করা সম্ভব বলে আমি মনে করি না।

দেশের ছাত্র-সমাজ যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাদের মধ্যে এখন প্রয়োজন এমন নেতার যারা তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারেন। দেশে গণ-তান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য এখন আরো বেশী দরকার। অতীতে আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও বাইরের চাপে যুক্তফ্রণ্টের ভাঙ্গন ও ব্যর্থতা থেকে রাজনৈতিক দলগুলোরও চোখ খুলে যাওয়া উচিত। রাজনীতিতে ডান ও বামের প্রকৃত সংজ্ঞা কি আমি জানিনা। বামপন্থার প্রকৃত অর্থ যদি হয় প্রগতিশীল রাজনীতি, তাহলে আমিও নিঃসন্দেহে একজন বামপন্থী। কারণ, আমার আদর্শ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি।

প্রকাশক, ফজলুর রহমান খাঁ, আঞ্চলিক পি, ডি, পি অফিস,
৭, জিন্না এভিনিউ ডিয়েনফা বিল্ডিং (দোতলা), ঢাকা--২, মূল্য, ২৫ পয়সা মাত্র

গণঅভ্যুত্থানকে বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামে এগিয়ে নিতে হবে

(পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া'র) মূল্যায়ন)

শত শত শহীদ ভাইদের রক্ত রঞ্জিত ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান (১৭ই হতে ২৪শে জানুয়ারী) পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই গণঅভ্যুত্থান পাকিস্তানের রাজনীতির পট বদলে দিয়েছে। একনায়কতাবাদ আইয়ুব স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়েছে এই গণ-অভ্যুত্থান। প্রকৃতপক্ষে আইয়ুব স্বৈরাচার ও একনায়কত্ববাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও জাতিসমূহের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানে দীর্ঘকালব্যাপী যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলে আসছিল---এই অভ্যুত্থান ছিল তারই চরম রূপ।... তাই বলা চলে, ১৯৬৯ সালের জানুয়ারীর গণঅভ্যুত্থান পাকিস্তানের সবচাইতে বড় ও অনন্য সাধারণ ঘটনা।...

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পূর্ব বাংলার গণ-অভ্যুত্থান গড়ে উঠেছিল মূলত: আইয়ুব স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এগার দফার মত একটি বামপন্থী ইতিবাচক কর্মসূচীর ভিত্তিতে। এই এগার দফা কর্মসূচীর প্রবক্তা হলাম আমরা---পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ। আর পূর্ব বাংলার গণ-অভ্যুত্থানের প্রকৃত নেতৃত্বও ছিল আমাদের হাতে। তাই আজ যখন এগার দফার সংগ্রামের বিজয় অভিযান অব্যাহত রয়েছে তখন আমাদের সংগ্রামী ছাত্র সমাজকে এখনকার পটভূমিতে তাদের করনীয় কর্তব্য বুঝে নেওয়া দরকার।...

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও এগার দফা কর্মসূচী

একথা নিশ্চয় জানা আছে যে আমাদের সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন হল ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচীর প্রকৃত প্রবক্তা। আওয়ামী লীগের সমর্থক ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবী প্রথম থেকে সমর্থন করে আসছিলেন এবং তাঁরা ঐ ছয় দফাকে বাঙালী জাতির মুক্তি সনদ হিসেবে প্রচার করছিলেন।

উপরন্ত, ছাত্রলীগ আইয়ুব স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঐক্য কায়েমের বিরোধিতা করে আসছিলেন। আর মেননপন্থী উপদলীয় ছাত্র ইউনিয়নের বন্ধুরা আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে সি,আই,-এর ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেন এবং আগাগোড়া ঐক্য কায়েমের বিরোধিতা করেন। আমাদের সংগঠন প্রথম থেকেই ৬ দফাকে পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের একটি ন্যায্য দাবী হিসেবে সমর্থন করে

এসেছে। কিন্তু আমাদের সংগঠন একথাই বলেছে যে কেবল স্বায়ত্তশাসন অর্জ্জন করলেই ছাত্র জনতার জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি আসবে না—সমগ্র জনগণের প্রকৃত মুক্তির পথ হল দেশে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাষন অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির শোষন উচ্ছেদ। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের সংগঠন অনেক বৎসর হতেই বিচ্ছিন্নভাবে প্রচার করে আসছে যে শিক্ষা জীবনের আশু সমস্যাগুলির সমাধান ও শিক্ষানীতির মৌলিক পরিবর্তন, শ্রমিক কৃষক-মধ্যবিত্ত প্রভৃতি জনগণের দৈনন্দিন জীবনের আশু সমস্যাসমূহের সমাধান, পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম, পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল করত: পাঠান, বেলুচ, সিন্ধী, পাঞ্জাবী জাতির স্বায়ত্তশাসন প্রদান, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি কায়েম ও সিয়াটো-সেণ্টো প্রভৃতি যুদ্ধ জোট বর্জ্জন, ব্যাঙ্ক-বীমা ও পাট প্রভৃতি প্রধান শিল্পের জাতীয়করণ তথা একচেটিয়া পুঁজির উচ্ছেদ, ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রভৃতি। এছাড়া নিরাপত্তা আইন, দেশরক্ষা আইন প্রভৃতি বাতিল করত: সকল রাজবন্দীর মুক্তি, দমননীতি বন্ধকরন ও পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা কায়েম প্রভৃতি। আমরা সব সময়ই বলে আসছিলাম যে, আইয়ুব স্বৈরাচারকে উচ্ছেদ করতে হলে এ রকম একটা সুস্পষ্ট বিকল্প ইতিবাচক কর্মসূচী অবশ্যই সামনে রাখতে হবে। ৬ দফা কর্মসূচী সে দিক থেকে ছিল অসম্পূর্ণ।

...অভিজ্ঞতা হতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করেছিলাম যে বিরোধী শক্তিগুলির ঐক্য কায়েম হলে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার হয়ে উঠে। তাই ঐক্য গঠন সম্পর্কে আমাদের নীতি ছিল এই যে, সারা পাকিস্তানব্যাপী সকল বিরোধী-দলের ব্যাপকতম ঐক্যজোট নূন্যতম কর্মসূচীতে গঠন করা, আর পূর্ব বাংলায় গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিসমূহের নিজস্ব গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐকজোট গঠন করা। ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের এই নীতির জয় হয়েছে। আমাদের অনুসৃত নীতির ভিত্তিতেই সংকীর্ণ ৬ দফা কর্মসূচীর উর্দ্ধে এগার দফা কর্মসূচী হয়েছে, পূর্ব বাংলায় দুইটি প্রধান ছাত্র প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং মেননপন্থী ও এন, এস এফের একটি অংশও ১১ দফার ভিত্তিতে ঐক্যজোটে এসেছিলেন। অপর দিকে নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিক "গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ" ৮ দফার একটি ন্যূনতম কর্মসূচীতে গঠিত হয়েছিল। আর এই দুইটি ঐক্যজোট (ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ডাক) ও দুইটি কর্মসূচীর (১১ দফা ও ৮ দফা) ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় তথা সারা পাকিস্তানে সংঘটিত হয় আইয়ুব একনায়কত্বের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান।

গণ-অভ্যুত্থান শুরুর পরই পূর্ব বাংলার এই সংগ্রাম দ্রুত এক স্তর পার হয়ে অন্য স্তরে চলে যায়। প্রকৃতপক্ষে 'ডাকের' কর্মসূচীর ভিত্তিতে সারা পাকিস্তান ব্যাপি স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলন শুরু হলেই পূর্ব বাংলায় এগার দফার ভিত্তিতে গণসংগ্রাম আন্দোলনের প্রধান ধারা হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়। গণসংগ্রামের পূর্ণ নেতৃত্ব এসে পড়ে আমাদের হাতে---অর্থাৎ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের হাতে।

গণ-অভ্যুত্থানের কয়েকটি দুর্বলতার দিক

এ সময় পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহ যথা আওয়ামী লীগ ও দুইটি ন্যাপ যদি এগার দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের সংগ্রাম এসে দাঁড়াতেন তবে পূর্ব বাংলার গণ-অভ্যুত্থান আরও বেশী সংগঠিত ও তীব্রতর রূপ লাভ করতে পারত ---এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠভাবে সমালোচনা করতে হলে একথা বলতেই হয় যে, আওয়ামী লীগ তখন এগার দফার ভিত্তিতে ঐক্যজোট গঠনের বিরোধিতা করেন এবং কেবলমাত্র 'ডাকে' থাকাই শ্রেয় মনে করেন। অপরদিকে মওলানা ভাসানী ক্ষতিকর ও হঠকারী নীতি অনুসরণ করেন। ওয়ালী-মোজাফফর ন্যাপ ১১ দফার ঐক্যফ্রণ্টে আসতে রাজী হলেও অন্য দুইটি দল না আসায় ১১ দফার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলির কোন ঐক্যজোট গঠিত হতে পারে নাই। ফলে গণ-সংগ্রামের নেতৃত্ব থেকে যায় আমাদের হাতেই।

শ্রমিক ভাইরা আমাদের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং লড়াইয়ে নেমে আসেন। কিন্তু এটা ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাদের মধ্যেও সে সময় কোন সংগঠিত সচেতন নেতৃত্ব ছিল না। তাই এক পর্যায়ে শ্রমিক ভাইরা অর্থনৈতিক আন্দোলনের পথে চলে যান, রাজনৈতিক কর্তব্য কি করতে হবে তা বুঝতে পারেন নাই। কৃষক ভাইরাও সংগ্রামে নেমে আসেন। কিন্তু সংগঠন শক্তির অভাব ও চেতনার পশ্চাদপদতা থাকায় তারাও নানারূপ অরাজকতাপূর্ণ কাজকর্মে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। উগ্রবামপন্থীদের হটকারী শ্লোগান শ্রমিক কৃষকদের ঐ সব কাজে প্ররোচিত করছিল। আমাদের পক্ষে অর্থাৎ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে পরিস্থিতিকে আয়ত্তে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ মূলগতভাবে এই বিপুল গণ-অভ্যুত্থান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত প্রকৃতির। এগুলি ছিল দুর্বলতার দিক।

আইয়ুবের পতন মানেই মূল শত্রুদের উচ্ছেদ নয়

এসব দুর্বলতা সত্ত্বেও গণ-অভ্যুত্থানের ফলে যা পাওয়া গিয়াছে---তার মূল্য কম নয়। একনায়কত্বকে উচ্ছেদ কখনই একটি সামান্য বিজয় হিসাবে মনে করা চলে

না। সত্যকথা বলতে দ্বিধা করা ঠিক হবে না---গণসংগ্রামের গোড়াতে একথা কেউ ভাবতে পারে নাই যে এই অভ্যুত্থানেই লৌহমানব আইয়ুব খানের পতন হবে। অথচ সেটা সম্ভব হয়েছে।

...কিন্তু এক্ষনে ঠিক এই মুহূর্তে দ্বন্দ্বটা চলছে বড় তথা একচেটিয়া পুঁজির সংগে ছোট তথা বাঙ্গালী পুঁজির দ্বন্দ্ব। এক্ষেত্রে যদি ধরা যায় যে বাঙালী ধনিকদের ৬ দফা কর্মসূচী শাসনতন্ত্রের রূপ পায় তাহলে বাংলাদেশে অবাঙ্গালী একচেটিয়া পুঁজির শোষণের ক্ষেত্র কিছুটা সংকুচিত হলেও সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির শোষণ সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ হবে কিনা? বলার অপেক্ষা রাখে না যে তা হবে না। অবশ্য এগার দফা কর্মসূচী নিয়ে যদি বাঙ্গালী বুর্জোয়ারা সরকার গঠন করে সারা পাকিস্তান কার্যকরী করতে শুরু করে---তবে বড় ধনিকদের সঙ্গে ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেও তাদের সংঘাত আরও বৃদ্ধি পাবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নির্বাচনের পরে বড় বুর্জোয়ার সঙ্গে বিরোধে সুবিধা লাভের আশায় বাঙ্গালী ধনিকেরা বিভিন্নভাবে 'স্বাধীন বাংলার' শ্লোগানও হুমকি হিসাবে সামনে রেখেছেন। এটা ঠিক যে বাঙালী তথা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগুলি ২৩ বছরে যেভাবে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়েছে---তাতে জাতি সমস্যার সমাধান হোক এটা সকলেরই আশা ও কামনা। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কোন জাতি যদি সংগত কারণে মনে করে যে তার বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার কায়েম করা দরকার সেটা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে।

এগার দফা কর্মসূচীর মূল্যায়ন

এই লক্ষ্য হতে বিচার করলে দেখা যাবে ঐতিহাসিক এগার দফা কর্মসূচীও ঐ লক্ষ্য অর্জ্জনের পরিপূর্ণ কর্মসূচী নয়। একটি উদাহরণ দিলেই কথাটা পরিস্কার বুঝা যাবে। এগার দফা কর্মসূচীতে সিয়াটো সেণ্টো ত্যাগ ও স্বাধীন নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির দাবী আছে। কিন্তু সিয়াটো সেন্টো ত্যাগ ও স্বাধীন নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি কায়েম করলেই সাম্রাজ্যবাদের নয়া উপনিবেশিক শোষণ উচ্ছেদ হয়ে যায় না। সামন্তবাদের উচ্ছেদের জন্য ভূমি ব্যবস্থার বিপ্লবী সংস্কার, জমির সিলিং নির্ধারণ ও ভূমিহীন গরীব চাষীদের মধ্যে জমি বণ্টনের দাবী এগার দফায় নাই। তাই এগার দফা কর্মসূচীকে বিপ্লবী মুক্তি সনদ বলে মনে করার কোন কারণ নাই। কিন্তু এগার দফা কর্মসূচীর অপরিসীম মূল্য সেখানেই রয়েছে যে যখন আমরা দেখি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি আইয়ুব স্বৈরা-চারকে উচ্ছেদ করে কেবলমাত্র ভোটাধিকার ও কতিপয় সাধারণ গণতান্ত্রিক

অধিকার অর্জনের কর্মসূচীকে বিকল্প হিসাবে সামনে আনে। কাজেই স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামে পূর্ব বাংলার ধনিক সহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি আশু গণতান্ত্রিক কর্মসূচী হিসাবে এগার দফার অপরিসীম মূল্য ছিল এবং এই সময় পর্যন্ত আছে। বিশেষতঃ এগার দফা কর্মসূচী বিপ্লবের কর্মসূচীর বিরোধী তো নয়ই বরং সে লক্ষ্যেই রচিত। তাই এগার দফা কর্মসূচী হল মূল বিপ্লবী কর্মসূচীর ভিত্তিতে গণসংগ্রাম গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত কর্মসূচী। এটা শেষ লক্ষ্য নয়। কিন্তু এগার দফাকে শেষ লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করলে মুক্তি বিপ্লবের লক্ষ্য হতে বিচ্যুতি ঘটবে।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রচারের প্রথম দিকে এগার দফা কর্মসূচী পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত এগার দফা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এগার দফায় সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ খর্বকারী যতটুকু কর্মসূচী আছে---তাতে এগার দফা কার্যকরী করা খুব সহজ নয়। দেশে আবার তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে ১১ দফা কার্যকরী করণের প্রশ্নে তাই বিপ্লবী লক্ষ্যের স্বার্থ হতেই বড় ধনিক ও প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের সঙ্গে দরকার মত সহযোগিতা ও ঐক্য কায়েমের নীতি অনুসরণ করা এখনকার একটি কর্তব্য।

কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আওয়ামী লীগ মূলে বাঙালী ধনিকের দল। ধনিক মানেই শোষক এবং সে কারণে সর্বহারা মেহনতী মানুষের বিরুদ্ধে তারা অন্যান্য শোষক শ্রেণীগুলির সঙ্গে আপোষে দ্বিধা করে না এবং সংগ্রামে থাকে দোদুল্যমান। এই কারণেই নির্বাচনী প্রচারে এগার দফা কার্যকরী করণের প্রশ্নে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে আওয়ামী লীগ দোদুল্যমান ছিল। কাজেই দেশের বামপন্থী মহল ও আমাদের সংগঠন এবং সাধারণভাবে ছাত্র সমাজ, শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত যদি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী সংগঠন ও আন্দোলন অব্যাহত না রাখতে পারেন, তবে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে এগার দফা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবেন, এভাবে আশা করা ঠিক নয়। কাজেই আওয়ামী লীগ কতখানি তার প্রতিশ্রুতি পালন করবে, তা নির্ভর করবে বহুলাংশে সমগ্র বামপন্থী মহলের জনজমায়েতের ক্ষমতার উপর, ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার উপর। তাই বামপন্থী মহল অথবা আমাদের সংগঠনের ভূমিকার গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা ও বর্তমান সময়ে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। একথা মনে রেখেই আজ সংগঠনের কাজে আরও বেশী করে আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে।

যদি এটা ধরে নেয়া যায় যে আওয়ামী লীগ এগার দফা কর্মসূচী কার্যকরী করবে, তা হলে আমাদের করণীয় এমন কি আর থাকবে---এ ধরণের প্রশ্ন অনেকেরই মনে আছে। আগেই বলেছি যে এগার দফা কর্মসূচী মুক্তি বিপ্লবের মূল কর্মসূচী নয়। এটা হল স্বৈরাচারী শাসনের পটভূমিতে রচিত বিকল্প গণতান্ত্রিক কর্মসূচী যাকে মুক্তি বিপ্লবী কর্মসূচীর একটি আশু কৌশলগত কর্মসূচী হিসাবেও আখ্যায়িত করা যায়।

কাজেই এগার দফা কর্মসূচী যতই বাস্তবায়িত হতে থাকবে আমাদের মুক্তি বিপ্লবের সংগ্রামকে ততই সংগঠিত করে তুলতে হবে। বাঙালী ধনিকরা উদ্যোগী হয়ে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবে এগিয়ে আসবে এরকম ভাবার কোন কারণ নাই।

গণঅভ্যুত্থানকে এগিয়ে নিতে হবে

আজ এমন সময় এসেছে যখন দেশে একটি গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমাদের অসংখ্য শহীদ ভাইদের রক্তে এই সম্ভাবনার দরজা উন্মুক্ত হয়েছে। তাই আজ আমাদের কর্তব্য শত শত শহীদের রক্ত সিক্ত গণঅভ্যুত্থানের মহান পতাকা দৃঢ়ভাবে উর্ধে তুলে ধরে ১১ দফার গণঅভ্যুত্থানকে মুক্তি বিপ্লবের পথে অগ্রসর করে নেবার সচেতন প্রচেষ্টা শুরু করা।...

আ, ক, ম জাহাঙ্গীর, প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া-লেখক), কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক ৩১/১ হোসেনী দালান, ঢাকা-১ হইতে প্রচারিত ও দি পুপলার প্রেস, ২৪, শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১ হইতে মুদ্রিত। তারিখ, ১৭।১।৭১। মূল্য, পনের পয়সা।

উনসত্তরের আন্দোলন পর্যালোচনা

(ছাত্র ইউনিয়ন মেননপন্থী সমর্থিত পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির পর্যালোচনা)

পূর্ববাংলায় এর আগে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হয়েছে, যেমন :

১. ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

২. ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

৩. ১৯৫৪ সালের নির্বাচন আন্দোলন

৪. ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন

৫. ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন আন্দোলন—সেগুলির সাথে এই আন্দোলন চরিত্রগত ভাবে ভিন্ন। উপরের সব কয়টি আন্দোলনই বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন। এইবার কার আন্দোলন বাহ্যতঃ স্বত:স্ফূর্ত হলেও এইবারে জনসাধারণ প্রথমে নিজেদের, পরে বুর্জোয়াদের সাথে আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছে।

আন্দোলনে ছাত্রদের আবির্ভাব

জানুয়ারীর প্রথম দিকে DAC সমন্বিত বিভিন্ন ধনিক রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেও তারা মূলতঃ গণভোট এবং পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার জন্যই সভা-সমিতি করা, বিবৃতি দেওয়া আর মাওলানা ভাসানী ও তার সমর্থকদের সমালোচনা করা তাদের একমাত্র না হলেও প্রধান কাজ ছিল।

এদের প্রতি যেমন জনসাধারণ তেমন ছাত্রদেরও বিশেষ আস্থা ছিল না। অন্যদিকে ছাত্র ইউনিয়ন ছাড়া মতিয়া গ্রুপসহ সকল ছাত্র প্রতিষ্ঠান সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী না হওয়ায় মাওলানা ভাসানী বিরোধী ছিল।...

...অথচ জনগণ ছিল আন্দোলনধর্মী, তাদের প্রয়োজন ছিল বলিষ্ঠ নেতৃত্বের, তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল আন্দোলনের, সাফল্যের। পূর্ব বাংলার এই রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক পটভূমিকায় যখন শূণ্যতা বিরাজ করছিল তখন ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলি "সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করে মঞ্চে আবির্ভূত হল এবং জনসাধারণ সাগ্রহে তাদের বরণ করে নিল।

ছাত্র নেতার চরিত্র ও আন্দোলনের পরিণাম

এর পর আন্দোলন আরও ব্যাপক, গভীর, সর্বব্যাপী ও গতিবেগ সম্পন্ন হল। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও জনসাধারণের নির্যাতিত অংশের তথা বাঙালী জাতির আইয়ুব মোনায়েমের শাসনের বিরুদ্ধে ধুমায়িত বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। গ্রাম বাংলার আনাচে কানাচেও কৃষকরা ছাত্রদের সমর্থন সহযোগিতাও নেতৃত্বে তাদের শত্রু আমলাতন্ত্র, ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং গ্রাম্য চোর ডাকাতদের পাকরাও ও গণআদালতে বিচার শুরু করল। এ আক্রমণের মুখে পুলিশ, ইউনিয়ন কাউন্সিল

তহশীল ইজারাদার এবং সকল প্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা শক্তি ক্ষমতাহীন, শক্তিহীন প্রয়োগহীন তথা অচল হয়ে গেল। শাসকশ্রেণীর রাষ্ট্রতন্ত্র এরকম নাজেহাল, বিকল ও বিপর্যস্ত বৃটিশ শাসনের দু'শ বছরে এবং পাকিস্তানের ২২ বছরে আর কোন দিন হয়নি। এটা জনগণের এক বিরাট ও অভূতপূর্ব বিজয়।...

...বহুজায়গায় কৃষকরা ছাত্রদের সহযোগিতায় বা সমর্থনের ভরসায় গরুচোরদের হত্যা করেছে, পুড়িয়ে মেরেছে, তাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, চোর ডাকাতদের হাত-পা ভেংগে দিয়েছে, তাদের খুন করেছে। বহু জায়গায়, ছাত্ররা কৃষকদের সহযোগিতায় নায়েব, তহশীলদার, পুলিশ, দারোগা, সার্কেল অফিসারদের বিচার করে গলায় জুতার মালা দিয়ে ঘুরিয়েছে, ঘুষ হিসেব করে ফেরৎ নিয়েছে, জরিমানা করেছে, চেয়ারম্যান মেম্বারদের পদত্যাগ করিয়েছে, বেশ্যা বাড়ী তুলে দিয়েছে, মদ গাজার দোকান ভেংগে দিয়েছে, চোর ডাকাতদের সায়েস্তা করেছে। মোট কথা দেশ জোড়া ২২ বছরের হদিস, অফিসার গ্রাম্য টাউট, বদমায়েস আর বদমাতোব্বরদের শাসনের জায়গায় মাসখানেকের জন্য ছাত্র, কৃষক সমিতি আর শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শেখ মুজিবের মুক্তির পর ও সামরিক শাসনের পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল।

ছাত্র নেতৃত্বের দুর্বলতা ছিল এই যে, তা সামন্তবাদ বিরোধী ছিল না, ছিল মূলত- আমলাতন্ত্র বিরোধী, শাসক শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র বিরোধী, এর মূল তথা অর্থনৈতিক, সামাজিক কারণ এই যে, গ্রামাঞ্চলের ছাত্রদের প্রধান অংশ জোতদার ও ধনী কৃষক শ্রেণী উদ্ভূত এবং আর একাংশ মাঝারি কৃষকদের সন্তান সন্ততি, গরীব ও ভূমি- হীন কৃষকদের সন্তান কেবল ব্যতিক্রম হিসাবেই স্কুলে কলেজে লেখাপড়া করতে পারে। জোতদাররা তো বটেই ধনী এবং মাঝারি কৃষকদেরও একাংশ সামন্ত শোষণের সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়তঃ ছাত্রদের চরিত্র জাতীয় ধনিক চরিত্র। এই কারণে তাদের স্বাভাবিক ও শ্রেণীনেতা আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবর, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি বা মাওলানা ভাসানী না। ছাত্র ইউনিয়নভুক্ত সমাজ সচেতন ছাত্রদেরই কেবল নেতা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি এবং মাওলানা ভাসানী। সমগ্র গ্রামাঞ্চলে এরা এখনও গৌণ ভূমিকায়।

তৃতীয়তঃ উপরোক্ত কারণে ছাত্রদের ব্যাপক অংশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নয়। এই কারণে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী না হলেও আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও তার নেতা শেখ মজিবর তাদের কাছে জাতীয় মুক্তির প্রতীক এবং সাম্রাজ্যবাদ

সামন্তবাদ বিরোধী শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি ও মাওলানা ভাসানী তাদের দৃষ্টিতে জাতীয় মুক্তির প্রতিবন্ধক। শহর অঞ্চলের ছাত্রদের জোতদার ও ধনী-কৃষক ভিত্তি ছাড়াও একাংশ আমলা, মুৎসুদ্দী ধনীক উদ্ভূত হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নন। এই কারণে ছাত্র আন্দোলন বা তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত গণ-আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিল না।

ছাত্র আন্দোলন বা তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন শেষ পর্যন্ত শেখ মজিবর পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ সমর্থক ৬ দফা কামী আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। এই আন্দোলনের পরিণতি হিসাবেই শেখ মজিবর মুক্তি লাভ করেছিল। ছাত্র আন্দোলন বা তাদের নেতৃত্বাধীন আন্দোলন শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে মাওলানা ভাসানীকে সরিয়ে দেয়ার পথ পরিস্কার করেছিল।

এর পরিণতি হিসাবে দেখা যায়—শেখ মজিবরের মুক্তির সাথে সাথেই ছাত্রলীগ কর্তৃক কালো পতাকা নামিয়ে বিজয় দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ। তাদের দৃষ্টিতে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মজিবরের মুক্তিই ছিল এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য।

শেখ মুজিবের মুক্তি ও নেতৃত্বের অর্থনৈতিক সামাজিক তাৎপর্য

...জানুয়ারীর মাঝামাঝি অর্থাৎ আন্দোলন শুরু হবার প্রায় দীর্ঘ দেড়মাস পরে ছাত্রদের সচেতন ও সংগঠিতভাবে আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়া একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। প্রগতিশীল ছাত্র ইউনিয়ন যে কারণ ও উদ্দেশ্যেই সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও ১১ দফা রচনা করুক না কেন অন্যান্য ছাত্র আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণী এবং প্রগতিশীল নেতৃত্বের বিরোধীতা এবং জাত বুর্জোয়া নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও ১১ দফাতে সম্মতি দিয়েছিলেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক বিরাট ও তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ হওয়ার দরুণই গণ আন্দোলন এত ব্যাপক ও সুদূর প্রসারিত এবং আমলাতন্ত্র ও শাসকশ্রেণীর বিরোধী হতে পেরেছিল। শ্রেণী অবস্থান, শ্রেণী সম্পর্ক ও সামাজিক কারণে এবং আমাদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যই আন্দোলন বুর্জোয়া খাতে এবং বুর্জোয়া নেতৃত্বে চলে যেতে পেরেছিল। আন্দোলনে ছাত্রদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের পর আন্দোলন আরও ব্যাপক গণভিত্তি লাভ করতে থাকে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত দেশব্যাপী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে থাকে। এর ফলে শ্রেণী সংগ্রামও জোরদার হতে থাকে।...

...গরীব মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বাদ দিলেও আন্দোলন সাধারণভাবে যে পর্যায়ে গিয়েছিল তাতে শ্রেণী সংগ্রাম যে কোন সময়ের চাইতে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল।...

শেখ মজিবরের মুক্তির পর

শেখ মজিবর মনে করল তার জন্যই জনগণ ১৪৪ ধারা, কারফিউ ভঙ্গ করেছে, পুলিশ-মিলিটারীর সাথে লড়াই করেছে; ছাত্ররা ঐ উদ্দেশ্যেই আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছে এবং দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ও প্রেরণা তার মুক্তি। এর চেয়ে বড় ভুল আর হতে পারে না।...

...শেখ মজিবর কি সে আশা পূরণ করেছিল? তার দল আওয়ামী লীগ ও ছাত্র-লীগের এবং তাদের দৃঢ় সমর্থক মস্কোপন্থীদের দ্বারা কি সে আশা পূরণ হতে পারতো?

...হতে পারে না এবং তাই হয়ওনি। উপরন্তু শেখ মজিবর বের হবার পর আন্দোলনের নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত, আন্দোলনের উদ্দেশ্য বিপথগামী এবং সমগ্র আন্দোলন লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ল।

গোল টেবিল বৈঠকের মহড়া

...শ্রেণীগত কারণ ও প্রয়োজনে শেখ মজিবর যে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেবে তাতে শাসক গোষ্ঠির কোন সন্দেহ ছিল না।

...এই মহান কাজের বিরোধিতার জন্য ধনিক ও সামন্তদলগুলি এবং তাদের বশংবদ মস্কোপন্থীরা আমাদের কী-না বলেছে? যেন আমরা তাদের পাকা ধানে মই দিচ্ছি! গোল টেবিলে যোগদানের বিরোধীতা করে কি আমরা ভুল করেছিলাম?

...ছাত্রদের ব্যাপক অংশ গোল টেবিলে যোগদানের পক্ষপাতি ছিল। কারণ তারা আর আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারছিল না, আন্দোলনে কৃষক সমিতি, শ্রমিক ফেডারেশন ও বিপ্লবীরা সামনের কাতারে এসে যাচ্ছিল। ছাত্রদের প্রধান অংশ যে আন্দোলনে শেখ মজিবরের নেতৃত্ব বা তার ভাবাদর্শ নেই সেখানে থাকা নিরাপদ বলে বোধ করছিল না, গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের প্রাধান্য, রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবি হিসাবে মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে পীড়াদায়ক হচ্ছিল।

গোল টেবিল বৈঠকের পর

অন্যদিকে ছাত্ররের বিভ্রান্ত করা ও আন্দোলন থেকে সরিয়ে আনার জন্য ছাত্রলীগ তাদের যোগ্য সহযোগী মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়নসহ সক্রিয় হয়ে উঠলো। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সোল এজেন্ট তোফায়েল আহমদ দিগবিজয়ী বীরের মত পূর্ব বাংলা সফর শুরু করলেন। তার প্রতিটি জনসভায় প্রধান বক্তব্য হল: মাওলানা ভাসানীর ছাত্রদের ১১ দফার প্রতি সমর্থন ছিল না, ছাত্র ও পূর্ব বাংলার

প্রকৃত দরদী ও নেতা হল শেখ মজিবর, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ছাত্রসমাজের তরফ থেকে ঘোষণা করেছে যে তারা শেখ মজিবরের পিছনে আছে এবং তার নেতৃত্বের প্রতি অবিচল থাকবে।

এসব সত্বেও আন্দোলন এগিয়েই চলল, আরও গভীর ও ব্যাপক হতে থাকল, শ্রমিক ও কৃষক আরও বেশী বেশী করে আন্দোলনে সামিল হতে লাগল। ছাত্ররাও পিছিয়ে থাকল না। বহু জায়গায় ছাত্র ও কৃষকরা মিলিতভাবে অচল ইউনিয়ন কাউন্সিলের জায়গায় নূতন শাসনতন্ত্র স্থাপন করেছিল।...

...কিন্তু তবুও দেশে জনগণের শাসন কায়েম হলো না। রাম ছাড়া যেমন রামায়ণ হয় না, শ্রমিক কৃষকের দল ছাড়া তেমনি জনগণের শাসন হয় না। জনগণ মানে শ্রমিক কৃষক আর সাধারণ মানুষ।...

...পরিশেষে, আবার বলছি যে, তিনটি মূল কারণের জন্য এবারকার বিপ্লব সাফল্য লাভ করতে পারল না। আগামীতে সে দুর্বলতা দূর করতে না পারলে এভাবে বিপ্লবী আন্দোলন বার বার ব্যর্থ হতে বাধ্য। এ সমস্ত দূর করতে হলে প্রয়োজন (১) একটি শক্তিশালী বিপ্লবী কমিউনিষ্ট পার্টি (২) সমস্ত বিপ্লবী দল, মত, ব্যক্তি ও গণ-সংগঠন এবং শ্রেণী সংগঠনের সমন্বয়ে একটি বিপ্লবী মুক্তি ফ্রন্ট গঠন এবং (৩) জাতির সামনে জনগণের রাষ্ট্রের একটি কর্মসূচী উপস্থাপন এবং তার ভিত্তিতে সমগ্র জাতিকে, বিশেষতঃ শ্রমিক কৃষককে সংগঠিত করা। *

* পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক উনসত্তরের মে' মাসে প্রচারিত দলিল (জনাব মেসবাহ কামাল প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর কাছে সংরক্ষিত)। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন পন্থীর) একটি অংশ এই পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।—লেখক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)

(সভাপতির-সাধারণ সম্পাদকের নাম)

	সহ-সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক
১৯২৪-২৫		যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
১৯২৫-২৬	মমতাজউদ্দিন আহমেদ	এ, কে, মুখার্জি এ, বি, রুদ্র (ভারপ্রাপ্ত)
১৯২৮-২৯	এ, এম আজহারুল ইসলাম ভূঞা	এস, চক্রবর্তী
১৯২৯-৩০	রমনীকান্ত ভট্টাচার্য	কাজী মহরত আলী আতাউর রহমান খান (ভারপ্রাপ্ত)
১৯৩৩-৩৪		ভবেশ চক্রবর্তী
১৯৩৫-৩৬		এ, এইচ, এম, এ কাদের
১৯৩৬-৩৭		এ, এইচ, এম, এ কাদের
১৯৩৮-৩৯		আঃ আউয়াল খান
১৯৪১-৪২		আঃ রহিম
১৯৪৫-৪৬	আহমেদুল কবীর (পদত্যাগ) ফরিদ আহমেদ (ভারপ্রাপ্ত)	সুধীর দত্ত
১৯৪৬-৪৭	ফরিদ আহমেদ	সুধীর দত্ত
১৯৪৭-৪৮	অরবিন্দ বোস	গোলাম আজম
১৯৪৮-৪৯	অরবিন্দ বোস	গোলাম আজম এ, জামান খান (ভারপ্রাপ্ত)
১৯৫৩-৫৪	এস, এ বারী এটি (ছাত্র ইউনিয়ন)	জুলমত আলী খান (ছাত্রলীগ) ফরিদ আহমেদ (ভারপ্রাপ্ত)
১৯৫৪-৫৫	নিরোদ বিহারী নাগ (ছাত্র ইউনিয়ন)	আবদুর রব চৌধুরী
১৯৫৫-৫৬	নিরোদ বিহারী নাগ (ছাত্র ইউনিয়ন)	আবদুর রব চৌধুরী
১৯৫৬-৫৭	একরামুল হক (ছাত্র ইউনিয়ন)	শাহ আলী হোসেন (ছাত্র ইউনিয়ন)

১৯৫৭-৫৮	বদরুল আলম (ছাত্র ইউনিয়ন)	মোঃ ফজলী হোসেন (ছাত্র ইউনিয়ন)
১৯৫৮-৫৯	আবুল হোসেন (ছাত্রলীগ)	এ টি এম মেহেদী (যুক্তপ্রার্থী)
১৯৫৯-৬০	আমিনুল ইসলাম তুলা (ছাত্র ইউনিয়ন)	আশরাফ উদ্দীন মকবুল (যুক্তপ্রার্থী)
১৯৬০-৬১	বেগম জাহানারা আখতার (ছাত্র ইউনিয়ন)	অমূল্য কুমার (ছাত্র ইউনিয়ন)
১৯৬১-৬২	এস, এম, রফিকুল হক (ছাত্র ইউনিয়ন)	এনায়েতুর রহমান
১৯৬২-৬৩	শ্যামা প্রসাদ ঘোষ (ছাত্র ইউনিয়ন)	কে এম, ওবায়দুর রহমান (ছাত্রলীগ)
১৯৬৩-৬৪	রাশেদ খান মেনন (ছাত্র ইউনিয়ন)	মতিয়া চৌধুরী (ছাত্র ইউনিয়ন)
১৯৬৪-৬৫	বোরহানউদ্দীন (ছাত্র ইউনিয়ন)	আসাফুদ্দৌল্লা (ছাত্রলীগ)
১৯৬৬-৬৭	ফেরদৌস আহমদ কোরেশি (ছাত্রলীগ)	শফি আহমেদ (ছাত্র ইউনিয়ন)
১৯৬৭-৬৮	মাহফুজা খানম (ছাত্র ইউনিয়ন)	মোরশেদ আলী (ছাত্র ইউনিয়ন)
১৯৬৮-৬৯	তোফায়েল আহমেদ (ছাত্রলীগ)	নাজিম কামরান চৌধুরী (এন, এস, এফ)

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ

(সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের নাম)

১৯৪৮-	নঈমউদ্দিন আহমদ (আহ্বায়ক)	
১৯৪৯-৫০	দবিরুল ইসলাম	খালেক নেওয়াজ খান
১৯৫০-৫২	খালেক নেওয়াজ খান	কামরুজ্জামান
১৯৫২-৫৩	কামরুজ্জামান	এম, এ, ওয়াদুদ
১৯৫৩-৫৭	আবদুল মোমিন তালুকদার	এম, এ আউয়াল
১৯৫৭-৬০	রফিকউল্লাহ চৌধুরী	কাজী আজহারুল ইসলাম শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (ভারপ্রাপ্ত)
১৯৬০-৬৩	শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন	শেখ ফজলুল হক মনি
১৯৬৩-৬৫	কে, এম, ওবায়দুর রহমান	সিরাজুল আলম খান
১৯৬৫-৬৭	সৈয়দ মাজহারুল হক বাকী,	আবদুর রাজ্জাক
১৯৬৭-৬৮	ফেরদৌস আহমদ কোরেশী	আবদুর রাজ্জাক
১৯৬৮-৬৯	আবদুর রউফ	খালেক মোহাম্মদ আলী
১৯৬৯-৭০	তোফায়েল আহমদ	আ. স. ম. আবদুর রব

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন
(সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের নাম)

১৯৫২-	কাজী আনোয়ারুল আজিম সৈয়দ আবদুস সাত্তার	যুগ্ম আহবায়ক
১৯৫২-৫৪	মোহাম্মদ সুলতান	মোহাম্মদ ইলিয়াস
১৯৫৪-৫৬	আবদুল মতিন	গোলাম আরিফ টিপু
১৯৫৬-৫৮	আবদুল সাত্তার	এস, এ, বারী এটি
১৯৫৮	আজিজুর রহমান আক্কাস	সাদউদ্দিন
১৯৬২-৬৩	আহমেদ জামাল জয়নাল আবেদিন (কার্যকরী) মহিউদ্দিন আহমদ (কার্যকরী)	কাজী জাফর আহমদ
১৯৬৩	এ, কে, বদরুল হক পঙ্কজ ভট্টাচার্য (কার্যকরী)	হায়দার আকবর খান রণো নূরুর রহমান (কার্যকরী)

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)

১৯৬৫	মতিয়া চৌধুরী	সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক
১৯৬৬-৬৯	সাইফুদ্দিন মানিক	সামসুদ্দোহা
১৯৬৯-৭০	সামসুদ্দোহা	নূরুল ইসলাম

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন)

১৯৬৫	রাশেদ খান মেনন	সফিকুর রহমান
১৯৬৬-৬৮	রাশেদ খান মেনন	আবদুল মান্নান ভূঁইয়া
১৯৬৮-৬৯	মোস্তফা জামাল হায়দার	মাহবুবউল্লাহ

ইসলামী ছাত্রসংঘ

১৯৫৫-৫২	সৈয়দ মোহাম্মদ আলী আহ্বায়ক (প্রাদেশিক শাখার প্রথম আহ্বায়ক	
১৯৬২	হাবিবুর রহমান	আবুল মোকারেম মোঃ মোসলেম
১৯৬৩	হাবিবুর রহমান	আবুল বাশার মোঃ নাজিম
১৯৬৩-৬৪	এ, কে, এম নাজির আহমেদ	আবুল বাশার মোঃ নাজিম
১৯৬৪-৬৫	এ, কে, এম নাজির আহমেদ	আবুল বাশার মোঃ নাজিম
১৯৬৫-৬৬	গোলাম সারোয়ার	সৈয়দ একরামুল হক
১৯৬৬-৬৭	মতিউর রহমান নিজামী	সৈয়দ শাহজাহান চৌধুরী
১৯৬৮-৬৮	মতিউর রহমান নিজামী	নূরুল ইসলাম
১৯৬৭-৬৮	মতিউর রহমান নিজামী	নূরুল ইসলাম
১৯৬৯-৭০	মতিউর রহমান নিজামী	আজিজুর রহমান

জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (এন এস এফ)

১৯৫৭-৫৮	এ, টি, এম তাহা	এ, আর, ইউসুফ
১৯৫৮-৬১	এ, আর, ইউসুফ	আনোয়ারুল হক কচিঁ
১৯৬১-৬৩	আবুল হাসনাত	আনোয়ার আনসারী খান
১৯৬৩-৬৪	আবদুল হালিম	আনোয়ার আনসারী খান
১৯৬৪-৬৫	এ, কে, এম, আবদুররব	মাহবুবুল হক দোলন
১৯৬৬-৬৯	সাইফউল্যা চৌধুরী	মোহাম্মদ জমির আলী

পাকিস্তান ছাত্রশক্তি

১৯৫৬	ফরমানউল্লাহ খান	শাহাদাৎ হোসেন শরীফ
১৯৫৭	শরীফ আবদুল্লাহ হারুণ	শাহ আবদুল হালিম
১৯৫৮	এ.টি.এম মাহবুবুল হক	নূরুল হক
১৯৫৯	শাহ আবদুল হালিম	মওদুদ আহমদ
১৯৬১	মিয়া মোঃ নূরুজ্জামান	মিজানুর রহমান শেলী
১৯৬২	দেওয়ান সিরাজুল হক	রেজাউল হক সরকার
১৯৬৩	আনিসুর রহমান রফিকুল ইসলাম	মোজাফফর হোসেন পল্টু শাহেদ আলী

নামসূচী

অ

অগ্রগামী ৪৯, ৫০

অজয় রায় ১৪২

অনিল মুখার্জি ১৭৩

আজারভার, পাকিস্তান ৬১, ৭৩, ১২৬, ১৩৩৩, ১৩৪, ১৩৮, ১৭৫

অমল সেন ১৪২, ১৭৫

অমূল্য রায় (চক্রবর্তী) ৫১

অমূল্য লাহিড়ী ১৪২

অলি আহাদ ৩। ১৫, ১৬, ১৮, ২১, ২৮, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৬৪, ১৪০

আ

আইয়ুব খান ৩৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৫৬, ৫৭, ৫ড, ৬২, ৬৩, ৬৬, ৬৯, ৭৬, ১০০, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১৩১, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৭, ১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৭২, ১৭৩

আইয়ুব রেজা চৌধুরী ৭৩

আউয়াল, আবদুল ৩৪, ৩৫, ৪০,১০৫

আওয়ামী (মুসলিম) লীগ ৬, ৯, ১১, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৫, ২৬, ৩৩—৩৯, ৪১, ৪২, ৫২, ৫৪, ৫৮, ৫৯, ৮১, ৯৭, ১১৬, ১১৭, ১২৭, ১৩১, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১, ১৪২, ১৬১

আওয়ামী লীগ (পি,ভি, এম পন্থী ১৬৪

আকরাম খাঁ, মাওলানা ১২৯

আকরাম হোসেন, কাজী ৪৮, ৫২, ৫৯, ৬১, ১২০

আখতার উদ্দিন ৮

আখতারুজ্জামান, ড. ম ১৭৪

আজাদ, দৈনিক ৫১, ৬২, ৬৯, ৭৬, ৮৩, ৮৮, ৯০, ৯১, ১২৫, ১২৬, ১৩৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৬০

আজাদ সোবহানী, মাওলানা ১২৯

আজিজ বাগমার, আবদুল ৭১

আজিজুল ইসলাম ১১

আজিজুল ইসলাম খান ১৭

আতাউর রহমান খান ৯, ১১, ৪০, ৪২, ৪৩, ৫৩, ১৩৬, ১৩৯, ১৪৩, ১৭৯

অতাউস সামাদ ১৪৩

আতোয়ার হোসেন ৬৬

আদম, মেজর জেনারেল ৮

আনোয়ার আলী ৮৯

আনোয়ার জাহিদ ৫২, ১১৫, ১১৬

আনোয়ারা বেগম ১৭২

আনোয়ারুল আজিম ১০৫

আনোয়ারুল হক, কাজী ৯৬

আনোয়ারুল হক চৌধুরী ৮৯

আনিসুজ্জামান, ডঃ ১২৬

আনিসুর রহমান ৫৯, ১২৯
আবদুর রব ১৩৮
আবদুল করিম ৮৯
আবদুল হক, ডঃ (বাবায়ে উর্দু) ১৭
আবদুল হক (শিক্ষা বোর্ড) ৬৬
আবদুল হক (কমিউনিস্ট নেতা) ২০,
১৪২, ১৬৯, ১৭২
আবদুল হাই, অধ্যাপক ১২৬, ১৩৩
আবদুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম ৭০, ৭১
আবু জাফর ১০২
আবু মাহমুদ, ডঃ ১২৩
আবুল মনসুর আহমদ ২১, ১২৫
আবু হোসেন সরকার ৩৪, ৩৫, ৩৬,
৪২, ৪৩, ১৪৩
আবু সুফিয়ান ১৩৫
আবুল হোসেন ৪৬
আমজাদ হোসেন ১৪২
আমির হোসেন চৌধুরী ৮৫
আমিনুল ইসলাম তুলা ৪৯
আমীর হোসেন শাহ ১৬৩
অমেনা বেগম ৩৪
আযম খান ৭৬
আরিফুর রহমান ৮৯
আল-আজাদ, আলাউদ্দিন ১৪, ৪৬
আলতাফ গওহর ১২০
আলতাফ মাহমুদ ১০
আলাউদ্দিন আহমদ ১৬৯
আলী হায়দার খান ৮৭, ৯৯
আলী আশরাফ ৩৫
আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী ২০
আশরাফ উদ্দিন মকবুল ৪৯
আশু ভরদ্বাজ ১৪২
আসমত আলী ৮৮
আসাদ্দর আলী ১৪২
আসাদুজ্জামান ১৬৭
আসির (বিচারপতি) ৫২
আহমদ শরীফ, ডঃ ১২৬
আহমেদ জামাল ৫৮
আহসান আলী ৭০

ই

ইউসুফ, এ, আর ১২৯
ইত্তেফাক (দৈনিক) ১৭৬, ১৮০
ইত্তেফাক (সাপ্তাহিক) ৮, ১০,
১৮, ৪৮, ১৬৪
ইব্রাহিম খাঁ ১২৫
ইব্রাহীম তাহা ৮
ইমাদুল্লাহ ৯
ইমাম হোসেন চৌধুরী (বিচারপতি) ৫২
ইলিয়াস, খন্দকার মোহাম্মদ ২৭
ইসকান্দার মীর্জা ২৭, ২৯, ৩৩, ৪২,
৪৩, ৪৫
ইসতিয়াক আহমদ, সৈয়দ ১৩
ইসলামিক ব্রাদার হুড ৮
ইসলামী জামায়াতে তালাবা ৯৭, ১২৯
১৩০, ১৩১, ১৩৮
ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ ১৪৯
ইসহাক, মোহাম্মদ ৮, ১৪৫
ইয়ার মোহাম্মদ খান ৩০

উ

উমর, বদরুদ্দিন ৪, ৭

এ

একতা ৩৯

একরামুল হক ৪০

এনামুল হক, ডঃ ১৩৩

এম, আই, চৌধুরী ৬৯

এম, এন, হুদা ১৮০

ঐ

ঐক্যতান গোষ্ঠী ১২৩

ও

ওবায়দুর রহমান ৩২

ওবায়দুর রহমান, কে, এম, ৮৪, ৮৮, ১৪২, ১৭৫

ওমরাও খান ৪৬

ওসমান গণি, ডঃ (উপচার্য) ৯০

ওয়ার্কার্স পার্টি ১০৬

ওয়াদুদ, এম, এ ৯

ওয়ালী খান, খান আবদুল ১৩৭, ১৩৯, ১৭২,

ওয়াহিউল্লাহ ৭৩

ক

কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তানের ১, ৫, ১১, ১২, ২০, ২৫, ২৮, ৩৫, ৩৯, ৪১, ৪৫, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৭২, ৭৭, ৮০, ১০৬, ১০৭, ১১৫, ১৩৯, ১৪২, ১৭৫

কমিউনিস্ট গ্রুপ (চীন পন্থী) ১২০

কমিউনিস্ট (একাশি পার্টি) ১০, ১০৭

কংগ্রেস, জাতীয় ২৫

কামরুজ্জামান ১৩, ৩৫

কামরুদ্দিন আহমদ ৩১

কামালউদ্দিন আহমদ ১৫৫

কামালউদ্দিন শিকদার ৮৯

কালাহান ২৯

কে, এম, শেখ (জেনারেল) ৫৩

কোরেশী, ফেরদৌস আহমেদ ৩৭,৪০ ৪৬, ৫০, ৫৪, ৬১ ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯১, ১০৪, ১২৪, ১২৭, ১৩৬

কৃষক শ্রমিক পার্টি ১৯, ২৯, ২৫, ৩৪, ৩৫, ৪২, ৪৭, ৯

খ

খয়রাত হোসেন ৪১

খায়রুল কবীর ১২০

খায়ের বস্ত্র মারী ৭৪

খালেক নেওয়াজ খান ২৫

খালেদ ১৩৪

খালেদ মোহাম্মদ আলী, ১৫৮, ১৬০, ১৭৫

খেলাফতে রব্বানী পার্টি ২০, ২৫, ৫০, ১২৯, ১৩০

খোকা রায় ৫৪, ৫৬, ৮২, ১২০

খুদা, কুদরাত-ই ১২৬

গ

গওহর আইয়ুব ১৩৩

গণবাহিনী ৮৫

গণতন্ত্রী দল ১১, ২০, ২৫

গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্ট (ঢা: বি) ১৪, ১৮

গফুর, আবদুল ১১, ৩৫

গাজীউল হক ৮, ১০, ১২, ১৩ ১১৬

গাফফার চৌধুরী, আবদুল ১০
গিয়াস কামাল ৮৮
গিয়াসউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ৮১
গোলাম আজম (অধ্যাপক) ৫১
গোলাম ফারুক ৭৫, ৭৬
গোলাম মোস্তফা ৭৩
গোলাম মোহাম্মদ ১৪, ২৭, ৪১, ৪২
গোলাম হাফিজ মীর্জা ১৪৩

চ

চিত্ত রঞ্জন সুতার ১৪২
চুন্দ্রগড় আই, আই ৪৩

ছ

ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান (এপসু) ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৮, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৩, ৭০, ৭২, ৭৪, ৮২, ৮৩, ৮৬, ৯৭, ৯৮, ১০০, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১৫, ১১৬, ১৩৪
ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ১১৭, ১২৩, ১২৪, ১২৭, ১৩৩, ১৩৪, ১৪২, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৮, ১৬৯, ১৭১, ১৭৫
ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ১১৪, ১১৭ ১২০, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬৪, ১৬৭ ১৬৯, ১৭১, ১৭৫, ১৭৬
ছাত্র ফেডারেশন, করাচী ৯৭
ছাত্র ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক ৯৭
ছাত্র ফেডারেশন, জাতীয়(এন, এস.এফ) ৪৬, ৪৯, ৫৩, ৫৮, ৫৯, ৭৭, ৮২, ৮৩, ৮৭, ৯৭, ১২৩, ১২৮, ১২৯, ১৩৪, ১৩৫, ১৫৭, ১৬৬
ছাত্রলীগ, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ১৪
ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান (মুসলিম) ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৮, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫০, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০৪ ১০৫, ১১৭, ১২৩, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১৩৪, ১৫৭, ১৫৮, ১৬৮, ১৬১, ১৭৬
ছাত্রশক্তি ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫৯, ৫৯, ৯৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০
ছাত্রসংঘ, ইসলামী ৪৬, ৪৯, ৯৭, ১২৮, ১২৯
ছাত্রসংস্থা ১৬, ৯৭
ছাত্রী কংগ্রেস ৯৭
ছাত্রী সংসদ, পূর্ব পাকিস্তান ৩৪
(বিপ্লবী) ছাত্রমৈত্রী ১১৭
(বিপ্লবী) ছাত্র ইউনিয়ন ১১৭
জাময়তে তালাবায়ে আরাবিয়া (আরবীর ছাত্রদের সংগঠন) ১২৯
ডিগ্রী ষ্টুডেন্টস ফোরাম ৬১, ৭১, ১২৬

জ

জমিরুদ্দিন ১১
জয়নাল আবেদীন ৫৮
জয়নুল আবেদীন ১২৬
জমির আলী ১৩৫, ১৬৬
জহির রায়হান ৩১, ৩২, ৫২
জহির সাজ্জাদ ২৮
জহুরুল হক (সার্জেণ্ট) ১৭৩
জহুর হোসেন চৌধুরী ৫৪, ৬৫
জাকির আহমেদ ৮৯, ১০৮
জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট ১৬৪
জাফর আহমদ, কাজী ৫৪, ৫৭, ৬৫, ৭১, ৭৩, ৭৭, ১০৭, ১০৮, ১১৫, ১৪২, ১৭৩
জামাল আনোয়ার বাসু ৭০, ১০৯
জামায়াতে ইসলামী ৯৭, ১১৬, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৪২, ১৬০
জালালউদ্দিন, মোল্লা, ১৪২
জাসদ ৮৫
জাহাঙ্গীর ফয়েজ ১৩৫
জাহেদুর রহিম ৪৯
জাহানারা বেগম ৫১
জিন্নাহ, আওয়ামী লীগ ৩৬
জিন্নাহ, ফাতেমা ১৪০, ১৪১
জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী ১৪০
জিয়াউদ্দিন (মাহমুদ) ৫৩
জিয়াউল হক ৮৪
জিল্লুর রহমান ৮, ১২, ১৩
জোহরা তাজুদ্দিন ১৪৩
জ্যোতিষ বোস ১৪২

ড

ডাক ১৪১, ১৬৪
ডাকসু ৪০, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫১, ৫২, ৭২, ১৩৩, ১৫৭, ১৫৯, ১৬০
ডিগ্রী ষ্টুডেন্ট ফোরাম ৬১, ৭১, ১২৬

ত

তমুদ্দুন মজলিশ ১১, ৩৫, ১২৯
তাজউদ্দিন আহমদ ৮, ১৩৯, ১৪২, ১৭৩
তানী, ডঃ ১২০
তামিরে মিল্লাত ৪৬
তালিম হোসেন ১২৫, ১৩০
তালাবায়ে আরাবিয়া, ১২৯
তাসিরউদ্দীন আহমেদ ১৫, ৬৪
তাহেরুল ইসলাম ১৫৩
তোফায়েল আহমদ ১৩৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৭১, ১৭২, ১৭৫, ১৭৬
তোয়াহা, মোহাম্মদ ৩, ৩৫, ১০৭, ১৬৯, ১৭২
তোলারাম কলেজ (নারায়ণগঞ্জ) ১১

দ

দস্তিদার, পূর্ণেন্দু ১৪
দস্তিদার, সুখেন্দ ১০৭, ১৬৯
দ্বারকানাথ ঠাকুর ১০১
দীন মোহাম্মদ, কাজী ১৩৩
দেবেন শিকদার ১৬৯
দোহা (আই,জি) ৮

ন

নঈমুদ্দিন আহমদ ১৫
নগেন সরকার ৭৬, ১৪২
নজরুল ইসলাম, সৈয়দ ১৩৯, ১৬৩
নতুন খবর (সাপ্তাহিক) ৩৬
নতুন কথা (সাপ্তাহিক) ৫৯
নসরুল্লাহ খান ১৬৪
নাজিম কামরান চৌধুরী ১৫৭, ১৫৯, ১৬০, ১৬৬
নাজমা বেগম ৭০
নাজমুল আলম খান ১৩৮
নাজিমুদ্দিন, খাজা ১৪
নাসিম আলী ১৭৩
নাসির আহমেদ ৯৬
নির্মল সেন ১৭, ১০৫
নীলিমা ইব্রাহীম, ডঃ ১২৬
নুন, ফিরোজ খান ৪৩
নূরুল আরেফিন খান ৭১
নূরুল আমীন ১৩, ২৫, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০
নূরে আলম সিদ্দিকী ১৪৩
নূরুল ইসলাম চৌধুরী ৮৯
নূরুল ইসলাম ৭০, ১২৪, ১২৭, ১৩৪, ১৩৬, ১৫৮, ১৬০, ১৬৫, ১৭১, ১৭৪ ১৭৫, ১৮১
নূরুল ইসলাম (ঢাকা কলেজ) ৭০
নূর মোহাম্মদ খান ১৫৯
নূরুর রহমান ১০৯, ১১৩
নূরুল হাসান ১৫৯
নেজামে ইসলাম ১৯, ২৫, ৯৭, ১২৯, ১৪২, ১৬৩
নেপাল নাগ ১০৬
নেহেরু, জওহর লাল ২৮
নোভার্ক (ফাদার) ৮৫
ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) ৩৭, ৪১, ৬৪, ৮১, ৯৩, ১৩১
ন্যাপ (ওয়ালী) ১৩৯, ১৪১, ১৪২, ১৪৫, ১৬৩, ১৬৪
ন্যাপ (ভাসানী) ১১৬, ১১৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৬৪
ন্যাপ ঐক্য ১৭, ৪৫

প

পঙ্কজ ভট্টাচার্য ৪৫, ৪৯, ৫৩, ৫৭, ৬০, ৬১, ৭২, ৭৫, ৮১, ১০৭ ১০৮, ১০৯, ১১৬, ১২০
পল নিউম্যান (অধ্যাপক) ৫৩
পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল ৩৪, ৩৫, ৪৩
পাকিস্তান, দৈনিক ১৩৩, ১৩৮, ১৪৪
পি. পি. পি ১৪২, ১৬৪
পি. ভি. এম ১৩৯
পীর হাবিবুর রহমান ১২০
পুলিন দে ৩৫
পূর্বদেশ (সাপ্তাহিক) ১৭৬

ফ

ফজল, আবুল ১০৮
ফজলী হোসেন ৪৬, ৪৭

ফজলুল কাদের চৌধুরী ১৪৩
ফজলুল হক, আবুল কাশেম ১৯, ২০, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৫, ৪১, ৪২, ৪৩,
ফজলুল হক হল ১৩, ১৬, ৩১
ফজলুর রহমান ১১
ফজলুর রহমান, আহমদ ১২০
ফরমানউল্লাহ খান ১২৯
ফরহাদ, মোহাম্মদ ৪৫, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৩, ৮৬, ১০৭, ১০৮, ১৪২, ১৭২, ১৭৩
ফরাসউদ্দিন ৮৭
ফররুখ আহমদ ১২৫
ফারুক আহমেদ, কাজী ৭০, ৭১
ফরিদ আহাদ ১৮০

ব

বঙ্গবন্ধু ১৭৬, ১৭৯, ১৮০, ১৮১,
বজলুর রহমান ৮৭
বদরুল আলম ৪৬
বদরুল হক, এ.কে. ৫৮; ৬২, ৮৮, ১০৭, ১০৮
বরকত ৩১
বশির আল হেলাল ১০
বারানভ, এস, এস ১১৯
বারী, এটি, এস, এ ১৪, ১০৫
বারী, কাজী আবদুল ১৭, ৪৫, ৭৬
বারকী (জেনারেল) ৬৫
বাবুল ৭৩
বাহাদুর খান, সরদার ২৯
বিচিত্রা (সাপ্তাহিক) ৪৭
বি, এন, আর ৫১
বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র ১০১, ১০২
বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল ৩৫, ৪১
বিমল দত্ত, সুধাংশু ১৪২
বেজেঞ্জো, গাউস বক্স ৭৪
ব্যালেন্টাইন, অধ্যক্ষ ১০২

ভ

ভাসানী মাওলানা আবদুল হামিদ খান ১২, ১৩, ২০, ২৭, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬, ১৬৪, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৯, ১৮০
ভুট্টো, জুলফিকার আলী ৫৩, ৬৫ ১৩৭, ১৪১, ১৭২, ১৭৫, ১৭৫

ম

মওদুদ আহমদ ৫৮
মওদুদী, মাওলানা ১২৮
মজিদ, আবদুল ১৪৫
মজিদ খান, আবদুল ১০০
মজিবর রহমান খান ১২৫
মণি কৃষ্ণ সেন ১৪২
মণি, শেখ ফজলুল হক ৫৮, ৬২, ৮৮, ১৪২, ১৮৫
মণি সিংহ ২১, ২৬, ৫৪, ৭৬, ১৪২, ১৭৩, ১৭৫

মণিরুজ্জামান, মোহাম্মদ, ডঃ ১২৬
মতিউর রহমান ৩৯, ৪৬, ৫০, ৫৪, ১০৭, ১১৩, ১১৫
মতিউর রহমান নিজামী ৪৬, ১২৯
মতিউর রহমান সৈয়দ ৮৯
মতিউর রহমান (নবকুমার ইনিস্টিটিউট) ১৭০
মতিন, আবদুল ৩, ৪, ১১, ১৯, ১৬৯
মতিন চৌধুরী, আবদুল ডঃ ১২৩
মতিয়া চৌধুরী ৭০ ৮৩, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯১, ১৩০, ১০৭, ১১৫, ১১৬, ১১৭ ১২৪ ১৪৩, ১৭৩
মঞ্জু, আনোয়ার হোসেন ১২৪
মঞ্জুর কাদের ৫৯, ৬০
মনসুরউদ্দিন আহমদ ৮৯
মন্মথ দে ১৭৩
মনোয়ার ভূইয়া ১৩১
মফিজুর রহমান ১৩৮
মফিদুল হক ৩২, ৪৬, ৫০
মামুন, আবদুল ১৭৯
ময়ূখ ৫০
মশিউর রহমান ৪১
মহিউদ্দিন আহমদ ৩৫, ১৪২, ১৪৩
মহিউদ্দিন, কে, জি, ১৮০
মহিউদ্দিন খান ৭৩
মহিউদ্দিন, মাওলানা ৫১
মংশু প্রু চৌধুরী ১৭৩
মাও সে তুং ১১৭, ১৩৯, ১৬৯, ১৭০
মাজেদ খান ৭৭
মান্নান তালিব, আবদুল ৫১
মানিক মিয়া, তফাজ্জল হোসেন ২৯, ৩০, ৪২, ৫৪, ৬৫, ৮৬, ১৪২
মানিক, সাইফুদ্দিন আহমদ ৫৭, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৭৩, ১০৯, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১৫৭, ১৫৯, ১৬০, ১৬৯, ১৭১, ১৭৫, ১২৪, ১২৭, ১৩৬, ১৫৮, ১৬৫
মালেক, আবদুল ১৩৮
মাহফুজউল্লাহ ১৩৭, ১৪০, ১৫৬, ১৬০, ১৭৫
মাহফুজা খানম ১২৬
মাহবুবউল্লাহ ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৫, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২৭, ১৩৪, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৫, ১৬৯, ১৭০, ১৭১
মাহমুদ আলী ১১, ২০, ৪১, ১৮০
মাহবুব আলী, দেওয়ান ১৪৩
মাহমুদ হোসেন, ডঃ ৫০, ৬০, ১১৮
মাহবুবুল হক দোলন ১৩৭, ১৪০, ১৫৬, ১৬০, ১৭৫
মাহমুদ, এম, এ (বিচারপতি) ৯৬ ৫৬
মিজানুর রহমান ১৪৩
মিয়া তোফায়েল ১৬৩
মুঈদ চৌধুরী ৮৭
মুকুল, আবদুল কাইয়ুম ১০৪
মুজিবুর রহমান, শেখ ৯, ১১, ১৫, ১৮, ২৬, ৪০, ৪২, ৫০, ৫৪, ৫৬, ৮৬য় ১১৬, ১১৮, ১১৯,

১২২, ১৩১, ১৩২, ১৩৯, ১৪২, ১৬৯, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৮১
মুনীর চৌধুরী ১২৬
মুফতি মাহমুদ ১৬৪
মুর্শিদ, খান সরোয়ার, ডঃ ৫১
মুসলিম লীগ, ১৮, ২০, ২৫, ৩০, ৩৬, ৩৯, ৪১, ৯৭, ১১৬, ১২৯, ১৪২, ১৬৪
মুসা আহমেদ ৫১
মুসা, এ, বি, এম, ১৪৩
মোজাফফর আহমদ, অধ্যাপক, ১২০, ১৪১, ১৪৩, ১৭২, ১৬৯
মোজাম্মেল ইসলাম, কাজী ৮৯
মোজাম্মেল হক ৩২
মোনায়েম খান ৬৫, ৭৬, ৮৭, ১১২ ১২৫, ১৭২, ১৭৩, ১৮০
মোমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ডঃ ৬৬
মোমেন তালুকদার আবদুল, ৩৫, ১০৫
মোয়াজ্জেম হোসেন শাহ ৬৩, ৭১, ৮৫, ৮৮
মোর্শেদ, এস, এম (বিচারপতি) ৫১, ১৭৯
মোরশেদ আলী ১২৬, ১৩৮
মোশতাক, খন্দকার ১৩৯
মোস্তফা, খন্দকার গোলাম ১৩
মোস্তফা, গোলাম ১১
মোস্তফা, জামাল হায়দার ১৫৯, ১৬০, ১৬৯
মোহাম্মদ আলী ১৬৩
মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) ১৪, ১৭, ২৭, ৩৩, ৪২
মোহাম্মদ আলী চৌধুরী ৪২, ৪৩
মোহাম্মদ আলী, সৈয়দ ১২৯
মোহাম্মদ উল্লাহ ভূঁইয়া ৮৭
মেকলে ১০০, ১০১
মেঘনা সংঘ ১৬৯
মেনন, রাশেদ খান ৫৩, ৫৭, ৫৯, ৬১, ৬৩, ৭৩, ৮৩, ৮৭, ৮৮, ৯১, ১০০, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২৭, ১৪৩, ১৭৩
মেসবাহ কামাল ১৫৬
মেহেদী, এ, টি এম ৪৬
মৃণাল বারুরী ১৪২

য

যুক্তফ্রণ্ট ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৫
যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ১, ৯, ১০, ১১, ৩৪, ৩৮, ৪১

র

রউফ, আবদুর ১৫৮, ১৬০
রণেশ দাসগুপ্ত ১৪২
রণেশ মৈত্র ১৪২
রণো হায়দার আকবর খান ৫৪ ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৭৩, ৮৬, ৮৮, ১০৭, ১০৪, ১১৫ ,
রতন সেন ১৪২
রফিকুল ইসলাম, ডঃ১০,৯০,১২৬, ১২৯
রফিকুল হক ৬২

রবি নিয়োগী ১৪২
রবীন্দ্রনাথ ১২৪
রশীদ, আবদুর ৭০
রশীদ, এ, ডঃ ৬৬
রশীদ তর্কবাগীশ, আবদুর ১৪৫
রহমান চৌধুরী, আবদুর ১৫
রহমান, এম, এ, ১৭৪
রহিম আজাদ ৫৮, ৫৯
রক্ষী বাহিনী ৮৫
রাজী, ডঃ আলীম আল ১২৫, ১৪৩
রাজ্জাক, আবদুর ৫৮; ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ১০৪, ১২৭, ১৭৩
রাজ্জাক আবদুর (জাতীয় অধ্যাপক) ১২৩,
রামমোহন রায় ১০১
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪, ৮, ৩১, ৩৫
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, কেন্দ্রীয় (সর্বদলীয়) ৩, ৪, ৮, ৯, ১১
রিক্সা ইউনিয়ন ৩৫
রিপাবলিকান পার্টি ৪৩
রুস্তম আলী ১৭০
রুহুল কুদ্দুস ১২০
রুহুল আমিন ৩৫
রেজা আলী ৬২, ৭৩
রেহমান সোবহান ৫০, ১১৮
রেজোয়ানুল ইসলাম ১৩৪

ল

লতিফ, আবদুল ১০, ১৪
লতিফ, নবাব আবদুল ১০৪
লিয়াকত আলী খান ২৮

শ

শওকত আলী খান ১৪৩
শরীফ, এস, এম ৬৬, ৬৮
শহিদুল ইসলাম ১০২
শহীদুল্লাহ কায়সার ৭, ১২৬, ১৪৩
শহীদুল্লাহ, ডঃ মোহাম্মদ ৪৮, ১৩২
শহীদুল হক ৮৯
শংকর বোস ১৪২
শান্তি সেন ১৪২
শামসুজ্জোহা ১২৪, ১৭৪
শামসুদ্দিন, আবুল কালাম ১৩৩
শামসুদ্দোহা ১৫৮, ১৫৯, ১৬৮
শামসুর রাহমান ১২৬
শামসুর রহমান খান ১২০
শামসুন্নাহার ৩৫
শামসুল হক ৮
শাহাবুদ্দিন, খাজা ১২৫, ১৭৪
শাহেদ আলী ৪৪
'শিখা' ৮০
শিল্প সাহিত্য সংঘ ৪৫, ৫০
শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, বিশ্ববিদ্যালয় ১০১, ১৫৩
শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ১৭৪
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল ১৭, ১০৫

স

সওগাত আলম ৮৮
সত্যেন সেন ১৪২
সন্তোষ ব্যানার্জী ১৭৩

সবুর খান, খান আবদুস ৬৪, ৬৫, ১২৪, ১২৫, ১৪৫, ১৬৬
সর্বদলীয় সংগ্রাম (কর্ম) পরিষদ ৬, ১২, ৩৪, ৩৫
সলিমুল্লাহ হল ১১, ১৫, ৩১
সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ ১৪
সংখ্যালঘু যুক্তফ্রণ্ট ২৫
সংগ্রাম (সাপ্তাহিক) ১১
সংবাদ (দৈনিক) ১৩৩, ১৭৩
সংস্কৃতি সংগ্রাম পরিষদ (খুলনা) ১২৬
সংস্কৃতি সংসদ (ঢা : বি) ৪৫, ৫০, ১২৬
সাইদ-উর-রহমান ১২০, ১৩৬
সাইদুর রহমান (পাচপার্ত্তু) ১৩৪
সাইফুল্লাহ চৌধুরী ১৩৫
সাত্তার, আবদুস ৩৪, ৩৫
সাদেকুর রহমান মিয়া ১১৫
সামাদ, আবদুস ৮, ১১
সামসুদ্দোহা ৪৮
সারোয়ার ১৬
সালাউদ্দিন, শাহ ৭০
সালাম খান, আবদুস ১৩৯, ১৮০
সাংবাদিক ইউনিয়ন ১১
সাংস্কৃতিক পরিষদ ৪৬, ৫০
সিরাজুল আলম খান ১৭, ৪০, ৫৮, ৭২, ৭৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৯৯, ১৭১
সিরাজুল আলম এন, এম ৮৮
সিরাজুল হোসেন খান ১১৬
সুনীল রায় ১১৬
সুফিয়া কামাল ১২৬
সুলতান আহমেদ ১৭৩
সুলতান মাহমুদ খান ৭০
সুলতান, মোহাম্মদ ৮, ১৩, ৩৪
সেলিনা হোসেন ১৩২
সেলিম ৩৫
সোলায়মান, এ, কে, ১২৫
সোহরাওয়ার্দী, হোসেন শহীদ ২৬, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৫৬, ৭২, ৭৫

হ

হাই, অধ্যাপক আবদুল ৩৫
হাণ্টার ১০৩
হানিফ খান ১৪২
হাবিবুর রহমান, পীর ১৪৩
হাকিম আবদুল (স্পীকার) ৪৩
হামিদ, আবদুল ৭৩
হামিদ, দেওয়ান আবদুল ৫১
হামিদুল হক চৌধুরী ৩০, ১৮০
হামুদুর রহমান ৪৬, ৬৮, ৯৬, ৯৯, ১৪৯, ১৫১
হালিম, আবদুল ৭৩
হালিম চৌধুরী (ক্যাপ্টেন) ৭৭
হায়াৎ হোসেন ৯৯
হাশিম, আবুল ২০, ১২৯
হাসনাত, আবুল ৫৮
হাসান আসকারী, খাজা ১৭৪
হাসান ইকবাল ৩৫

হাসান জামান, ডঃ ১২৫
হাসান নাসির ৭৫
হাসান হাফিজুর রহমান ১৬, ১২৬
হাসিম উমর যাই ১৩৭, ১৩৮
হারুনুর রশীদ, চৌধুরী ১৪২, ১৭৩
হিলড্রেথ ২৮
হুমায়ুন কবির ৮৯
Apparna Basu ১০৩, ১৫৪
Hunter ১০৩
Rahim, M.A ১০৪
Ronglal sen ১৩৯
Sateyendranath Roy ১০২
Tariq Ali ১৪০

—o—

ইতিহাস পাঠকরা পড়লে অবাক হবেন, 'ইতিহাসের পেছনেও ইতিহাস থাকে' কথাটি আলোচ্য গ্রন্থে কতো বেশী সত্য হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলনের খবরাখবর কাগজের পাতা থেকে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কম-বেশী আমরা সবাই জানি। কিন্তু এসব আন্দোলন ও ঘটনার পেছনে কি সব প্রয়াস কাজ করেছে (পর্দার আড়াল থেকে) আমরা তা অনেকেই জানিনা। আলোচ্য গ্রন্থে পাঠক সেই শ্বাসরুদ্ধকর কৌতূহলেরই জবাব পাবেন।

বিশেষ করে, ৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনে ছাত্র সমাজের অবদান, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের একত্রীকরণ ও দ্বন্দ্বের অজানা কাহিনী, '৫৫ থেকে '৫৭-র দুঃখজনক কান্ডজ্ঞানহীনতা, '৫৮ সালে সামরিক আইন জারীর পেছনের রহস্য, দায়িত্বহীন রাজনীতিকরা ক্রমান্বয়ে যে ট্রাজেডীর জন্ম দিয়েছিলেন '৬১ সালে এসে তা থেকে উত্তরণের পথ বের করে নিল ছাত্ররাই, জন্ম দিল '৬২-র সামরিক ও শিক্ষা কমিশন বিরোধী দুর্বার ছাত্র আন্দোলনের, '৬৩-তে ছাত্রলীগে আদর্শিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হল, '৬৪-তে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার কাজে ছাত্ররা ঝাপিয়ে পড়লো, '৬৫-তে ছাত্র ইউনিয়ন যে ভেঙ্গে গেল তার নেপথ্যের অনেক কথা, '৬৬ সালে ছয় দফা রচনার রহস্য উদঘাটিত হল, '৬৭-তে এসে ছাত্ররা করলো তৃতীয় বিভাগ আন্দোলন, এর মধ্যে আবার ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের ভিন্ন ধারার জন্ম হলো, '৬৮ সালে এসে ১১ দফা কেমন করে ধাপে ধাপে রচিত হয়ে উনত্তরের গণঅভ্যুত্থানের জন্ম দিল, সেসবসহ আরো হাজার তথ্যে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ।
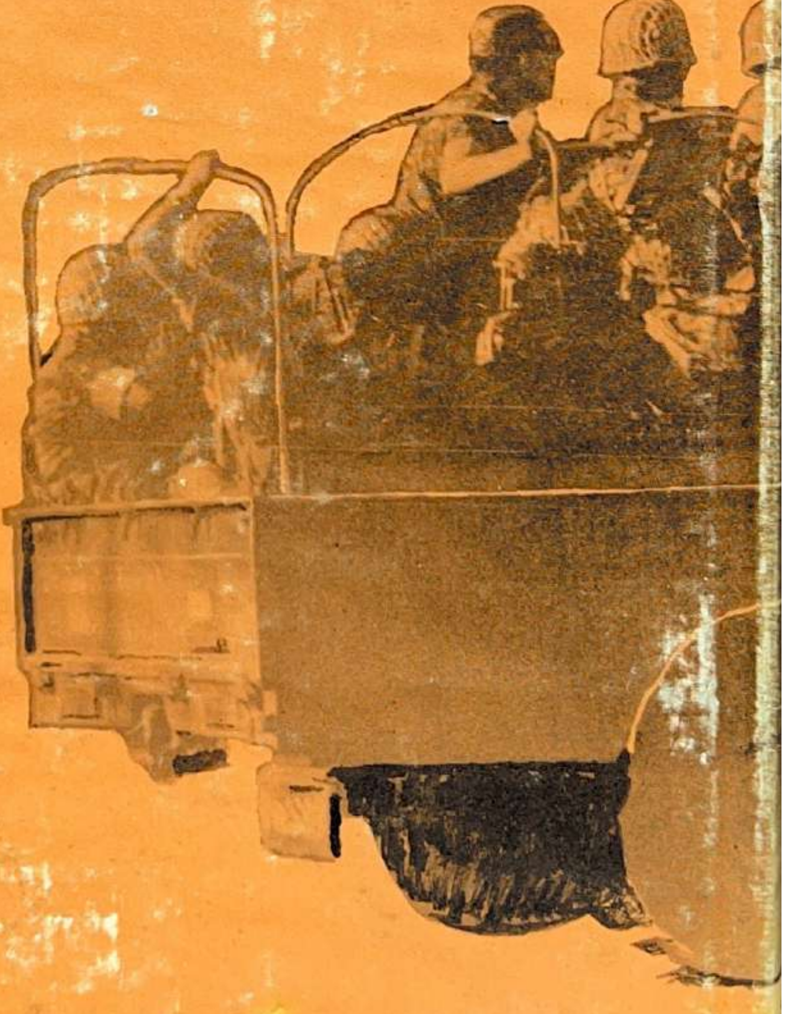
এই সঙ্গে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ চিত্র ১৮৮৬ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত এবং ১৭০০ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষানীতির তথা শিক্ষার ইতিহাসের এক দুর্লভ প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে এতে। সব মিলিয়ে এই গ্রন্থ সকল শ্রেণীর বই-প্রেমিককে নিয়ে যাবে এক তৃপ্তিদায়ক পরিপূর্ণতায়।